কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩০

রকিব হাসান

ভলিউম-৩০

তিন গোয়েন্দা

৮৩, ১১০, ১১৯

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1377-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পঁয়তাল্লিশ টাকা

Volume-30
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ২৫ (জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬ (ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭ (ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে) ৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮ (ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯ (আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০ (নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১ (মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২ (প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর) ৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩ (শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪ (যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুটকি শত্রু) ৩১/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩০/-

নরকে হাজির

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯৪

'ইস্, কি গরমরে বাবা!' মুখ বাঁকিয়ে বলল মুসা। 'বরফ দেয়া তরমুজের শরবত খেতে পারলে ভাল হত।'

হেসে ফেলল রবিন। 'তা আর পাবে কোথায় এখানে?'

'মেরিচাচী খানিকটা বানিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিতে পারতেন।'

'কি করে জানবেন তোমার এত শরবত খেতে ইচ্ছে করবে?'

'জানা উচিত ছিল। গোলামি করতে এখানে পাঠিয়েছেন যখন। তাতে কি পরিমাণ ঘাম আর এনার্জি খরচ হয়, বোঝা দরকার ছিল তাঁর। তা ছাড়া জোর করে পাঠিয়েছেন, আমরা তো আর ইচ্ছে করে আসিনি।'

'আমি তো জানতাম অফুরন্ত শক্তি তোমার। শেষ আর হয় না। কিন্তু সব সময় তো আর এত কাজ করো না, খাও আর শক্তি জমাও। তার থেকে খানিকটা খরচ করো এখন।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, 'কেউ কারও দুঃখ বোঝে না রে! এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তা-ও বোঝে না…'

হলিউডে শহরতলির একটা অনেক বড় পুরানো বাড়ির সমস্ত বাতিল মাল কিনে নিয়েছেন রাশেদ পাশা। সেই মাল বের করে ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন ইয়ার্ডের দুই সহকারী বোরিস ও রোভার এবং তিন গোয়েন্দাকে।

'অত দুঃখ পাওয়ার কি হলো?' হেসে বলল কিশোর। পথের মোড়ে একটা আইসক্রীম পারলার দেখিয়ে বলল, 'তরমুজের শরবত না হোক, আইসক্রীম তো পাওয়া যাবে।'

হাতের পুরানো চেয়ারটা খটাস করে মাটিতে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল মুসা। 'এখুনি চলো! দেরি করতে পারব না।'

পারলারে ঢুকতে যাবে কিশোর, এই সময় হুড়মুড় করে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল একটা লোক। আরেকটু হলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল তাকে। 'অ্যাই অ্যাই, কি করেন!' বলে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'কি হলো?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পকেটমার!' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা লোকটার দিকে তাকাল কিশোর। দৌড়ে চলে যাচ্ছে। পলকের জন্যে দেখতে পেল তার মোটা ভুরু আর ঝোলা কালো গোঁফ। পরক্ষণেই পথের মোড়ে হারিয়ে গেল সে। লোকটার পিছু নেয়ার আগে কি নিয়েছে সে দেখার জন্যে পকেটে হাত দিল

কিশোর।
কই, মানিব্যাগটা তো আছে! বরং আরও একটা জিনিসের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে ওটার সঙ্গে। ব্যাগ চুরি যায়নি, সুতরাং চোরের পিছু নেয়ার আর দরকার মনে করল না সে। দেরি হয়ে গেছে। এখন গিয়েও আর লোকটাকে দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

দরজা আটকে না রেখে পারলারের ভেতরে ঢুকে জিনিসটা কি দেখার জন্যে পকেট থেকে বের করল কিশোর। অবাক হয়ে গেল। প্লাস্টিকের কিম্ভুত একটা পুতুল: শরীরটা ক্যাঙারুর মত, বাদুড়ের মত দুটো ডানা, আর মোটা লেজের মাথাটা তীরের ফলার মত—শয়তানের কল্পিত মূর্তিতে যেমন থাকে।

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা, 'কি এটা?'

'কি করে বলব?' হাতের তালুতে নিয়ে জিনিসটা দেখছে কিশোর। 'লোকটা ঢুকিয়ে দিয়ে গেল পকেটে!'

'কেন দিল?'

'কি করে বলব?' আবার একই জবাব দিল কিশোর।

'হুঁ, আরেকটা কেস…' ওয়েট্রেসকে আসতে দেখে থেমে গেল রবিন।

ভুরু কুঁচকে কুৎসিত পুতুলটার দিকে তাকাল মহিলা। অর্ডার নিয়ে চলে যাওয়ার পর রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি যেন বলছিলে?'

'পুতুলটা কি কুৎসিত দেখেছ? আমার মনে হয় ইচ্ছে করে এটা তোমার পকেটে দিয়ে গেছে তোমাকে কেসটা নেয়ার জন্যে।'

'নিশ্চয় অভিশপ্ত জিনিস!' দু-হাত নেড়ে মুসা বলল, 'এটা যদি কোন রহস্যের সূচনা হয়ে তাকে, তোমরা সমাধান করোগে। আমি এ সবে নেই। ভূতপ্রেত এক কথা, কিন্তু নরকের শয়তান? ওরিব্বাবা!…কিন্তু তোমার পকেটে দিয়ে গেল কেন এই জিনিস? কোন বড় ধরনের পাপ করেছ মনে করেছে?'

রবিন বলল, 'নিশ্চয় তিন গোয়েন্দাকে চেনে লোকটা। কিশোর যে গোয়েন্দাপ্রধান জানে। উদ্ভট কোন রহস্য দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটাও জানে। তারমানে খোঁজখবর নিয়েই এসেছে সে, পুতুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে ওর পকেটে।'

'আমারও সে রকমই লাগছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

তার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল পাশে বসা মুসা, 'এই দেখো, কেমন ড্যাবড্যাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা!'

এককোণে বসে থাকা মানুষটার দিকে তাকাল কিশোর। প্রথমেই চোখে পড়ে তার ভোঁতা নাক, ঘুসি মেরে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীর, শজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। সব কিছু মিলিয়ে, বিশেষ করে নাকটার অবস্থা দেখে মনে হয় পেশাদার বক্সার ও। তাকিয়ে আছে টেবিলে রাখা মূর্তিটার দিকে। ওরা তার দিকে তাকানোর পরও দৃষ্টি

সরিয়ে নিল না।

'চোখ তো বড়ই,' নিচু স্বরে বলল রবিন, 'ব্যাটার কানও বড়।'

হঠাৎ করেই যেন খেয়াল করল লোকটা, তার দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। তবে খাওয়ায় মন আছে বলে মনে হলো না। মিনিট দুই পরে প্লেটে খাবার রেখেই ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডেকে এনে বিল দিতে বলল। বিলের কাগজটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের দিকে।

দুপুরবেলা, খাবারের সময় এখন, ভিড় বাড়ছে। ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে ওয়েট্রেস। খেতে খেতে লোকটার কথা ভুলে গেল গোয়েন্দারা। এমন কিছু করেনি সে, যে মনে রাখতে হবে।

হঠাৎ পারলারের পেছনে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ হলো। ফট করে বেশ জোরাল কিন্তু ভোঁতা একটা আওয়াজ করে ফাটল কি যেন।

'কি ব্যাপার?' কাবাব চিবাতে চিবাতে প্রশ্ন করল মুসা।

'কি আর হবে,' জবাব দিল রবিন, 'গ্লাস-টাস ভেঙেছে আরকি…'

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রান্নাঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল। দরজা দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল কিশোর, 'আগুন লেগে গেছে মনে হয়!'

অবিশ্বাস্য দ্রুত চাপ চাপ ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করল খাবার ঘরে। কাশতে লাগল লোকে। উত্তেজিত কলরব শুরু করে দিল। চিৎকার করে ওয়েট্রেস আর ক্যাশিয়ারকে ডেকে জিজ্ঞেস করল একজন, ব্যাপার কি? জবাব পেয়ে গেল আরেকটা চিৎকারে: আগুন! আগুন!

ব্যস, শুরু হয়ে গেল যেন নরক গুলজার। চেয়ার সরানোর শব্দ, লোকের চিৎকার, ছোটাছুটির আওয়াজ। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করে দরজার দিকে এগোতে লাগল সবাই। কার আগে কে বেরোবে সেই চেষ্টা।

'এ রকম করে তো আরও ক্ষতি করবে!' দুই বন্ধুকে বলল কিশোর, 'এসো তো, চেষ্টা করে দেখি থামানো যায় কিনা?'

জোরে জোরে চিৎকার করে বলল সে, 'আপনারা হুড়াহুড়ি করবেন না। তাহলে বেরোতে দেরি হবে। একলাইনে দাঁড়িয়ে যান, তারপর দ্রুত এগোন দরজার দিকে। পাশ থেকে কেউ কাউকে ধাক্কা দেবেন না। সামনে ঠেলবেন না।'

এককোণে ভিড় করে আছে কয়েকজন মহিলা, তারাই বেশি চিৎকার করছে। বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করার জন্যে এগিয়ে গেল রবিন। মুসা আর কিশোর এগোল দরজার দিকে, একসারিতে দাঁড়িয়ে সবাইকে বেরোতে সাহায্য করার জন্যে। কিশোরের কথায় বেশ কাজ হয়েছে, শান্ত থাকার চেষ্টা করছে অনেকেই।

কমে এল গোলমাল, হই-চই। দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে পারলার। মাত্র আর সাত-আটজন লোক আছে, ওরাও বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকের কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার বাইরে চোখ পড়ল মুসার। দেখল, উৎকণ্ঠিত হয়ে গলা

বাড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকাচ্ছে বোরিস আর রোভার। হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখতে ছুটে এসেছে ওরা, নিশ্চয় ওদের তিনজনকেই খুঁজছে। ধোঁয়ায় এখন ভরে গেছে ঘরটা। নাকে লাগলে জ্বালা করে, গলায় ঢুকে গিয়ে কাশি সৃষ্টি করে, সে জন্যে নাকে রুমাল বেঁধে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। সামনে যে ক'জন আছে, তারা নাক চেপে ধরে, মাথা নিচু করে এগিয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাবে শীঘ্রি। এতক্ষণে দরজার দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর যখন দরজার কাছে পৌছল, এতটাই ঘন হয়ে উঠেছে ধোঁয়া, অন্ধকার করে দিয়েছে। চোখ মেলে রাখা মুশকিল। আর মেললেও দেখা যায় না কিছু। হঠাৎ পেছন থেকে বাড়ি মারল কেউ তার মাথায়। ঠিকমত লাগলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাত, ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যায় না বলেই নিশানা গড়বড় হয়ে গেছে। বাড়িটা মাথার একপাশে লেগে পিছলে গেল। তাতেই মাথা ঘুরে উঠল কিশোরের। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে এল হাঁটু। মেঝেতে বসে পড়ল সে।

কে যেন ঝুঁকে এল তার ওপর। কাঁধ চেপে ধরল। মুসা বা রবিন নয়, অন্য কেউ। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কানের ওপর ঘুসি খেল কিশোর। ঝাঁ করে উঠল কানটা। বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারাল সে।

পারলারের বাইরে হই-চই বাড়ছে। ভিড় জমে গেছে। যারা ভেতরে ছিল, তাদেরকে নানা প্রশ্ন করছে দর্শকরা। দূরে দমকলের সাইরেন শোনা গেল।

'এই, কিশোর কোথায়?' রবিনের উদ্বিগ্ন চিৎকার শোনা গেল।

'আমার কাছেই তো ছিল,' মুসার জবাব। 'এই কিশোর, কিশোর?'

আবার কেউ কাঁধ চেপে ধরল কিশোরের। মুসার হাত, বুঝতে পারল সে। দুর্বল কণ্ঠে সাড়া দিল।

দু-দিক থেকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে কিশোরকে ধোঁয়ার ভেতর থেকে বের করে আনল মুসা আর রবিন। ওদেরকে দেখেই ছুটে এল বোরিসরা দুই ভাই।

বেহুঁশ হয়ে গেল কিশোর। জ্ঞান ফিরলে দেখল, স্ট্রেচারে শুয়ে আছে সে, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে নাক দিয়ে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে তাকে। সে চোখ মেলতেই উৎকণ্ঠা অনেকটা দূর হয়ে গেল চারজোড়া চোখের।

'অ্যাম্বুলেন্সে তুলব?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'না, আমার তো কিছু হয়নি,' জবাব দিল কিশোর। মাথার ভেতরটা এখনও ঘোলা হয়ে আছে। ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে উঠতে দিল না দমকলের একজন লোক, যে তাকে অক্সিজেন দিচ্ছিল। তারপর তাড়াহুড়ো চলে গেল জরুরী অন্য কাজ করার জন্যে।

লোকটা চলে যেতে কিশোরের দিকে ফিরল রবিন। সামান্য কুঁচকে গেছে ভুরু। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল, কিশোর? ধোঁয়া সহ্য করতে পারোনি?'

'না, ধোঁয়ার জন্যে বেহুঁশ হইনি। মাথায় বাড়ি মেরেছে কেউ। তারপর কানের ওপর ঘুসি।'

কি ভাবে কি ঘটেছে জানাল কিশোর। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন, মুসা, বোরিস এবং রোভার।

'একদিনে দুই দুইবার পকেটমার!' মুসা বলল, 'শহরটাতে তো দেখি চোরের আড্ডা হয়ে গেল!'

'প্রথমজন পকেটমার ছিল না,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'সে কিছু নেয়নি, আমার পকেটটাকে ব্যাংক বানিয়েছিল শুধু। আর দ্বিতীয়জনও পকেটমার নয়, সে মূর্তিটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে।'

'মানে?'

'মানে, এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। দুটো ঘটনা একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক আছে।'

'ও। তবে থাকলেও কোন লাভ নেই,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, 'সেই সম্পর্কটা কি সেটা কোনদিনই জানতে পারব না। মূর্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেল। নিশ্চয় নিয়ে গেছে তোমার পকেট থেকে?'

'না,' হেসে বলল রবিন, 'নিতে পারেনি।' নিজের পকেট থেকে মূর্তিটা বের করে দেখিয়ে বলল, 'চেয়ার থেকে ওঠার আগেই আমি ওটা নিয়ে নিয়েছিলাম।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। 'একটা কাজের কাজ করেছ, রবিন। আমি ভেবেছিলাম বুঝি টেবিলে ফেলে এসেছি।'

'আর দেখিয়ো না, জলদি পকেটে ভরো,' রবিনকে বলল মুসা। 'নইলে এবার পড়বে তোমার মাথায় বাড়ি। মনে হচ্ছে এটার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।'

হোসপাইপ গোটাতে আরম্ভ করেছে দমকল বাহিনীর লোকেরা। ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ধোঁয়া সরে গেছে পারলারের ভেতর থেকে, খুব সামান্যই আছে আর। মনে পড়ল ছেলেদের, শুধু ধোঁয়াই দেখেছে, আগুন দেখেনি।

দমকলের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ধোঁয়াটা কিসের?'

'স্মোক বম্ব। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে। আগুন-টাগুন কিছু না।'

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। একই কথা ভাবছে তিনজনে: ইচ্ছে করে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছিল বোমাটা, গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে থেকে যাতে কিশোরের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে মূর্তিটা। তার পকেটে থাকলে নিয়েই যেত, রবিনের বিচক্ষণতার জন্যেই পারেনি।

'কিশোর,' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ভোঁতা নাকওলা বক্সারটাকে ফিরে আসতে দেখেছিলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, সে আর ঢোকেনি। তবে অন্য কাউকে পাঠিয়ে থাকতে পারে আমার মাথায় বাড়ি মারার জন্যে। বোমাটা হয়তো সে-ই ছুঁড়েছে।'

আবার পুরানো বাড়িটার কাছে ফিরে এল ওরা, যেখানে মাল বোঝাই করছিল। দুর্বল লাগছে কিশোরের, সে আর কাজ করতে পারল না। বসে রইল একটা ইজিচেয়ারে। অন্যেরা মাল গুছিয়ে ট্রাকে তুলতে লাগল। অনেক মাল, একদিনে সব নিয়ে সারতে পারবে না। আবার আসতে হবে। সেদিনকার মত ট্রাক বোঝাই করে ইয়ার্ডে ফিরে এল ওরা।

মাল নামাতে বোরিস আর রোভারকে সাহায্য করতে ট্রাকের কাছে রয়ে গেল মুসা। ঘরের দিকে এগোল কিশোর আর রবিন। রবিনের খুব পিপাসা পেয়েছে।

কিশোরকে যে মাথায় বাড়ি মারা হয়েছে, গোপন করে গেল সবাই। মেরিচাচী শুনলে বকাবকি করতে থাকবেন। তবু কিছুটা আন্দাজ করে ফেললেন তিনি, কিশোরের কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখচোখ অত শুকনো কেন রে?'

তাড়াতাড়ি জবাব দিল কিশোর, 'হবে না। যা গরমের গরম…'

'কাজ করতে করতে জিরিয়ে নিতে পারিস না। কত্তোবার আর বলব তোকে এসব কথা! কিছুই তো শুনিস না আমার!…নে এখন বস, বিশ্রাম নে। আমি খাবার দিচ্ছি।'

যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়ে ফিরে তাকালেন তিনি। টেবিলে রাখা চিঠির গাদা থেকে আলাদা করে রাখা একটা চিঠি দেখিয়ে বললেন, 'ওটা তোর নামে এসেছে।'

'আমার চিঠি? কে দিল?'

'কি জানি। খুলে দেখ।' রান্নাঘরে চলে গেলেন মেরিচাচী।

চেয়ারে বসেই হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে আনল কিশোর। একপাশ থেকে তার ওপর ঝুঁকে এল রবিন।

সাদা লম্বা একটা খাম। কে লিখেছে ভাবতে ভাবতে মুখটা ছিঁড়ল কিশোর। এই সময় বাজল টেলিফোন। ইশারায় রবিনকে ধরতে বলল সে।

রবিন সাড়া দিতেই ওপাশ থেকে খসখসে একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'তিন গোয়েন্দার কেউ?'

'হ্যাঁ। বলুন?'

'আমার গুপ্তধনের কাছ থেকে দূরে থাকবে। একদিন না একদিন আমার রূপার প্লেটগুলোর জন্যে ফেরত আসবই আমি। এসে যেন দেখি যেখানে রেখেছি ওগুলো সেখানেই আছে। বুঝলে আমার কথা? যে ওগুলো সরাবে, তাকে নরকে পাঠাব আমি।'

'কে বলছেন?'

'পাইন ব্যারেনের রূপালি ডাকাত।' হা-হা করে হাসল লোকটা. উন্মাদের হাসি। কুট করে একটা শব্দ হলো, কেটে গেল ওপাশে লাইন।

দুই

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রবিন। বোকা হয়ে গেছে যেন।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'একটা পাগল···কতগুলো রূপার প্লেটের কথা বলল। নাম বলল, পাইন ব্যারেনের রূপালি ডাকাত।'

'তাই? একজন মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছ তুমি!'

আরও বোকা হয়ে গেল রবিন। হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'এটা দেখলেই বুঝবে,' চিঠিটা বাড়িয়ে দিল কিশোর।

হাতে নিল রবিন। অনেক পুরানো একটা চিঠির ফটোকপি। হাতের লেখা খারাপ, স্টাইলও পুরানো, কিছু কিছু শব্দ প্রায় বোঝাই যায় না। কষ্ট করে পড়তে হয়। চিঠিটাতে লেখা:

মার্চ ৩, ১৭৮১

আশা করি ইনজুন হোপ কোডকাকে দিয়ে পাঠানো এই চিঠি তোমাদের হাতে পৌঁছবে। তার কাছে দেয়ার কারণ, সে বলেছে পার্সন ফোর্জে যাবে আমাদের গোপন আস্তানা সিডার নবের ওপর দিয়েই। চিঠিটা পৌঁছে দিতে পারবে। তার হাতে দেয়ার আরেকটা সুবিধে, সে পড়তে জানে না, চিঠিতে কি লেখা আছে বুঝবে না, কথাটা ছড়াতে পারবে না। বেচারা ডিন মার্টিন—অবস্থা খারাপ হয়ে গেল তার এবং মারা গেল। ফিশহুকে তার নিচেই রেখেছি রূপাগুলো দশ কদম উত্তরে, কাক যেখানে ওড়ে। জলদি এসো, ভাগাভাগি করে নেব। গুড লাক।

ডেগা গালুশ

চিঠি পড়ে অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল রবিন। 'এর মানে কি, কিশোর?'

'আগে তুমি বলো, টেলিফোনে তোমাকে কি বলল লোকটা?'

রবিনের কথা শুনে কিশোরও অবাক। ঘন ঘন চিমটি কাটল দু-বার নিচের ঠোঁটে। মুখ তুলল। 'দুটো ব্যাপারই একটা দিকে ইঙ্গিত করছে, রূপালি ডাকাতের গুপ্তধন। কাকতালীয় হতে পারে না, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তা তো পারেই না। ওই মূর্তিটার মত। একজন রাখল, আরেকজন বের করে নিতে চাইল।'

'কিসের মূর্তি?' দরজা থেকে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী, সন্দেহ জেগেছে।

চমকে ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। দেখল, মুসা আর রাশেদ পাশাও ঢুকছেন চাচীর পেছনে। খাওয়ার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে তাঁদের।

কিছুই না বুঝে ফস করে বলে দিল মুসা, 'শয়তানের।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন, পারলে ধরে মারে। কিন্তু লাভ নেই মেরে আর এখন, কথা আর বন্দুকের গুলি একই রকম, ফসকে বেরিয়ে গেলেই সর্বনাশ, আর ফেরানো সম্ভব না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পকেট থেকে মূর্তিটা বের করে টেবিলে রাখল রবিন।

'এ কি!' টেবিলে ট্রে রাখতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠল চাচীর। 'এত জঘন্য জিনিস তো আর দেখিনি! মনে হচ্ছে যেন হরর মুভি থেকে তুলে আনা হয়েছে! পেলি কোথায়?'

'একটা লোক ইচ্ছে করে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল,' জবাব দিল কিশোর।

'তাকে চিনিস?'

'না।'

'বলিস কি। যতসব উদ্ভট কাণ্ড ঘটে তোদের বেলায়...'

'গোয়েন্দা হলে ওরকমই হয়।'

'হুঁ। খেয়েদেয়ে আর কাজ না থাকলেই গোয়েন্দা হয় লোকে। আয়, খেতে বস।'

আরও খাবার আনতে বেরিয়ে গেলেন চাচী।

হেসে জিজ্ঞেস করলেন চাচা, 'আরেকটা কেস পেলি নাকি?'

'বুঝতে পারছি না।' যা যা ঘটেছে চাচাকে খুলে বলল কিশোর।

চিঠিটা পড়লেন রাশেদ পাশা। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস, এখানে লিখেছে আমাদের গোপন আস্তানা। আমাদের মানে কি?'

'বহুবচন। তারমানে একদল ডাকাত। তাতে কি?'

'তাতে? একদল ডাকাত হলে তাদের একজন সর্দার থাকে। ডেগা গালুশও ছিল ডাকাত সর্দার। রূপালি ডাকাতও মনে হচ্ছে সর্দার। ভাবছি, ডেগা গালুশ আর পাইন ব্যারেনের এই রূপালি ডাকাত এক লোক নয় তো?'

'হতে পারে,' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'টাইমিংটা খেয়াল করেছ? আমরা চিঠি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এল টেলিফোন। যেন করার জন্যে লোকটা তৈরি হয়েই ছিল। কিন্তু বুঝতে পারছি না এ সবের পেছনে কে আছে?'

'চিঠিটা আসল কি নকল, তা-ও বুঝতে পারছি না,' রবিন বলল।

'দেখি তো?' চিঠিটা দেখলেন রাশেদ পাশা। তিনিও কিছু বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ বললেন, 'ও ভুলেই গিয়েছিলাম...'

'কী?' জানতে চাইল কিশোর।

'সকালে আরেকটা ফোন এসেছিল তোর কাছে। ডাকপিয়ন চিঠিগুলো বাক্সে ফেলে যাওয়ার পর পরই।'

'কে করেছিল?'

'নাম বলেনি। তবে ভারি আর খসখসে কণ্ঠস্বর। চাপা। বহুদূর থেকে আসছে মনে হচ্ছিল।'

'আমার সঙ্গে যে কথা বলেছে সে এই লোকই!' বলে উঠল রবিন। 'ভাব দেখাতে চেয়েছে, কবর থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে। প্রেতাত্মা।'

'খাইছে! সত্যি?'

'আরে দূর, এ সব আবার সত্যি হয় নাকি। কোন শয়তান লোক ভূত-ভূত খেলার চেষ্টা করছে।'

'কয়েকটা রহস্যময় ব্যাপার লক্ষ করছি আজ সকাল থেকে, বুঝলি...' মেরিচাচীকে ঢুকতে দেখে থেমে গেলেন রাশেদ পাশা। গোয়েন্দাগিরি একদম পছন্দ নয় চাচীর। কথাটা নিশ্চয় কানে যায়নি তাঁর, তাই রাশেদ পাশা কি দেখেছেন জিজ্ঞেস না করে বললেন, 'এ কি, এখনও খাওয়াই শুরু করোনি তোমরা? তাড়াতাড়ি সারো, সেরে মালগুলোর ব্যবস্থা করোগে। বোরিস আর রোভারকে খাবার দিয়ে এসেছি। ওদের দেরি হবে না। আমি চা নিয়ে আসছি।'

চাচী বেরোতেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি লক্ষ করেছ, জলদি বলো। আবার চাচী চলে আসবে।'

'সারাটা দিন রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একজন লোক বসেছিল ড্রাইভিং সীটে, মুখ দেখিনি। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিইনি তখন, এখন বুঝতে পারছি দেয়া উচিত ছিল। তবে ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাকই লাগছিল। সে জন্যে এই খানিক আগে বাথরুম থেকে বেরিয়ে মনে হলো, দেখি তো আছে কিনা। জানালার কাছে গিয়ে দেখি, নেই। সন্দেহ জাগায়, তাই না?'

'জাগায়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ওখানে থেকে নিশ্চয় চোখ রাখছিল লোকটা। চিঠি কখন আসে, আমরা কখন ফিরি, এ সব দেখছিল নিশ্চয়। রেডিওতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। তাকে ফোন করতে বলেছে। কিংবা তার গাড়িতেই টেলিফোন আছে। সে নিজেই আমাদের ফোন করেছে। সকালে তুমি যখন বললে আমরা নেই, তখন থেকেই আমাদের ফেরার অপেক্ষা করছে।'

মুসার কান এদিকে, চোখ খাবারের দিকে। দু-দিকেই মনোযোগ।

'ঠিকই বলেছ,' স্যান্ডউইচ চিবাতে চিবাতে বলল রবিন। 'আমরা ফিরতেই ফোন করল। কিন্তু কেন? মজা করছে কেউ আমাদের সঙ্গে? শুঁটকি টেরি নয় তো?'

'না, সে নয়। শুঁটকি রকি বীচে এলে খবর পেতামই,' মুসা বলল।

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তারমানে অন্য কেউ করেছে। মজা করার জন্যেই যদি করে থাকে অদ্ভুত রসবোধ তার।'

'কিন্তু যত রসবোধই থাক, শুধু মজা পাওয়ার জন্যে এত কষ্ট করতে যাবে কেউ?' রবিন বলল।

'সেটাই জানতে হবে আমাদের।'

'কি করে? কোন সূত্র তো নেই।'

'সূত্র? পাইন ব্যারেনটা একটা সূত্র হতে পারে। আমার বিশ্বাস, ওটা দক্ষিণ নিউ জারসির কোনখানে হবে...' থেমে গেল কিশোর। ভুরু কোঁচকাল। মাথা চুলকাল। 'কিন্তু সতেরোশো একাশি সালে ওখানে কি ঘটেছিল, বলতে পারব না।'

'ইতিহাসে কাঁচা আরকি,' মন্তব্য করলেন রাশেদ পাশা। 'আমেরিকার ইতিহাস পড়িস না কেউ। এক কাজ করলেই তো পারিস, স্কুলের হিস্টরি টীচারকে জিজ্ঞেস কর।'

'তাই তো?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'এই সহজ কথাটা মনে পড়েনি...' মেরিচাচীকে দেখে থেমে গেল সে।

ঘরে ঢুকলেন তিনি। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কি ব্যাপার, কিছু একটা নিয়ে আলাপ করছ তোমরা, আমাকে দেখলেই থেমে যাচ্ছ। ঘটনাটা কি?'

মেরিচাচীর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার ভয়ে মাথাই তুলল না মুসা। জোরে জোরে খাবার চিবাতে লাগল। রবিন চুপ। কিশোরের দৃষ্টি আরেক দিকে। পরিস্থিতি সামলালেন রাশেদ পাশা, 'আর বলো না, আজকাল কিচ্ছু পড়ালেখা করে না ছেলেরা। আমেরিকার ইতিহাসই জানে না। দেখো না, সতেরোশো একাশি সালে পাইন ব্যারেনে কি ঘটেছিল এই সহজ কথাটাই বলতে পারছে না।'

'কি ঘটেছিল?' আগ্রহী মনে হলো চাচীকে।

থমকে গেলেন রাশেদ পাশা। হাত বাড়ালেন, 'দাও, দেখি, চা দাও। কাজ পড়ে আছে।' কাপ হাতে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। চোখে হাসি। মেরিচাচী না থাকলে হেসে গড়াগড়ি খেত।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু টুকটাক কাজ সেরে স্কুলের ইতিহাসের টীচার মিস ডোনোভানকে ফোন করল কিশোর। আমেরিকার ইতিহাসে ডক্টরেট আছে তাঁর। তিনি জানালেন, বাড়িতেই থাকবেন, কিশোররা যখন ইচ্ছে যেতে পারে।

বেরোতে দেরি করল না কিশোর আর রবিন। মুসা ইচ্ছে করেই ইয়ার্ডে রয়ে গেল। পড়ালেখাকে ভীষণ ভয় তার, তাই শিক্ষকের সামনে গেলে আড়ষ্ট বোধ করে।

দুই গোয়েন্দাকে তাঁর স্টাডিতে বসালেন মিস ডোনোভান। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, কি জানতে চাও বলো?'

চিঠিটা বের করে দিল কিশোর।

মিস ডোনোভানের পড়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করল, 'নামটা শুনেছেন?'

'ডেগা গালুশ? নিশ্চয় শুনেছি। পাইন ব্যারেনের কুখ্যাত ডাকাত ছিল, আউট-ল।'

জবাব শুনে সন্তুষ্ট মনে হলো কিশোরকে।

'তাঁর সম্পর্কে কি কি জানেন?' অনুরোধ করল রবিন, 'বলবেন, প্লীজ?'

হাসলেন টীচার। 'জবাবটা অনেক বড়। যাই হোক, সংক্ষেপে বলার

চেষ্টা করছি। এটা নিশ্চয় জানো, নিউ জারসিতে লোক সংখ্যা অনেক বেশি, প্রতি বর্গমাইলে যত লোক বাস করে ওখানে, আর কোন স্টেটে তা করে না। অথচ এতবড় লোকালয়ের গা ঘেঁষে রয়েছে এক বিরাট বিশাল বন, যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের হাত তেমন পড়েনি। মিসিসিপির পুবের এই অঞ্চলটার নামই পাইন ব্যারেন।'

গড়গড় করে বলে গেলেন তিনি—উত্তর উপকূলের প্রায় অর্ধেকটায় আটলান্টিকের তীরে গড়ে উঠেছে বসতি, শহর, কলকারখানা; বোসটন থেকে রিচমন্ড পর্যন্ত এমন ভাবে তৈরি হয়েছে সে-সব, ছড়িয়ে গেছে, দুটো আলাদা শহর বলে বোঝা যায় না আর, মনে হয় একটাই শহর। না দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না, অতি উন্নত এই জনবসতির ধার ঘেঁষেই রয়েছে হাজার হাজার একর সেই বুনো অঞ্চল, পাইন, ওক আর সিডারের রাজত্ব সেখানে—নিউ ইয়র্ক শহরের জনবহুল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার থেকেই দেখা যায় সেই বন।

'চাষাবাদ করে ওখানে লাভ হবে না,' বলে গেলেন মিসেস ডোনোভান, 'দু-শো বছরেরও বেশি আগে যারা বসতি করতে গিয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল তারা। তাই বনের গাছপালার দিকে আর হাত বাড়ায়নি, যেমন ছিল ওটা তেমনি রেখে দিয়েছে। তবে লোহা আনা হয়েছে ওখান থেকে, প্রচুর লোহা। ঠিক খনি নয়, লোহার বিরাট এক প্রাকৃতিক গুদামই বলতে পারো। আঠারোশো বারো সালের বিপ্লবের সময় ওখান থেকে লোহা এনে কামান আর কামানের গোলা তৈরি করা হত। জায়গাটা সাগরের পাড়ে। অনেক খাঁড়ি আর গুহা আছে। ফলে অপরাধীদের আড্ডা ছিল ওখানে, চোরাচালানীদের রাজত্ব। বিদ্রোহীরাও আত্মগোপন করত ওখানে।

'ডেগা গালুশও আস্তানা গেড়েছিল গিয়ে ওখানে। বিদ্রোহীদের কাছে বিদ্রোহী সেজে থাকত, সরকার সমর্থকদের কাছে সমর্থক। বেশিদিন চালাতে পারেনি এই অভিনয়। ধরা পড়ে যায় সরকার সমর্থকদের হাতে। বেঈমান লোককে কেউ দেখতে পারে না, তাই বিদ্রোহীরা কোন সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। সতেরোশো একাশি সালে ডেগা আর তার দলের লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দিয়ে দেয়া হয়।'

তন্ময় হয়ে শুনছিল রবিন, মিসেস ডোনোভান থামতে বলল, 'ইনটারেসটিং!'

কিশোর বলল, 'চিঠিটাতে ওই সালেরই তারিখ দেয়া আছে!'

ছেলেদের আগ্রহ দেখে মুচকি হাসলেন টীচার। উঠে গিয়ে তাক থেকে একটা বই বের করে আনলেন। একটা অধ্যায় বের করে দেখিয়ে বললেন, 'এখানে আছে। বইটা নিয়ে যাও। আরও অনেক কিছু জানতে পারবে ডেগা গালুশের ব্যাপারে।'

'চিঠিতে গুপ্তধনের ইঙ্গিত আছে,' কিশোর বলল, 'যেটা খুঁজে পায়নি এখনও কেউ। ও পথে অনেক ব্রিটিশ সদাগরী জাহাজ চলাচল করত তখন, ওগুলোরই কোনটা লুট করেছিল হয়তো ডেগা। রূপার জিনিসপত্র। রূপালি

ডাকাতও বোধহয় তাকে এ কারণেই বলা হত। আপনার কি মনে হয়?'

'লুট করাটা অসম্ভব নয়, কারণ রূপার প্রতি তার অসম্ভব লোভ ছিল। নিজেকে রূপালি ডাকাত বলতেও ভালবাসত সে। তবে বইতে এ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই।'

'চিঠিটার ব্যাপারে কি মনে হয় আপনার? ডেগোরই লেখা? নাকি অন্য কেউ লিখে তার বলে চালিয়ে দিয়েছে?'

'এটা দেখে বোঝা কঠিন, কারণ এটা ফটোকপি। পরীক্ষা করে দেখার কোন উপায় নেই। কোন এক্সপার্টকে দেখাও, শিওর হতে পারবে।'

'আপনার চেনা কেউ আছে?'

দ্বিধা করলেন মিস ডোনোভান। 'তেমন কাউকে চিনি না, তবে মিস্টার লুইসের কাছে যেতে পারো। পুরানো ম্যাপ আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট বিক্রি করে। হয়তো কোন সাহায্য করতে পারবে।'

টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে ঠিকানা বের করে একটুকরো কাগজে লিখে দিলেন মিস ডোনোভান। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, শীঘ্রি বইটা ফেরত দেয়ার কথা দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, তার পুরানো ফোক্স ওয়াগেনটা। পাশে কিশোর। মিস ডোনোভানের ওখানে যা জেনেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করছে। রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝটকা দিয়ে ঘুরে পেছনে তাকাল কিশোর। 'আরে!'

'কি?'

'ওই স্টেশন ওয়াগনটা দেখছ? পেছনে আসছিল। হঠাৎ এত তাড়াহুড়া শুরু করল কেন?'

রবিনও লক্ষ করল এখন। গতি অনেক বাড়িয়ে দিয়ে চলে এল একেবারে ওদের পেছনে।

'কিশোর, সেই লোকটা না! আইসক্রীম পারলারে দেখেছিলাম, ভোঁতা-নাক!'

'জলদি চালাও। লোকটার ভাবগতিক সুবিধের লাগছে না।' সামনের নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। যানবাহন নেই। এখানে আসার জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছিল লোকটা। কুমতলব আছে।

'আমাদের পেছনে লাগল কেন আবার?'

'বুঝতে পারছি না। তবে উদ্দেশ্য ভাল না। আরও জোরে চালাও।'

কিন্তু একটা স্টেশন ওয়াগনের সঙ্গে পারার কথা নয় পুরানো ফোক্স ওয়াগেনের, কিছুতেই গাড়িটাকে খসাতে পারল না রবিন। দূরত্বও বাড়াতে পারল না। স্বচ্ছন্দে তাদের পেছনে লেগে রইল ওটা। দূরত্ব কমিয়ে আনল একটু একটু করে, পাশে চলে এল।

আচমকা ঘটাং করে বাড়ি লাগল ফোক্স ওয়াগেনের গায়ে। ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল গাড়ির বডি, ডানে হেলিয়ে দিল দু-জনকেই।

'করছে কি শয়তানটা!' চিৎকার করে বলল রবিন।

গম্ভীর কণ্ঠে কিশোর বলল, 'আমাদের রাস্তা থেকে নামাতে চাইছে!'
পাশাপাশি ছুটছে দুটো গাড়ি। ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল ভোঁতা-নাক। আবার ধাক্কা মারল...আবার...

পাহাড়ী রাস্তা, ওদের ডানে গভীর খাদ। গতি কমিয়ে ফেলল রবিন। বুঝতে চাইছে, থেমে গেলে আর কিছু করে কিনা ভোঁতা-নাক। করবে, বোঝা গেল। ওদেরকে ফেলে না দিয়ে ছাড়বে না। উপায় না দেখে আচমকা গ্যাস পেডাল পুরোটা চেপে ধরল রবিন। ওরা গতি কমানোয় কালো গাড়িটাও গতি কমিয়েছিল, লাফ দিয়ে ওটার সামনে চলে এল সে। তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল সামনে।

কিন্তু আট সিলিন্ডারের শক্তিশালী ইঞ্জিন অন্য গাড়িটার। মুহূর্তে ওদেরকে পিছে ফেলে আগে চলে গেল। যাওয়ার আগে গুঁতো মারার জন্যে ডানে কাটল অনেকখানি।

সামলাতে পারল না রবিন। নাক ঘুরে গেল গাড়ির। ছুটে গেল খাদের দিকে।

তিন

টায়ারের আর্তনাদ, খোয়া আর পাথরের কুচির খড়খড় শব্দ! আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে যেন দুই গোয়েন্দা। তাকিয়ে আছে সামনের চাকার নিচে হাঁ করে থাকা খাদের দিকে। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি, থেমে গেল গাড়িটা। খাদের কিনারে বেরিয়ে থাকা একটা উঁচু চোখা পাথরে ঠেকে গেছে গাড়ির চাকা, সামনের চাকা দুটো ঝুলে রইল শূন্যে।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ধীরে ধীরে।

দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াল রবিন।

বাধা দিল কিশোর, 'ঠেলাঠেলি কোরো না। উল্টে যেতে পারে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। 'তুমি পেছনের সীটে যেতে পারবে? পেছনটা ভারী করে ফেলা দরকার।'

'নড়াচড়া করাই উচিত না এখন। পিছাতে পারো নাকি দেখো।'

ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ইগনিশনে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল। খুব সাবধানে গিয়ার দিয়ে একসিলারেটরে চাপ দিল রবিন।

গুঙিয়ে উঠল গাড়ির শরীর, ঘুরতে লাগল পেছনের চাকা, আলগা পাথরে কামড় বসাতে পারল না। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝাঁকি দেয়া ছাড়া আর কোন উন্নতি হলো না।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি করি?'

'টো ট্রাক ডাকতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে কাছাকাছি পেয়ে যেতে পারি।' সিবি রেডিওর সুইচ অন করল কিশোর। ভাগ্য ভালই, পেয়ে গেল

একটা ট্রাক, কাছেই ঘুরঘুর করছিল কাজের সন্ধানে। কোথায় আছে ওরা সেটা শুনে নিয়ে ট্রাক ড্রাইভার আশ্বাস দিল দশ মিনিটের মধ্যে পৌছে যাবে।

ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে খাদের দিকে পাঠিয়ে দিয়েই চলে গেছে কালো স্টেশন ওয়াগনটা। এটাই বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল লোকটার। ওটার নম্বর মুখস্থ করে রেখেছে কিশোর। ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে রেডিওতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় পৌছে গেল ট্রাক। ট্রাকের পেছনটা এনে ফোক্স ওয়াগেনের পাঁচ-সাত ফুট দূরে রাখল ড্রাইভার। বাম্পারে একটা শেকল বেঁধে একটানে তুলে ফেলল ওপরে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানাল দুই গোয়েন্দা।

'কি ব্যাপার?' হেসে রসিকতা করল ড্রাইভার, 'গাড়ি নিয়ে ওড়ার শখ হয়েছিল বুঝি?'

'না,' জবাব দিল রবিন। 'আমাদেরকে পছন্দ করতে পারেনি এক ভদ্রলোক, ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

গাড়ির রেডিও কড়কড় করে উঠল। জবাব দিতে গেল রবিন। ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দিল কিশোর। রেডিওতে পুলিশের একজন সার্জেন্ট জানাল, যে গাড়িটার কথা বলেছে কিশোর, সেটা ঘন্টা দুই আগে চুরি করা হয়েছিল একটা অফিসের সামনে থেকে। কয়েক মিনিট আগে মহাসড়কের ধারে পাওয়া গেছে, কেউ নেই ভেতরে।

সার্জেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'গেল গায়েব হয়ে আমাদের ভোঁতা-নাক!' পুলিশ যা বলেছে কিশোরকে জানাল সে।

কিশোর অতটা নিরাশ হলো না। শুকনো গলায় বলল, 'আমার মন বলছে আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের। ওর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। সহজেই খুন করে বসতে পারে ওই লোক।'

ইয়ার্ডে ঢুকেই মেরিচাচীর কাছে খবর পেল কিশোর, পিটার সেবিল নামে খবরের কাগজের একজন রিপোর্টার ফোন করেছিল।

'কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'তোদের সাক্ষাৎকার নিতে চায়। আমি তেমন পাত্তা দিইনি। কিন্তু চাপাচাপি করতে লাগল লোকটা। কিছুতেই ছাড়ল না।'

'কিন্তু রবিন আর মুসাকে ছাড়া···কি জন্যে সাক্ষাৎকার, বলেছে কিছু?'

'না।'

রবিন আর মুসাকে ফোন করল কিশোর। মুসা বাড়ি নেই, তার মা বাজারে পাঠিয়েছেন। রবিন সবে ঘরে ঢুকেছে। বলল, কাপড়টা পাল্টেই চলে আসবে।

আধঘন্টা পরেই ইয়ার্ডে ঢুকল পিটার সেবিল। বয়েস তিরিশের কোঠায়। কোঁকড়া চুল। পরনের স্যুটটার ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে দুমড়ে গেছে। বসার ঘরে এনে

তাকে বসাল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ পত্রিকা?'

'প্যাসিফিক নিউজ। আমি ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার।'

'কি করতে পারি, বলুন?'

'তিন গোয়েন্দার সাক্ষাৎকার নিতে চাই।'

'তিনজন তো পাবেন না, আমরা দু-জন আছি, আরেকজন বাড়ি নেই। দু-জনে চলবে?'

'তা চলবে। শুনলাম, তোমরা নাকি একটা বিখ্যাত গুপ্তধনের সূত্র পেয়েছ। দুশো বছর আগে পাইন ব্যারেনের রূপালি ডাকাতের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন।'

অবাক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকার পর কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এ খবর কোথায় পেলেন?'

'ফোন করে জানাল একটা লোক, নিজের নামটাম কিচ্ছু বলেনি। তোমাদের কথা শুনেছি আমি, অনেক জটিল রহস্যের সমাধান নাকি করেছ। ভাবলাম, এই গুপ্তধন নিয়ে একটা ইনটারেস্টিং স্টোরি হতে পারে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুই গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সেবিল, 'খবরটা কি সত্যি?'

'সত্যি কিনা জানি না,' জবাব দিল কিশোর, 'তবে অনেক পুরানো একটা চিঠির ফটোকপি আমরা পেয়েছি, নিচে ডেগো গালুশের নাম সই করা। দলের লোকের কাছে চিঠিটা লিখেছিল, লুকানো গুপ্তধনের ইঙ্গিত দিয়ে।'

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সেবিল। তার মনে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করছে যেন। 'চিঠিটা কি আসল?'

'কি করে বলি? আমরা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই। হতেও পারে।'

'শুনলাম তোমাদের সঙ্গে বিখ্যাত গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের পরিচয় আছে?'

'আছে।'

'তাঁর হয়ে অনেক কাজ করেছ তোমরা?'

'করেছি।'

'চিঠিটা দেখে তিনি কিছু বলতে পারবেন না?'

'পারতেও পারেন, জানি না। তবে এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না। একটা জরুরী কেসে ব্যস্ত।'

'কি কেস?'

'সেটা আপনাকে বলা যাবে না, সরি।'

কিশোরের এ রকম সরাসরি প্রত্যাখ্যানে আহত হলো কিনা লোকটা বোঝা গেল না, হলেও সেটা প্রকাশ করল না সেবিল। একের পর এক প্রশ্ন করে চলল পাইন ব্যারেনের রহস্য নিয়ে।

একটা সময় বিরক্ত হয়ে গেল রবিন। কিছুটা রুক্ষভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো, মিস্টার সেবিল? সত্যিই কি ভাবছেন বনের মধ্যে গুপ্তধন লুকানো আছে?'

হাসল সাংবাদিক। কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাল। 'এইবার ফেলেছ বেকায়দায়। সত্যিই বলি, ফোনটা পাওয়ার আগে জানতামই না পাইন ব্যারেন নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে রূপালি ডাকাত নামে কেউ ছিল। স্টোরিটা লেখার আগে তার সম্পর্কে ভালমত পড়ে নিতে হবে।'

'পড়াই উচিত,' শুকনো গলায় বলল রবিন।

'গুপ্তধন খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তোমাদের?' জানতে চাইল সেকিল।

'এখনও বলতে পারি না,' জবাব দিল কিশোর।

যাওয়ার ইচ্ছে পুরোপুরিই আছে তার, কিন্তু সেটা একজন সাংবাদিককে জানিয়ে প্রচার করার কোন মানে হয় না। বিপদ ডেকে আনবে তাতে। আরও অনেক গুপ্তধন শিকারী আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। বদ লোকেরা পিছু নিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

জেরা করে করে ওদের পেট থেকে কথা আদায়ের সব রকম চেষ্টা চালাল সেকিল। তারপর ওদের অনুমতি নিয়ে দু-জনের দুটো ছবি তুলে নিয়ে বিদেয় হলো।

'বড় বেশি ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব,' রবিন বলল। লোকটাকে একটুও পছন্দ হয়নি তার।

'ভাল রিপোর্টারের লক্ষণ,' অন্যমনস্ক হয়ে বলল কিশোর। 'চলো, হেডকোয়ার্টারে গিয়ে বসি। এই গুপ্তধনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। বেশ ইনটারেসটিং হয়ে উঠছে।'

সবে হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছে ওরা, এই সময় বাইরে থেকে ডাক দিলেন মেরিচাচী, 'এই কিশোর, কিশোর, গেলি কোথায়? জিনা এসেছে।'

'সর্বদর্শন' পেরিস্কোপটায় চোখ ঠেকিয়ে রবিন দেখল সাদা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ইয়ার্ডের ভেতর। ওটার সামনে পায়চারি করছে জিনা।

ওঅর্কশপের দরজা দিয়ে ওদের বেরোতে দেখে এগিয়ে এল জিনা। 'হাই, কেমন আছ?'

'জিনা, তুমি?' কোন কাজ ছাড়া যে আসেনি জিনা, বুঝতে পারছে কিশোর।

'অ্যাই দেখো, ভুলে গেলে!' অনুযোগের সুরে বলল জিনা, 'সেদিন না বললে থিয়েটার দেখতে যাবে। টিকেট আনতে বললে। এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'অ্যাঁ, তাই তো!' অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাল কিশোর, 'কাজের চাপ, বুঝলে...'

'আমার তা মনে হয় না। তোমাকে আমি চিনি না ভেবেছ? নিশ্চয় অন্য কিছু। কোন কেস পেয়েছ।'

'পাইনি,' জবাব দিল রবিন, 'তবে পাব পাব মনে হচ্ছে। দু-শো বছর আগে মরে যাওয়া এক ডাকাত চিঠি লিখেছে আমাদের কাছে।'

হাঁ হয়ে গেল জিনা।

অবশেষে সব কথা বলতেই হলো তাকে।

জিনা জিজ্ঞেস করল, 'যাবে তোমরা পাইন ব্যারেনে?'

'এখনও বলতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'তবে যেতেও পারি।'

'ইস্, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পরীক্ষাটা এমন সময়ই পড়ল···থাক, ওটা নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। টিকেট নিয়ে এসেছি। যাবে না?'

'বলেছি যখন, যেতে তো হবেই। ক'টা টিকেট?'

'চারটা। কেন?'

'মুসা বোধহয় যেতে পারবে না। ও বাড়িতে নেই।'

'ফোন করে দেখো একবার।'

ফোন করা হলো। মুসা ফেরেনি। কাপড় বদলে জিনার গাড়িতে এসে উঠল কিশোর। রবিন আর জিনা আগেই উঠে বসে আছে।

রাস্তায় যানবাহনের বেশ ভিড়। গাড়ির সারির মাঝখানে থেকে চালাতে চালাতে হঠাৎ বলে উঠল জিনা, 'আজকাল বোধহয় টিভিতে গোয়েন্দা কাহিনী খুব বেশি দেখছি!'

অবাক হলো কিশোর। 'কেন?'

হাসল জিনা। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে আমাদের।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর আর রবিন। পেছনে গাড়ির অভাব নেই। পিছু যদি নিয়েই থাকে, কোনটা নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

সাড়ে সাতটা নাগাদ হলিউডে ঢুকল ওরা। থিয়েটারের সামনে এসে পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল জিনা। নেমে হেঁটে এগোল কনসার্ট হলের দিকে।

আলোকিত একটা নোটিশ ঘোষণা করছে; আটটা বাজতে দশ মিনিটে দরজা খোলা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দরজার সামনে ভিড় জমিয়েছে অনেক দর্শক। দ্রুত বাড়ছে ভিড়টা। যারা টিকেট পায়নি তারা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, কোনমতে একটা টিকেট জোগাড়ের আশায়। ফেরিওলারা কনুইয়ের ধাক্কায় ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে, বিচিত্র জিনিসের পসরা নিয়ে—থিয়েটারের নাম ছাপমারা টি-শার্ট, ফ্যান ম্যাগাজিন, পোস্টার, স্যুভনির এ সব জিনিস।

'এ তো একটা পাগলাগারদ মনে হচ্ছে!' কোন কুক্ষণে যে জিনাকে থিয়েটার দেখার কথা দিয়েছিল ভেবে এখন মনে মনে নিজেকেই গালাগাল করছে কিশোর।

'ভেতরে কোলাহল একটু কম হলেই বাঁচি,' রবিন বলল। 'নইলে তো কনসার্টই শুনতে পাব না।'

'ভেব না,' সান্ত্বনা দিল পাশে দাঁড়ানো একজন লোক। 'লোকের কোলাহল বেশি হলে স্পীকারের ভলিয়ুম বাড়িয়ে দেবে ওরা।'

অবাক হয়ে জিনার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার এ সব ভাল লাগে, জিনা?'

'ভেতরেও এ রকম চিৎকার করতে থাকলে তোমাদের আগেই আমি পালাব। বিশ্বাস করো, এমন জানলে কক্ষনো আসতাম না আমি। বান্ধবীদের কাছে এত প্রশংসা শুনলাম...'

'থাক, অত মন খারাপের কিছু নেই,' রবিন বলল। 'ঢুকেই দেখা যাক না। একটা অভিজ্ঞতা তো হবে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল কিশোর, থেমে গেল একটা লোকের ওপর চোখ পড়তে। দর্শকদের বেশির ভাগই তরুণ, কিন্তু এই লোকটা বয়স্ক। মোটা ভুরু, ঝোলা গোঁফ।

'কি হলো?' জানতে চাইল রবিন।

তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'ওই লোকটাকে দেখো!'

দেখল রবিন। 'কি হয়েছে তার?'

'চিনতে পারছ না? ওই লোকটাই আমার পকেটে শয়তানের মূর্তিটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।'

ভিড় ঠেলে ওদের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে লোকটা। তাকিয়ে আছে কিশোর।

আচমকা থমকে গেল লোকটা। কোন কিছু সতর্ক করে তুলেছে তাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত সরে যেতে লাগল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

একটা মুহূর্তও দেরি করল না আর কিশোর। রবিন আর জিনাকে ওখানে দাঁড়াতে বলে পিছু নিল লোকটার।

চার

ছুটতে ছুটতে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে একবার পেছন ফিরে তাকাল কিশোর, কি দেখে ভয় পেয়েছে লোকটা জানার জন্যে। লালচুলো একজন লোককে দেখল গুটানো একটা খবরের কাগজ লোকটার দিকে তাক করে ধরতে।

ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে বয়স্ক লোকটা। কিশোরের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল কি যেন। সামনে খট করে আরেকটা শব্দ হলো। চোখ বড় বড় করে দেখল সে, ইস্পাতের একটা ডার্ট বিঁধে আছে পার্কিং লটে যাওয়ার গেটের পাশে লাগানো বিরাট পোস্টারটাতে।

ঠাণ্ডা আতঙ্ক শিরশির করে নেমে গেল যেন কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে। ডার্টটা কাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে? তাকে, নাকি বয়স্ক লোকটাকে? তার উদ্দেশ্যে ছোঁড়া না হলেও যে ভাবে কানের পাশ দিয়ে গেছে, একটু এদিক ওদিক হলেই লেগে যেতে পারত। সর্বনাশ হয়ে যেত তাহলে।

উত্তেজিত কোলাহল, গুঁতোগুঁতি করছে দর্শকরা। বুঝতে পারছে না কি হয়েছে।

বয়স্ক লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কোনদিকে অদৃশ্য হয়েছে,

দেখতে পায়নি কিশোর। থামল না। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল রাস্তার দিকে। তাকাল এপাশে ওপাশে। কোথাও দেখা গেল না লোকটাকে।

গেটের কাছে ফিরে এল আবার সে। পোস্টারটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ডার্টটা নেই। খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরীক্ষা করে ওটা দেখার সুযোগও আর পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে সঙ্গীদের কাছে আবার ফিরে এল সে। থিয়েটারের দরজা খুলে গেছে। ফলে আর কোনদিকে নজর নেই লোকের, হুড়মুড় করে ঢুকে যাচ্ছে সব।

খানিকটা সরে দাঁড়িয়েছে জিনা আর রবিন, কিশোরের অপেক্ষা করছে। তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল জিনা, 'কি হয়েছে?'

'পরে বলব। চলো, ভেতরে চলো। যে রকম মারামারি লাগিয়েছে, আমাদের সীটগুলো কেউ দখল করে নিলেও অবাক হব না।'

বাইরের চেয়েও বেশি কোলাহল অডিটরিয়ামের ভেতরে। বদ্ধ জায়গা বলে কানে রীতিমত পীড়া দিতে শুরু করল। শুরু হলো কনসার্ট। কিন্তু কিছু বোঝে কার সাধ্য! ব্যাপারটা রীতিমত অত্যাচার হয়ে দাঁড়াল কিশোরের কাছে। রবিন আর জিনাও মনে হচ্ছে সহ্য করতে পারছে না। অথচ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে অন্য শ্রোতারা। ওরা চিৎকার না করলে হয়তো উপভোগ করা যেত, কিন্তু চুপ তো করছেই না, যতই ভাল লাগছে, আরও যেন ফেটে পড়ছে।

শেষে অসহ্য হয়ে কানে আঙুল দিল কিশোর। ইশারায় জিনা আর রবিনকে জানাল, সে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অন্য দু-জনও বেরিয়ে চলে এল তার পিছু পিছু।

বাইরে এখন আর লোক নেই, কোলাহলও নেই, শব্দের ভয়াবহ অত্যাচার থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন ওরা।

গাড়ি চালাতে চালাতে রবিন আর জিনাকে জানাল কিশোর, থিয়েটারের সামনে কি ঘটেছিল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল জিনা, 'নিশ্চয় বিষ মাখানো ডার্ট! মারা যেতে তো!'

'তোমাকেই মেরেছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। যতই ভাবছি, ততই শিওর হচ্ছি, ওই ঝোলা গোঁফওয়ালা লোকটাকে মেরেছে। সে লালচুলো লোকটাকে চিনতে পেরেই ছুটে পালাচ্ছিল। মজার ব্যাপার কি জানো, আমারও চেনা চেনা লাগল।'

'চিনতে পেরেছ?'

'না। মনে হলো চেনা, কোথাও দেখেছি, কিন্তু মনে করতে পারছি না।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। ভাবনায় ডুবে গেছে। হঠাৎ ফিরে তাকাল সে। আঙুল মটকাল। 'মনে পড়েছে! আইসক্রীম পারলারে দেখেছি ওকে। ভোঁতা-নাক লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঢুকেছিল।'

'তারমানে ওরা দু-জন মিলেই বোমাবাজিটা করেছে?'

'এ ছাড়া আর কি? রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরোনো শুরু হতেই আগুন আগুন বলে চিৎকারটা সম্ভবত ওই লালচুলোই করেছিল।'

'কিন্তু আমাদের পিছে লেগে আছে কেন? আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই গিয়ে হাজির হচ্ছে।'

'হতে পারে শয়তানের মূর্তিটা কেড়ে নেয়ার জন্যে। কিংবা গোঁফওয়ালা মানুষটার সন্ধান চায়। যেহেতু ওই লোকটা আমাদের ওপর নজর রাখে, লালচুলোর ধারণা, আমাদের পেছনে থাকলে ওর দেখা পেয়ে যাবে।'

রবিন আর কিশোরকে ইয়ার্ডে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল জিনা। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আসবে নাকি? বাড়ি ঢুকলেই তো কোন না কোন খবর পাচ্ছি। দেখবে?'

'চলো,' তার সঙ্গে এগোল রবিন।

বারান্দায় উঠতেই দেখা হয়ে গেল মেরিচাচীর সঙ্গে। অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। তাঁর ভঙ্গিই বলে দিল কিছু একটা ঘটেছে। কিশোরকে দেখেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কি, বল্ তো?'

'কি হয়েছে?'

'চোর-ডাকাতের আড্ডা হয়ে গেল নাকি বাড়িটা!'

'কি হয়েছে বলোই না?'

'প্রথমে লোকটাকে দেখলাম রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওপাশের বুড়ো এলম গাছটার নিচে। হাবভাব ভাল লাগল না, তাই নজর রাখতে লাগলাম তার ওপর। একটু পরে দেখি পেছনের বেড়ার কাছে উঁকি মারছে।'

হেসে ফেলল কিশোর, 'বাহ্, আজকাল দেখি তুমিও গোয়েন্দা হয়ে উঠছ। চাচা কোথায়?'

'বোরিস আর রোভারকে নিয়ে বেরিয়েছে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'চেহারা দেখিনি। একটা বড় হ্যাটের কানা কপালের ওপর টেনে দিয়েছিল। আলোতে আসেনি।'

'একবার ভাবলাম পুলিশে ফোন করি। তারপর ভাবলাম, তোরা আয়, বুঝে দেখি, তারপর।'

'রবিন, চলো তো দেখে আসি বেড়ার কাছে কি করছিল লোকটা?'

দুটো টর্চ নিয়ে বেরোল দু-জনে। বাড়ির চারপাশে, বেড়ার ভেতরে-বাইরে, এলম গাছের নিচে খুঁজল লোকটাকে। তাকে পাওয়া গেল না, তার কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। বার্গলার সিসটেমটা চালু করে দিয়ে ঘরে ফিরে এল কিশোর। রবিনকে বলল, 'আজ রাতে এখানেই থেকে যাও। মনে হচ্ছে কিছু ঘটবে। অসুবিধে হবে?'

'কি আর হবে। মা-কে ফোন করে দিচ্ছি।'

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে জানালার কাছে বসল দু-জনে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল। কিন্তু আর কাউকে আসতে দেখা গেল না, কিছু

ঘটলও না।

পরদিন সকালে নাস্তার পর আবার শহরতলিতে রওনা হলো কিশোর, পুরানো মাল আনার জন্যে। সেদিনও সঙ্গে চলল রবিন, মুসা, বোরিস আর রোভার। আগের দিন যা যা ঘটেছে সব মুসাকে জানিয়েছে রবিন আর কিশোর। বাড়িটাতে এসে অন্য তিনজনকে মাল তোলার দায়িত্বে রেখে রবিনকে নিয়ে পুরানো ম্যাপ আর ম্যানুস্ক্রিপ্টের ব্যবসায়ী মিস্টার লুইসের ওখানে চলল কিশোর।

পুরানো শহরে, একটা অনেক পুরানো বাড়িতে মিস্টার লুইসের দোকান। উপযুক্ত জায়গাতেই ব্যবসা খুলেছেন তিনি। ভেতরে ঢুকলেই মনে হয় একলাফে হাজারখানেক বছর পিছিয়ে আসা হয়েছে। ডিসপ্লে উইন্ডোতে কারুকাজ করা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা ম্যাপ ঝুলছে। ঘন ঘন জানালা থেকে সরানো হয় ওগুলোকে, বদলে বদলে লাগানো হয়—আন্দাজ করল কিশোর, নইলে রোদে রঙ নষ্ট হয়ে যেত। একটা ম্যাপ দেখা গেল, সতেরোশো সালের।

ছিপছিপে লম্বা মিস্টার লুইস, পোশাকও পরেছেন দোকানের আবহর সঙ্গে মিলিয়ে। তেরো-চোদ্দ শতকে যে রকম কাপড়ের চল ছিল, তেমন। এ পোশাকে বাইরে বেরোলে তাঁকে দেখার জন্যে লোক জমে যাওয়ার কথা।

গোয়েন্দারা নিজেদের পরিচয় দেয়ার আগেই লুইস বললেন, 'তোমরা নিশ্চয় কিশোর আর রবিন? একটু আগে মিস ডোনোভান ফোন করেছিলেন। তোমাদের আসার কথা বলেছেন।'

'তাই নাকি? খুব ভাল হলো। তারমানে আপনি আমাদের সাহায্য করছেন?'

'বলো, কি জানতে চাও?'

'মিস ডোনোভান বলেননি কিছু?'

'না, ফোনে ডিটেলস আলাপ হয়নি। তোমরা পুরানো একটা চিঠি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, এ কথাই কেবল বললেন।'

চিঠিটা বের করে দিল কিশোর। 'এটা দেখুন তো? আসল চিঠিরই ফটোস্ট্যাট কিনা?'

চারকোনা, বড় একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দু-তিন মিনিট ধরে চিঠির ফটোকপিটা পরীক্ষা করলেন লুইস। তারপর বললেন, 'আসলই তো মনে হচ্ছে। জালও হতে পারে। তবে জাল হলে ওস্তাদ কোন জালিয়াতের কাজ। কয়েকটা অক্ষর আর শব্দ দেখো কেমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা, দু-শো বছর আগে এ রকম করেই লেখা হত। তার মানে হাতের লেখা সম্পর্কেও ভাল জ্ঞান আছে লোকটার। তবে আসল চিঠিটা না পেলে শিওর হয়ে কিছু বলা যাবে না।'

'থ্যাংকিউ, স্যার,' কিশোর বলল। 'আরেকটা কথা, নিউ জারসির ঔপনিবেশিক আমলের কোন ম্যাপ আছে আপনার কাছে, যাতে পাইন ব্যারেন দেখানো আছে?'

বিস্মিত মনে হলো লুইসকে। 'তাজ্জব ব্যাপার!'
'মানে?'
'ও রকম একটা ভাল ম্যাপ ছিল আমার কাছে। ঔপনিবেশিক আমলের, সতেরোশো আটাত্তর সালের।'
'ওই জিনিসটাই তো আমাদের দরকার! ছিল বলছেন কেন?'
'পরশু রাতে চোর ঢুকেছিল দোকানে। ম্যাপটা চুরি করে নিয়ে গেছে! এখন তুমিও এসে ওই ম্যাপই চাইছ!'

পাঁচ

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। একটা কথাই ভাবছে দু-জনে: এমন কেউ চুরি করেছে ম্যাপটা, যে ডেগা গালুশের গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহী।
ওদের এই দৃষ্টি বিনিময় চোখ এড়াল না মিস্টার লুইসের। 'তোমাদের চিঠির সঙ্গে ম্যাপ চুরির সম্পর্ক আছে ভাবছ নাকি?'
'আন্দাজ করলেন কি করে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রবিন।
'সকালের কাগজে তোমাদের ইন্টারভিউ পড়লাম।'
পিটার সেবিলের কথা মনে পড়ল কিশোরের। অবাক হলো, এত তাড়াতাড়িই ছেপে দেবে ভাবেনি। বলল, 'বড় বড় কয়েকটা ম্যাপ দেখেছি, মিস্টার লুইস। নিউ জারসির একটা অটোমোবাইল ম্যাপও দেখেছি। কিন্তু কোনটাতেই সিডার নব জায়গাটা খুঁজে পেলাম না। চিঠিতে পরিষ্কার করে বলেছে ওখানেই গোপন আস্তানা ছিল ডাকাতদের।'
তার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'ম্যাপগুলোতে পারসনস ফোর্জও খুঁজে পাইনি। মিস ডোনোভান একটা বই দিয়েছেন, তাতে পাইন ব্যারেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সিডার নব নেই।'
মাথা ঝাঁকালেন লুইস। 'অবাক হওয়ার কিছু নেই। পুরানো অনেক নামই আস্তে আস্তে মুছে যায়, নতুন নাম দেয়া হয় ওসব জায়গার। আর পাইন ব্যারেনের মত এ রকম নির্জন জায়গা হলে তো কথাই নেই।'
'আপনার কাছে ম্যাপ আছে যে, চোরটা জানল কি করে?' কিশোরের প্রশ্ন।
লুইস জানালেন, ডিসপ্লে উইন্ডোতে দিয়েছিলেন ওটা।
'আর কিছু নিয়েছে?'
মাথা নাড়লেন ম্যাপ বিক্রেতা। 'না, শুধু ওটাই।'
'তারমানে চোরটা জানত কোন জিনিসটা তার দরকার,' রবিন বলল। 'পরশু রাতে চুরি হয়েছিল বলছেন তো?'
'হ্যাঁ। কাল সকালে দোকান খুলে দেখলাম ওটা নেই, অথচ আগের দিন

সন্ধ্যায়ও দেখে গেছি আছে।'

'তারমানে আমরা চিঠির কপিটা পাওয়ার আগেই মূল চিঠিটার ব্যাপারে জানত চোর।'

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু দেখি না। ধরা যাক, চিঠিটা আসল, দু-শো বছর আগে সত্যিই লেখা হয়েছিল, তাহলে এতদিনে অনেক লোকের চোখে পড়ার কথা ওটার।'

চুপ করে ভাবছিল কিশোর, মুখ তুলে তাকাল, 'চোখে পড়লে ইদানীং পড়েছে। আগে পড়লে আরও আগেই গুপ্তধনগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করা হত। আচ্ছা, আগের কথায় আসি আবার। যেটা চুরি হয়ে গেছে সেটা তো আর পাওয়া যাবে না, নিউ জারসির অন্য কোন ম্যাপ আছে আপনার কাছে, যেটাতে পাইন ব্যারেন দেখানো আছে?'

'উঁম...' ভাবলেন লুইস, গাল চুলকালেন, 'আছে একটা, তবে তাতে পাইন ব্যারেন আছে কিনা বলতে পারব না।' উঠে পেছনের ঘরে চলে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন পাতলা ট্র্যান্সপারেন্ট প্ল্যাস্টিকে মোড়া একটা ম্যাপ নিয়ে। সিভিল ওঅরের সময়কার আর্মি ম্যাপ, ভারজিনিয়া আর পেনসিলভ্যানিয়া এলাকায় মিলিটারি অপারেশন চালানোর সুবিধের জন্যে আঁকা হয়েছিল। তাতে নিউ জারসির দক্ষিণাঞ্চলও দেখানো আছে।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে গোয়েন্দাদেরকে সাহায্য করতে বসলেন লুইস। তবে নামটা খুঁজে পেল রবিন। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা 'সিডার নব' নামটার ওপর আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল, অনেকটা বর্শা দিয়ে খোঁচা মারার মত করে।

'ম্যাপটার নকল করে নিলে কোন অসুবিধে আছে, মিস্টার লুইস?' অনুমতি চাইল কিশোর।

'না না, অসুবিধে কি। দাঁড়াও, কাগজ দিচ্ছি।'

পকেট থেকে কলম বের করে আঁকতে বসে গেল রবিন। পুরোটা নয়, কেবল যে জায়গাটুকু ওদের দরকার, সেটুকু এঁকে নিতে লাগল যতটা সম্ভব নিখুঁত করে, যাতে পাইন ব্যারেনে গিয়ে খুঁজে পেতে অসুবিধে না হয়।

অহেতুক বসে রইল না কিশোর। পকেট থেকে শয়তানের মূর্তিটা বের করে লুইসকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ রকম জিনিস আর দেখেছেন?'

ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মূর্তিটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন লুইস। মাথা নেড়ে বললেন, 'না, দেখিনি। তবে এ ধরনের কাল্পনিক প্রাণীর মূর্তি অনেককে পোশাকে লাগিয়ে পরতে দেখেছি।'

'ওই যে জমিদার টাইপের লোকেদের তো? আমিও দেখেছি, ইউনিকর্ন, ড্রাগন, এ সব পরে থাকে।'

'আমি এক মহিলাকে চিনি, মিসেস ডেরা হপকিনস। আমার কাস্টোমার। জিনিআলজি, অর্থাৎ মানুষের বংশবৃত্তান্ত নিয়ে গবেষণা করেন। মানুষ যে কত বিচিত্র স্বভাবের হয়, কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন আমাকে। অবাক করে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিটার ব্যাপারে তিনি হয়তো তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন। তাঁর ঠিকানা আমি জানি না. তবে ফোন বুকে পেয়ে যাবে।'

ম্যাপ আঁকা হয়ে গেল রবিনের। মিস্টার লুইসকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। শহরতলির পুরানো বাড়িটার সামনে এসে দেখল, তখনও কাজ করছে মুসা, বোরিস আর রোভার। ট্রাকে মাল বোঝাই করছে।

কিশোরদের দেখেই ধপাস করে একটা বাক্সের ওপর বসে পড়ল মুসা, 'এক্কেবারে শেষ হয়ে গেছি, বুঝলে; খতম! বাপরে বাপ, টাকা রোজগার বড় কষ্ট···তা তোমরা তো মনে হয় আরামেই কাটিয়ে এসেছ। উন্নতি কিছু হলো?'

'মনে হয় শেষ পর্যন্ত পাইন ব্যারেনে যেতেই হবে আমাদের।'

'সে তো আমি আগেই জানি। সূত্রটূত্র পেয়েছ মনে হয়?'

'পেয়েছি। চলো, কোথাও বসে কথা বলি। খিদেও পেয়েছে।'

'আমি বোধহয় খেতে পারব না।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল রবিন আর কিশোর। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, খেয়ে নিয়েছ নাকি?'

'না,' করুণ ভঙ্গিতে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা, 'সময় পেলাম কোথায়?'

'তাহলে যে বলছ খেতে পারবে না? পেটে গোলমাল?'

'না। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি-পাকস্থলী সব হজম হয়ে গেছে। খাবার গিলে রাখব কোথায়?'

মুসার ভঙ্গি দেখে হাসতে শুরু করল সবাই। রবিন বলল, 'তোমার আসলে সিনেমায় অভিনয় করা উচিত। এত সুন্দর ভঙ্গি করতে পারো···'

'ভঙ্গি করলাম কোথায়? এটা তো আসল। অতিরিক্ত খিদে পেলে মুখ অমন পেঁচার মতই হয়ে যায় মানুষের।'

খিদে আসলে পাঁচজনেরই পেয়েছে। রেস্টুরেন্টে ঢুকে তাই বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ, চুপচাপ খেয়ে গেল। পেট কিছুটা শান্ত হলে দ্বিতীয়বার খাবারের অর্ডার দিয়ে কথা শুরু করল মুসা। হাতে করে নিয়ে আসা ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ রেখেছে টেবিলে। সেটা দেখিয়ে বলল, 'সেবিলের লেখাটা পড়লাম, প্রথম পৃষ্ঠাতেই বেরিয়েছে। এমন লেখা লিখেছে, মনে হয় যেন তিন গোয়েন্দাকে জগৎ-বিখ্যাত করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'আমরা তো ওকে আসতে বলিনি,' কোকের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলল রবিন। 'নিশ্চয় কেউ পাঠিয়েছে তাকে। এ ভাবে সাক্ষাৎকার ছাপানোর কোন উদ্দেশ্য আছে।'

রোভার বলল, 'তোমাদের ধারণা চিঠির সঙ্গে শয়তানের মূর্তিটার কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকার কোন প্রমাণ পাইনি এখনও,' জবাব দিল কিশোর, 'কেবল টাইমিংটা বাদে।'

'সন্দেহ করার আরও একটা কারণ আছে,' রবিন বলল। 'মিস ডোনোভানের বাড়ি থেকে আমরা বেরোনোর পর ভোঁতা-নাক আমাদের পিছু

নিয়েছিল।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না। অন্য কারণেও আমাদের পিছু নিয়ে থাকতে পারে। সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হয়, একসঙ্গে দুই ধরনের দুটো জটিল রহস্যে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। কিন্তু এ সবের পেছনে আসলে কি আছে কে জানে!'

'একটা সূত্র অবশ্য পেয়েছি আমরা,' রবিন বলল।

'কী?' জানতে চাইল মুসা।

'পাইন ব্যারেনের যেখানে গোপন আস্তানা করেছিল ডেগো গালুশ আর দলবল, তার ঠিকানা। যাবে নাকি গুপ্তধন শিকারে?'

'যাওয়াই তো উচিত। স্কুল ছুটি। ইয়ার্ডের কাজ করতে আর ভাল্লাগছে না। অন্য কিছু একটা করা দরকার।'

বোরিস কথা বলে কম। চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল। বলল, 'এক কাজ করো না, আমাদেরকেও সঙ্গে নাও। মিসেস পাশা বলেছেন, এই কাজটা সারা হলে আমাদের ক'দিনের ছুটি দেবেন। কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছে পাইন ব্যারেনে যাওয়া যায়। তোমরা যদি নাও আরকি সঙ্গে। কি বলিস, রোভার?'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ভাইয়ের কথায় সম্মতি জানাল রোভার।

ব্যাপারটা ভেবে দেখবে, কথা দিল কিশোর।

ট্রাক বোঝাই মাল নিয়ে ইয়ার্ডে ফিরল ওরা। বারান্দায় বসে আরাম করছে তিন গোয়েন্দা, এই সময় ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢুকল একটা গাড়ি। খরিদ্দার এসেছে মনে করে এগিয়ে গেল কিশোর। গাড়ি থেকে নামল একজন টাকমাথা, লম্বা লোক। কিশোরকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিশোর পাশা?'

অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না কিশোর, নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'তোমাকেই খুঁজছি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল লোকটা।

লোকটাকে ভাল মনে হলো না কিশোরের। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'আমার মক্কেলের কাছ থেকে ডেগো গালুশের যে চিঠিটা তোমরা কেড়ে এনেছ, সেটা ফেরত চাই,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোল লোকটার। লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ।

রবিন আর মুসাও এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে।

'দেখুন,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'ভদ্রভাবে কথা বলবেন। না জেনে কিছু বলবেন না। কেড়ে আনিনি আমরা ওটা। ডাকে এসেছে। কে আপনি?'

'ডফার। হারগিনস ডফার। অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল।'

'তাহলে তো আপনাকে আর বোঝানোর কিছু নেই। ভাল করেই জানেন, কারও বিরুদ্ধে এ ভাবে অভিযোগ করতে আসার আগে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। গায়ের জোরে কিছু বলতে আসাটা ঠিক না।'

'দেখো, ঠিক-বেঠিক আমাকে শেখাতে এসো না!' গর্জে উঠল ডফার।

কাছেই কাজ করছিল বোরিস, পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ডফারের অভদ্র

আচরণ তারও ভাল লাগছে না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কি হয়েছে?'

বিশালদেহী বোরিসের ভালুকের মত থাবা দেখে নরম হলো ডফার। কিশোরকে বলল, 'একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাদেরকে। ঝামেলায় না গিয়ে মিটমাট করে দেবার ব্যবস্থা করব আমার মক্কেলের সঙ্গে। তবে তোমাদেরকে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কড়া একটা জবাব দিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তা না করে ডাকল, 'আসুন।'

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে এনে ডফারকে বসাল সে। সঙ্গে সঙ্গে এল রবিন আর মুসা। 'হ্যাঁ, এবার বলুন, কি জানতে চান?'

'আজ সকালের পত্রিকায় দেখলাম, তোমাদের কাছে একটা চিঠি আছে, মার্চের তিন তারিখের, সতেরোশো একাত্তর সাল। লিখেছিল পাইন ব্যারেনের এক ডাকাত সর্দার, তার দলের লোকের কাছে। ঠিক, না বেঠিক?'

'ধরুন, ঠিক,' কাটা কাটা জবাব দিল কিশোর। 'তাতে কি?'

'ওই চিঠি রাখার কোন অধিকার নেই তোমার!' আবার গরম হয়ে উঠল ডফার। 'তোমার জিনিস নয় ওটা।'

'মনে হচ্ছে পত্রিকার লেখাটা ভালমত পড়েননি আপনি। আমার কাছে যেটা আছে সেটা আসল নয়, ফটোকপি। ডাকে পাঠানো হয়েছে। কে পাঠিয়েছে তা-ও জানি না।'

'লেখা, লেখাই। সেটা আসলই হোক, আর কপিই হোক। কপি হলেও লেখা কিংবা অর্থ তো আর বদলে যায় না। আমি চাই না ওতে কি লেখা আছে সবার সেটা জানা হয়ে যাক। দাও, চিঠিটা দাও!'

চুপ করে রইল কিশোর। চিঠি দেয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না।

উঠে দাঁড়াল ডফার। আরও লাল হয়ে গেছে মুখ। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখো, শেষবারের মত বলছি, চিঠিটা দিয়ে দাও। আমার মক্কেলের জিনিস, আদায় করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আমার আছে।'

মুসা আর রবিনের দিকে চট করে একবার তাকিয়ে নিল কিশোর—গম্ভীর হয়ে আছে রবিন, আর মুসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে শার্টের হাতা গোটানোর কথা ভাবছে সে। আরেকটু বাড়াবাড়ি করলে যেন ধরে মারই লাগাবে লোকটাকে। ডফারকে শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'দেখুন, আপনি আমাদেরকে কি ভাবছেন বুঝতে পারছি না, বড় বেশি ছেলেমানুষই বোধহয় মনে করেছেন। ভাবছেন, ধমকেই হবে। ভুল করছেন। যে রকম আচরণ করছেন, আমার তো এখন বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে যে আপনি একজন উকিল। দয়া করে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। চিঠিটা আমাদের কাছে কে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে, আন্দাজ করতে পারেন কিছু?'

'কোন প্রশ্নেরই জবাব আমি দেব না! আমি জেনে গেছি চোরাই চিঠিটা তোমাদের কাছে। ভাল চাইলে দিয়ে দাও, ব্যস, কথা শেষ।'

এবারও চুপ করে রইল কিশোর। চিঠি আনতে যাওয়ার লক্ষণ দেখাল

না।

একটা আঙুল পিস্তলের মত করে নিশানা করল তার দিকে ডফার। 'চিঠিটা রেখেছ কেন? গুপ্তধন খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

জবাব দিল না কিশোর।

ধমকে উঠল লোকটা, 'কি হলো, কথা বলছ না কেন?'

আর সহ্য করতে পারল না রবিন, ফুঁসে উঠল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ারও ইচ্ছে আমাদের নেই!'

'বেশ,' হিসহিস করতে লাগল যেন একটা সাপ, 'আমিও সাবধান করে দিচ্ছি, পাইন ব্যারেনের ধারে-কাছে যদি দেখা যায় তোমাদের, ভাল হবে না!'

'কি করবেন?' এইবার সত্যি সত্যি শার্টের হাতা গোটাতে আরম্ভ করল মুসা।

তাকে ধরে ফেলল কিশোর। ডফারকে বলল, 'হুমকি দেবেন না। আপনার হুমকির পরোয়া করি না আমরা। যা ইচ্ছে হয় তাই করব। এবার যেতে পারেন।'

গটমট করে বেরিয়ে গেল ডফার। তার গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

রবিন বলল, 'লোকটা উকিল হলে আমি আমার কান কেটে ফেলব।'

'ওর কানটা কেটে দিতে পারলেই বরং আমি খুশি হতাম,' হিসিয়ে উঠল মুসা। 'আমাদের হুমকি দেয়, সাহস কত!'

'এবার তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'গুপ্তধন খুঁজতে না গিয়ে আর পারব না। যেতেই হবে।'

'যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে শুরু করব নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। ক্যাম্প করার জিনিসপত্র সব নিয়ে যাব। মিস্টার সাইমনকে জানিয়ে যেতে হবে। দরকার হলে তাঁর বেপোর্টের বাড়িটা দখল করব আমরা। আরও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছে।'

'তবে তার আগে মিসেস ভেরা হপকিনসের কাছে বোধহয় একবার যাওয়া দরকার,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'কি বলো?'

'ভাল কথা মনে করেছ। চলো। রকি বীচ থেকে বেরোনোর আগেই সমস্ত খবরা-খবর ভালমত নিয়ে যাই। মুসা, যাবে নাকি?'

'ওখানে কি? মিস হপকিনসই বা কে?'

জানাল রবিন।

'শয়তানের মূর্তি নিয়ে গবেষণা করেন?' মুসার কণ্ঠে দ্বিধা। 'কেমন মানুষ জানি হন!'

'শয়তানের মূর্তি নিয়ে গবেষণা করে কে বলল তোমাকে? মানুষের চরিত্র নিয়ে গবেষণা করেন। গেলে, চলো।'

ঠিকানা বের করা কঠিন হলো না, ফোন বুক থেকে বের করে ফেলল রবিন। তার ফোক্স ওয়াগেনটাতে করেই রওনা হলো তিনজনে। বাড়িটা খুঁজে বের করতেও অসুবিধে হলো না।

মাঝবয়েসী একজন মহিলা, ধূসর চুল, আন্তরিক ব্যবহার। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যা ছিল মুসার, দূর হয়ে গেল। কেন এসেছে, জানাল কিশোর।

হাতে নিয়ে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূর্তিটা দেখলেন মিসেস হপকিনস। ভ্রুকুটি করলেন। মাথা নাড়লেন, 'না, এটার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। তবে চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না।...আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, দেখে নিই।'

তাক থেকে কয়েকটা মোটা মোটা বই নামিয়ে আনলেন মিসেস হপকিনস। উল্টে চললেন পাতার পর পাতা। কিন্তু থামার মত কিছু চোখে পড়ল না।

চতুর্থ বইটার মাঝামাঝি এসে থমকে গেলেন তিনি। টেবিল থেকে থাবা দিয়ে তুলে নিলেন মূর্তিটা। বইটা বন্ধ করে ফেললেন। উজ্জ্বল হলো চোখ। 'হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে হয়েছে কেন চেনা চেনা লাগছিল! কোথায় দেখেছি!'

ছয়

'কোথায়, মিসেস হপকিনস?' আগ্রহ উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'কোনও বইতে? ছবি?'

'না। পথের ধারের কোন একটা স্ট্যান্ডে। কোনটায় মনে করতে পারছি না। তবে এখান থেকে দূরে না ওটা।'

'এটাই, নাকি এ রকম কিছু? বিক্রি করার জন্যে রেখেছে?'

'না, এত ছোট না ওটা। সিরামিকের একটা স্ট্যাচু, ফুটখানেক উঁচু।'

'দেখতে একরকম?'

'অবিকল এক। ইস্, যদি খালি মনে করতে পারতাম কোন দোকানটায়!'

মনে করার চেষ্টা করছেন মিসেস হপকিনস। কপাল কুঁচকে কাছাকাছি হয়ে গেছে ভুরুজোড়া। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে! পুরানো উডল্যান্ড রোডের একটা স্ট্যান্ডে। রাস্তার ডানধারে। আজ সকালেই দেখেছি, গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময়। এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না তোমাদের।'

'আর দরকারও নেই। যথেষ্ট বলে ফেলেছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

মিসেস হপকিনসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। স্ট্যান্ডটা তখনই খুঁজতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল মুসার, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল তার মা তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন। একটা জরুরী কাজ আছে।

স্ট্যান্ড খোঁজার কাজটা তখনকার মত বাদ দিয়ে ফিরে চলল ওরা। মুসাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে কিশোরকে নিয়ে ইয়ার্ডে চলল রবিন। চা-নাস্তা খেয়ে আবার বেরোবে স্ট্যান্ডটা খুঁজতে।

ইয়ার্ডে ঢুকেই দেখল অফিসের বারান্দায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছে

একজন লোক। গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। বললেন, 'এসেছিস। কিশোর, এই ভদ্রলোক তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আবার কে এল? কাণ্ডটা দেখেছ? একের পর এক লোক খালি আসতেই আছে।'

'হুঁ, দামী লোক হয়ে গেলাম মনে হচ্ছে আমরা! চলো দেখি কি চায়?'

তবে উকিলের মত বদমেজাজী, উদ্ধত নন এই ভদ্রলোক। টুইডের জ্যাকেট গায়ে, পাইপ টানছেন, সুন্দর, নরম ব্যবহার। নাম বললেন, জন হাচিন্‌স।

'কি করতে পারি আপনার জন্যে, বলুন?' হাচিনসের মুখোমুখি সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমার চাচাত ভাই জিম হাচিন্‌সকে খুঁজে বের করে দিতে হবে।'

'উনি কি হারিয়ে গেছেন? নাকি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ নেই?'

'বিশ বছর আগে হারিয়ে গেছে।'

'এতদিন খবর নেননি কেন?'

'প্রয়োজন হয়নি। কিছুদিন আগে আমাদের এক চাচা মারা গেছে, সম্পত্তি রেখে গেছে জিমের নামে। তাকে খুঁজে না পেলে ওই সম্পত্তি হারাবে। কাগজে পড়লাম, তোমরা পাইন ব্যারেনে যাচ্ছ। আমার বিশ্বাস ওখানেই লুকিয়ে আছে জিম।'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'লুকিয়ে আছে কেন?'

'যদ্দূর মনে হয়, ওর ধারণা, পুলিশ এখনও ওর পিছু ছাড়েনি। কিন্তু বহু বছর আগেই তার ওপর থেকে কেস তুলে নেয়া হয়েছে, এটা বোধহয় জানে না সে।'

'খুলে বলুন সব। অসুবিধে আছে?'

মাথা নাড়লেন হাচিন্‌স। 'না।' পাইপটা দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে এনে ওটা দিয়েই গাল চুলকালেন। 'একজন মানুষ খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল জিমের ওপর। একদিন তার এক বন্ধুর অফিসে ঢুকে সাংঘাতিক ঝগড়া করে সে। এর কিছুক্ষণ পরই অফিসে মৃত পাওয়া যায় লোকটাকে। পুলিশ জানতে পারে, মারা যাওয়ার সামান্য আগে ওই অফিসে ঢুকেছিল জিম। তাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে ওয়ারেন্ট বের করে। তখন আমার কাছে সাহায্যের জন্যে আসে সে। আমি তাকে বের করে দিই।'

থামলেন হাচিন্‌স।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতার পর রবিন জিজ্ঞেস করল, 'সে যে অপরাধী নয় এ কথা তখন জানতেন না আপনি?'

'না। এমন সব সাক্ষি-প্রমাণ দেখিয়েছে পুলিশ, আমি ধরেই নিয়েছিলাম খুনটা জিমই করেছে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে আমার কখনোই ভাল সম্পর্ক ছিল না, তাই অহেতুক ঝামেলায় জড়াতে গেলাম না। পুলিশের কাছে ধরা দেয়ার পরামর্শ দিলাম তাকে। পালিয়ে গেল সে। ধরতে পারল না পুলিশ। গায়েব হয়ে গেল সে।'

'তারপর?' আগ্রহী হয়ে উঠছে কিশোর।

'আসল খুনী ধরা পড়ল। ওয়ারেন্ট তুলে নেয়া হলো জিমের ওপর থেকে। কিন্তু ততদিনে দু-বছর পার হয়ে গেছে। পত্রিকাওলারা ব্যাপারটা নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামাল না। খবর-টবরও ছাপল না। সে-জন্যেই বোধহয় খবরটা অজানা রয়ে গেল জিমের কাছে। ফিরে আর এল না সে।'

'পাইন ব্যারেনে গেছে এ সন্দেহ কেন হলো আপনার?'

মুখ বাঁকিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলেন হাচিনস। 'জায়গাটা খুব পছন্দ জিমের। এখানে যখন থাকত, অনেকবার ওখানে গিয়েছে। নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। বিশাল, নির্জন এলাকাটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল সে। শহরের চেয়ে বুনো এলাকা তার বেশি পছন্দ। এমনও বলত, অপরাধ করে গিয়ে লুকিয়ে থাকার জন্যে পাইন ব্যারেনের মত এত ভাল জায়গা আর হয় না। সে-জন্যেই সন্দেহ হয় আমার, ওখানেই গিয়ে লুকিয়েছে সে।'

রবিন জানতে চাইল, 'সম্পত্তির ব্যাপারটা কি, বলুন তো?'

নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরালেন হাচিনস। 'নগদ টাকা এবং সম্পত্তি, দুটোই রেখে গেছে চাচা। সঠিক অঙ্কটা বলতে পারছি না, তবে আমার উকিল জানিয়েছে, শুধু এস্টেটটার দামই বিশ লাখ ডলারের কম হবে না।'

শিস দিয়ে উঠল রবিন, 'অনেক টাকা!'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ভাই কত পাবেন?'

'আমি দশ লাখ, সে দশ লাখ। অর্ধেক অর্ধেক। কিন্তু সে যদি না আসে, সময়মত এসে তার পাওনা দাবি না করে, পুরোটাই আমি পেয়ে যাব। আমরা দু-জন ছাড়া চাচার আর কেউ ছিল না।'

'তারমানে,' আঙুল তুলল কিশোর, 'তাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারলে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে আপনার?'

'যাবে।'

'এত টাকা সহজে কেউ ছেড়ে দিতে চায় না।' জেরা শুরু করল রবিন, 'কিছু যদি মনে না করেন, বলবেন কি আপনি এতটা উদার হতে চাইছেন কেন?'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন হাচিনস। 'সত্যি কথাটাই বলি, বিশ বছর আগে হলে দিতে চাইতাম না। কিন্তু একজন নিরপরাধ লোককে সাহায্য না করে বের করে দেয়ার অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছি আমি এতগুলো বছর। অপরাধ না করেও এতগুলো বছর শাস্তি পেয়েছে একজন মানুষ, এটা ভাবলে আরও কষ্ট হয় আমার। সে-জন্যেই সুযোগ যখন একটা পেয়েছি তাকে সাহায্য করার, আর ছাড়তে চাই না আমি। ওকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে. সম্পত্তির ভাগ দিতেই হবে।' ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দিলেন ভদ্রলোক। শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'তা ছাড়া অর্ধেক পেলেও দশ লাখ ডলার পাব আমি, বিরাট অঙ্কের টাকা। একলা মানুষ, বিয়ে-থা করিনি, এই

টাকাতেই রাজার হালে কাটে আমার জীবন। আর বেশি লোভ করতে যাব কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দুই গোয়েন্দা। ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে। অবশেষে জানতে চাইল কিশোর, 'তাঁকে পেলে চিনব কি করে? এত বছরে নিশ্চয় অনেক বদলে গেছেন। নিশ্চয় নামও বদল করে ফেলেছেন।'

'সেটাই স্বাভাবিক,' একমত হলেন হাচিনস। 'আমার কাছে তার একটা ছবি আছে, অবশ্যই অনেক আগেকার। এটা দেখেই চিনে নিতে হবে।'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। খুলে দেখল কিশোর। লম্বা, কালো চুলওয়ালা এক তরুণ, আমেরিকান নেভির মেডিক্যাল কোরের পোশাক পরা।

'কলেজে থাকতেই নেভিতে যাওয়ার জন্যে নাম লিখিয়েছিল জিম,' হাচিনস বললেন। 'তাতে যোগ দেয়ার পর টাকা জমাচ্ছিল মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার জন্যে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হতে যখন আর মাত্র কিছুদিন বাকি, তখনই তার বিরুদ্ধে এল খুনের পরোয়ানা। কিছুই আর করা হলো না বেচারার।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হাচিনস।

'তাঁর কাছে যাওয়ার, কিংবা তাঁকে চিনে নেয়ার জন্যে কোন সূত্র দিতে পারেন?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে অ্যাশট্রেতে পাইপের ছাই ঝাড়লেন হাচিনস। 'তার একটা হবির কথা বলতে পারি। অবসর সময়ে ছুরি দিয়ে কেটে, চেঁছে কাঠের নানা রকম পুতুল বানাতে ভালবাসত সে। এখনও সেই হবিটা আছে কিনা জানি না। এ ছাড়া আর কোন সূত্র দিতে পারছি না।'

'হুঁ। ঠিক আছে, দেখি কি করতে পারি। তাঁর খোঁজ পেলে কি ভাবে জানাব আপনাকে?'

ঠিকানা লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হাচিনস। গোয়েন্দাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সোফায় বসে চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ?'

'উঁ! ভাবছি, তিনটে রহস্যই একদিকে নির্দেশ করছে। সব এক সূত্রে গাঁথা নয় তো?'

'মানে?'

'তিনটে ঘটনার একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক নেই তো?'

'থাকতেও পারে।'

'হুঁ, চলো বেরোই। কোন স্ট্যান্ডে শয়তানের মূর্তি দেখেছেন মিসেস হপকিনস, দেখে আসি।'

পুরানো উডল্যান্ড রোডে রওনা হলো ওরা।

এমনিতেই নির্জন থাকে জায়গাটা, এ সময়ে আরও নির্জন। স্ট্যান্ড আছে মোট তিনটে। দুটো দেখা গেল বন্ধ। আর বাকি যে একটা খোলা আছে,

তাতে ওরকম কোন মূর্তি নেই। বন্ধ দুটোতে দেখতে হলে পরদিন আবার আসতে হবে।

নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে চলল ওরা।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিন, বাড়িতে কোন কাজ আছে তোমার?'

অবাক হলো রবিন, 'নেই। কেন?'

'আজও আমাদের বাড়িতেই থেকে যাও। কেন যেন মনে হচ্ছে, আজ রাতে কিছু ঘটবেই। আন্টিকে ফোন করে দাও, তুমি যাবে না।'

'কিছু ঘটবে কেন মনে হচ্ছে তোমার?'

'ইন্সটিংক্ট। মন বলছে।'

কিশোরের কথাই সত্যি হলো। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই, তার আধঘন্টা পরেই খুট করে একটা শব্দে জেগে গেল কিশোর। দেখল, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ঘরের দরজা। লম্বা একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল ঘরে।

বালিশের পাশে রাখা টর্চটা তুলে নিয়েই মূর্তিটাকে সই করে বোতাম টিপে দিল কিশোর। তাজ্জব হয়ে গেল। চোখ মিটমিট করছে লোকটা! সেই ঝোলা-গোঁফ, শয়তানের মূর্তিটা পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে লোক!

সাত

রবিনও জেগে গেছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মানুষটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল দু-জনে।

ঝোলা গোঁফ টেনে খুলে ফেলল মানুষটা। ভুরু খুলল। রবারের নাকের ডগাটা খুলে নিয়ে পরচুলা ধরে টান দিতেই চিনে ফেলল কিশোর, আরও অবাক হয়ে বলে উঠল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি,' মুচকি হাসলেন গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন। 'বার্গলার অ্যালার্মটা বিকল করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। এমন জায়গায় লুকিয়েছ তারগুলো, খুঁজে বের করাই মুশকিল।'

'কিন্তু তারপরেও বের তো করে ফেলেছেন,' কিশোরও হাসল। 'এত রাতে কি মনে করে? আমার পকেটে মূর্তিটাই বা রাখতে গেলেন কেন?'

'আরে দাঁড়াও না, বলতেই তো এসেছি। আগে বসি।'

এতক্ষণে খেয়াল হলো কিশোরের, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার সাইমন। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিল সে।

'এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে?'

'নিশ্চয়।' বেরিয়ে গেল কিশোর। দশ মিনিট পরেই ট্রেতে চায়ের কাপ আর কিছু বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

বিস্কুট নিলেন না সাইমন। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। কয়েকবার চুমুক দিয়ে আবার ওটা পিরিচে নামিয়ে রেখে শুরু করলেন, 'ছদ্মবেশে থেকে একটা তদন্ত করছি এখন। মানুষ শিকার বলতে পারো। আন্তর্জাতিক ভাবে কুখ্যাত একজন অপরাধী এল ডিয়াবোলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'ডিয়াবোলো! স্প্যানিশ শব্দ!' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন। 'এর মানে তো শয়তান, তাই না?'

'হ্যাঁ। খোঁজখবর করে জেনেছি লোকটা ল্যাটিন আমেরিকান। ওখানকার মানুষ স্প্যানিশ নামই রাখে বেশি। স্বভাবের সঙ্গে নামটা তার পুরোপুরি মানিয়ে গেছে।'

'তার বিরুদ্ধে কি কি অপরাধের অভিযোগ আছে?'

'কি অপরাধের নেই। চোরাচালান, বিদেশী গুপ্তচরদের ঢোকার ব্যবস্থা করা, চোরাই মাল পাচার, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের অবৈধ রপ্তানী, এবং আরও যত রকমের বেআইনী কাজ করা সম্ভব, সবই করে সে।' সাইমন জানালেন, এফ বি আই যে তার বিরুদ্ধে লেগেছে এটা বুঝে ফেলেছে ডিয়াবোলো, তাই ওদের ব্যাপারে সাবধান হয়ে গেছে। সে-জন্যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য চেয়েছে ওরা, যাতে লোকটার অজান্তে পেছনে লাগিয়ে রাখতে পারে।

'আপনি কতটা এগিয়েছেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'তেমন একটা পারিনি। সাংঘাতিক চালাক লোক।'

'কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি?'

'একেবারে পাওয়া যায়নি তা নয়। এফ বি আইয়ের ওয়ান্টেড লিস্টে হ্যামার নামে এক অপরাধীর নাম ছিল। কয়েক দিন আগে নিউ জারসির পাইন ব্যারেনের এক গ্যাস স্টেশন থেকে ধরা হয়েছে তাকে।'

পাইন ব্যারেনের নাম শুনেই সতর্ক হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। কিছু বলল না।

সাইমন বললেন, 'সেদিন সাদা পোশাকে একজন পুলিশ অফিসার গ্যাস স্টেশনটায় ঢুকেছিল গাড়ি মেরামত করাতে। এই সময় হাঁটতে হাঁটতে সেখানে ঢোকে হ্যামার। একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার, গ্যাস স্টেশনে ঢুকতে গেল কেন লোকটা? সঙ্গে গাড়িটাড়ি থাকলেও নাহয় এক কথা ছিল···যাই হোক, দেখেই চিনতে পারে তাকে অফিসার, ধরে ফেলে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, হ্যামারের সঙ্গে ডিয়াবোলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে এ ব্যাপারে কোন কথা বের করা যায়নি। প্লাস্টিকে তৈরি শয়তানের মূর্তিটা তার পকেটেই পাওয়া গেছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। 'কোথায় ওটা?'

টেবিলের একটা গোপন কুঠুরি থেকে মূর্তিটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল কিশোর।

'ভয়ঙ্কর চেহারা, তাই না?' সাইমন বললেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'সাংঘাতিক। হ্যামারের কাছে এই জিনিস কেন? শয়তান পূজারী সংঘটনের সদস্য না তো?'

'মনে হয় না। তবে একটা কথা বলতে পারি, জিনিসটার ভয়ানক কোন অর্থ আছে। অনেক চোরডাকাতের আড্ডায় গেছি এটা নিয়ে, যাকেই দেখিয়েছি, চমকে উঠেছে। আমাকে লুকিয়ে ফিসফাস করে ডিয়াবোলোর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি।'

'এটা দিয়ে কি হয়, কাউকে জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছি। সবাই চুপ হয়ে যায়। কারও মুখ খোলাতে পারিনি। ডিয়াবোলোর দলকে খুব ভয় পায় মনে হলো ওরা।'

সাইমন জানালেন, খোঁজ করতে করতে পাইন ব্যারেনের ওদিকে একটা কাফের সন্ধান পেয়েছেন তিনি, যেটাতে নিয়মিত আড্ডা দিতে যায় বড় বড় অপরাধীরা। সেখানে গিয়ে ডিয়াবোলোর নাম জিজ্ঞেস করতেই পেছনে লাগল দু-জন লোক, একজনের লাল চুল, আরেকজনের ভোঁতা-নাক।

'আমার পিছু নিয়ে রকি বীচেও এসে হাজির হয়েছে ওরা,' বললেন তিনি। 'বুঝতে পারলাম, আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। মূর্তিটাই একমাত্র সূত্র, হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে শেষে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলতে চাইলাম। ভাবতে লাগলাম, তেমন নিরাপদ জায়গা কোথায় আছে। প্রথমেই মনে পড়ল তোমার নাম। ইয়ার্ডে এসে শুনলাম পুরানো মাল আনতে গেছ। ছুটলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার আগেই টের পেলাম, চর লেগে আছে পেছনে। আর কোন উপায় না দেখে কৌশলে মূর্তিটা তোমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম।'

'কিন্তু ওরা দু-জনেই এ কাজ করতে দেখে ফেলেছে আপনাকে,' কিশোর বলল। 'আমার চমকে ওঠাতেই বোধহয় বুঝে ফেলেছে ওরা। আপনাকে পকেটমার ভেবেছিলাম।'

তার পরের ঘটনা সব সাইমনকে খুলে বলল দুই গোয়েন্দা।

এরপর পাইন ব্যারেন নিয়ে আলোচনা হলো। সাইমনের সন্দেহ ডিয়াবোলো ওখানেই লুকিয়ে আছে, হ্যামার ধরা পড়াতে সন্দেহটা আরও জোরদার হয়েছে তার। বললেন, 'চোরাচালানের জন্যে জায়গাটার তুলনা হয় না। সাগরের পাড়ে, ঘন জঙ্গল, প্রচুর গুহা, চোরাই মাল লুকিয়ে রাখারও খুব সুবিধে। কাগজে পড়লাম তোমরা পাইন ব্যারেনে যাচ্ছ, তাই লুকিয়ে দেখা করতে চলে এলাম। ছদ্মবেশে আছি, বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, অন্য কোন ভাবে দেখা করতে গেলেও শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারি। এটাই নিরাপদ মনে হলো। রওনা হচ্ছ কবে?'

'কালকেই।'

'চোখকান খোলা রাখবে। ডিয়াবোলোর দলের ওপর নজর রাখার চেষ্টা কোরো পারলে।'

'করব। যদি ওদের খুঁজে পাওয়া যায়।'

'প্রয়োজন মনে করলে বেপোর্টে আমার বাড়িটায় চলে যেয়ো।'

'আচ্ছা।'

ইয়ার্ডের কাজের ঝামেলা কমেছে। বোরিস আর রোভারের ছুটি নিতে অসুবিধে হলো না। সুতরাং পরদিনই তিন গোয়েন্দার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল ওরাও। নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে দুটো ভাল গাড়ি ভাড়া করে স্থলপথে রওনা হলো নিউ জারসিতে। একটা গাড়িতে টেলিফোন সুবিধে সহ নানারকম আধুনিক সুবিধে রয়েছে। অন্যটা ভ্যান গাড়ি, মালপত্র বহন করার জন্যে। সঙ্গে ক্যাম্প করার সরঞ্জাম নিয়েছে।

রোদ ঝলমলে আকাশ, একবিন্দু মেঘ নেই আকাশের কোথাও। গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে ধরে দক্ষিণে এগিয়ে চলল ওরা। পাইন ব্যারেনের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ল বুনো অঞ্চলে। চোখের পলকে গিলে নিল যেন ওদেরকে বিরাট বন। চারপাশে ঘন গাছপালা। তলায় মাটির চেয়ে বালিই বেশি। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজ আর সবুজ, যেন একটা সবুজ সাগর।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'নিউ ইয়র্ক সিটির এত কাছে এমন এক বিশাল বন আছে, কে ভাবতে পারবে!'

পেছনে ফেলে আসা ব্যস্ত মহাসড়কের তুলনায় এখানকার নীরবতা আর নির্জনতা রীতিমত পীড়াদায়ক। পাইনবনের মাথার ওপর দিয়ে দূরের দু-একটা টাওয়ারের চূড়া কেবল চোখে পড়ে।

বনের মধ্যে দিয়েই পার হয়ে এল ওরা ছোট একটা শহর, নাম শ্যাটসওয়ার্থ, পাইন ব্যারেনের রাজধানী বলা হয় এটাকে। এখান থেকে দক্ষিণে মোড় নিল ওরা। বড় বেশি আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে কয়েক মাইল এগোতে না এগোতেই পথ হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হতে লাগল।

অনেক ঘুরেফিরে চলার পর একটা বাড়ি চোখে পড়ল। অনেক পুরানো। রোদ-বাতাস-ঝড় যতটা পেরেছে অত্যাচার করেছে বাড়িটার ওপর। একধারে একটা কাঁদায় ভরা জলাভূমি, তাতে বঁইচি জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে আছে। জলাভূমির কিনারে ঘন ঘাস। বাড়ির সামনে একটা পুরানো পিকআপ ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

'থামো,' মুসাকে বলল কিশোর। 'এখানে জিজ্ঞেস করে নিই।'

গাড়ি থামাল মুসা। তাদের পেছনে ভ্যান থামাল বোরিস।

পাঁচজনেই নামল, হাঁটাহাঁটি করে হাত-পা খেলিয়ে নেয়ার জন্যে। একেবারে জড় হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরোল সাদা-চুল একজন মানুষ। রোদে পোড়া চামড়া। আন্তরিক হাসিতে গভীরতর হলো মুখের রেখাগুলো। 'কোন সাহায্য করতে পারি?'

'সাহায্য চাইতেই তো নেমেছি,' কিশোর বলল। 'সিডার নবে যাব আমরা। কিন্তু মনে হচ্ছে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'হারাওনি, ঠিক পথেই যাচ্ছ,' লোকটা বলল। 'এই রাস্তা ধরেই আরও মাইল তিনেক এগিয়ে বাঁয়ে আরেকটা কাঁচা রাস্তা পাবে। সেটা ধরে গেলেই পেয়ে যাবে সিডার নব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' পকেট থেকে জিম হাচিনসের ছবিটা বের

করল কিশোর। 'আরেকটা কথা,' ছবিটা দেখিয়ে বলল সে, 'আমাদের বলা হয়েছে এই লোকটা পাইন ব্যারেনে থাকে। একে আমাদের দরকার। চিনতে পারেন? দেখেছেন কখনও?'

ছবিটার দিকে চোখ পড়তেই হাসি মুছে গেল লোকটার মুখ থেকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'না।' আর একটাও কথা না বলে, ঘুরে, গটমট করে হেঁটে চলে গেল ঘরের ভেতর। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

'খাইছে!' অবাক হয়ে বলল মুসা, 'হঠাৎ কি হলো তার?'

'কি জানি,' কোমরে একহাত রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'অপরিচিত কাউকে বোধহয় কেবল পথের ঠিকানাই বলে এখানকার মানুষেরা। অন্য কিছু জানতে চাইলেই মুখে তালা!'

আবার এগোল ওরা। নিরাপদেই গন্তব্যে এসে পৌঁছল। সিডার নব কোন শহর নয়, একটা বনে ছাওয়া পাহাড়, সামনে চমৎকার হ্রদ। টলটলে পরিষ্কার পানি। ক্যাম্প করার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে কাঠের একটা ছাউনির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল ওদের।

রবিন বলল, 'ঝড়বৃষ্টির দিনে বোধহয় এটাতেই মাথা গুঁজতে আসত ডেগো গালুশের লোকেরা।'

গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে তাঁবু খাটানোয় ব্যস্ত হলো পাঁচজনে। কিছুক্ষণ পর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পেল, এগিয়ে আসছে এদিকেই। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা পুরানো পিকআপ ট্রাক। তাঁবু দেখে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল ড্রাইভার।

কথা বলার জন্যে এগিয়ে গেল গোয়েন্দারা।

'ক্যাম্প করেছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'খুব সুন্দর জায়গা।'

'তা তো বটেই। তবে সাবধানে আগুন জ্বালবে। দাবানল লাগিয়ে দিয়ো না।'

'না না, তা লাগাব না। বনে ক্যাম্প করে অভ্যাস আছে আমাদের।' পকেট থেকে ছবিটা বের করল কিশোর। লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটাকে আমাদের দরকার। কখনও দেখেছেন?'

সাদা-চুল সেই বুড়োর মতই চোখের পলকে হাসি উধাও হয়ে গেল এই লোকটারও। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'শোনো, এখানে থাকতে চাইলে একটাই শর্ত, কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না, কোন ব্যাপারে খুঁতখুঁত করবে না, খোঁজখবর করবে না। যদি করো, বিপদে পড়বে। আমার কথাটা মনে রেখো।'

আট

রাগত ভঙ্গিতে গীয়ার দিয়ে ট্রাক নিয়ে চলে গেল লোকটা। তার মেজাজের এই আচমকা পরিবর্তনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছেলেরা।

'চমৎকার!' বিড়বিড় করল মুসা। 'শুরুতে দেখে মনে হয় কত ভাল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞেস করলেই যেন বোলতায় হুল ফুটায়! এমন কেন?'

'ওই যে বললাম,' কিশোর বলল, 'এখানকার মানুষের ব্যাপারে বহিরাগতদের নাক গলানো পছন্দ করে না।'

রবিন বলল, 'জিমের কথা জিজ্ঞেস করলেই বোধহয় রাগে বেশি। কোন ব্যাপার আছে।'

সবারই খিদে পেয়েছে। সঙ্গে করে আনা টিনের খাবার দিয়ে খাওয়া সেরে বাজার করতে বেরোল কিশোর আর রবিন, তাদের সঙ্গে চলল রোভার—এলাকাটা দেখার জন্যে। পাথরের একটা ফায়ারপ্লেস বানাতে রয়ে গেল মুসা। হ্রদের পাড়ে গিয়ে মাছ ধরতে বসল বোরিস।

বিশ মিনিটের মধ্যে একটা চৌরাস্তার মোড়ে স্টোরটা আবিষ্কার করল কিশোররা। দোকানের মালিক থলথলে ভুঁড়িওয়ালা, টাকমাথা এক লোক। যে দু-জনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই দেখা হয়েছে ওদের, তাদের মতই হাসিখুশি, আন্তরিক। প্রচুর কথা বলে। কথা বলার লোক পায় না বলেই বোধহয় ওদের দেখে মুখ ছেড়ে দিয়েছে।

'কতদিন থাকবে সিডার নবে?' জানতে চাইল দোকানি। 'এক হপ্তা? দুই?'

'ঠিক বলতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে এতদিন বোধহয় থাকব না।'

জিমের ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি লোকটাকে কোন প্রশ্ন করল না সে। বেশ কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে আলাপের পর পকেট থেকে বের করল শয়তান-পুতুলটা। কাউন্টারে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি জিনিস বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়,' হাসি আরও বিস্তৃত হলো লোকটার। 'এর নাম জারসি ডেভিল।'

কিছুই না বুঝে লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনজনে।

রবিন বলল, 'কি ডেভিল!'

'জারসি ডেভিল,' একই জবাব দিল দোকানি।

'ওটা আবার কি?' প্রশ্ন করল রোভার।

'কয়েকটা গল্প চালু আছে জারসি ডেভিলকে নিয়ে,' হ্যাটটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে কপালে হাত বোলাল দোকানি। আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে খুশি হয়েছে। 'কোনটা শুনতে চাও?'

'বলুন যেটা ইচ্ছে,' কিশোর বলল।

'বেশ, শোনো। এই এলাকায় এক মহিলা বাস করত, নাম মাদার কোরিন, এক এক করে বারোজন ছেলেমেয়ে হয়েছিল তার, সব স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু তেরো নম্বরটা হলো শয়তান। ও জন্মালই শয়তানের চেহারা নিয়ে, ডানাওয়ালা, লেজওয়ালা, রাতের অন্ধকারে ঘরের চিমনির ওপর উড়ে বেড়ায়।'

দোকানির দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'সুন্দর রূপকথা। তারপর?'

'ভয় পেতে লাগল লোকে। তেরো নম্বর ছেলেটা কেন শয়তান হলো কানাঘুষা চলল। কেউ বলল, এক জিপসির অভিশাপে এমন হয়েছে। কেউ বলল পাদ্রীর অভিশাপে।'

একটা কৌটা বের করল দোকানি। সেটা থেকে একটিপ খইনি নিয়ে নাকে গুঁজে হ্যাঁচচো হ্যাঁচচো করল। তারপর বলল, 'গল্পটা অনেক পুরানো। সেই সতেরোশো সালের। এখনকার চেয়ে তখন কুসংস্কারে অনেক বেশি বিশ্বাস করত মানুষ। কিন্তু তাই বলে ভেবো না মাদার কোরিনের গল্পটা একেবারেই বানোয়াট। অনেকেই ডানাওয়ালা ছেলেটাকে চিমনির ওপর উড়তে দেখেছে। আজও নাকি মাঝে মাঝে বনের মধ্যে জারসি ডেভিলের দেখা মেলে।

'সবচেয়ে বেশি দেখেছে দক্ষিণ জারসির লোকেরা। খিদে পেলেই নাকি পোষা গরুছাগল ধরে খেয়ে ফেলে শয়তানটা, বাগে পেলে মানুষকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না।

'গত দু-শো বছরের মধ্যে ওটাকে সবচেয়ে বেশিবার দেখা গিয়েছিল উনিশশো নয় সালে,' বলতে লাগল দোকানি। 'তখন তিরিশটা শহরের লোকে একহপ্তা ধরে ঘন ঘন দেখেছিল শয়তানটাকে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এলাকার মানুষ। শুধু যে সাধারণ মানুষে দেখেছে তা নয়, পুলিশের অনেকেও দেখেছে। ক্যামডেনের একদল লোক স্পষ্ট দেখেছে ওটাকে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যেতে।'

কৌতূহলী হয়ে শুনছে গোয়েন্দারা।

আমেরিকার উন্নত শহরে বাস করলেও রোভার আর বোরিস এখনও অনেক কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। এই আধুনিক যুগেও ডাইনী আর ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে ব্যাভারিয়ার লোকেরা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আর ওটাকে দেখা যায়?'

'যায়। বহুবার দেখা গেছে এই বনের মধ্যে। লোকে বলে, মাথার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে উড়ে যায় ওটা। এই তো কদিন আগে এক চাষী বলে গেল, তার একঝাঁক হাঁসকে নাকি জখম করে দিয়ে গেছে কি একটা অদ্ভুত জীবে। পুলিশকে জানিয়েছে সে। পুলিশ এসে দেখেছে, একটা আজব দাগ চলে গেছে বনের মধ্যে।'

যে প্রশ্নটার জবাব জানতে চেয়েছিল কিশোর, সেটার জবাব না দিয়ে আরেক দিকে চলে গেছে দোকানি। স্থানীয় কিংবদন্তী শোনার আগ্রহ হারাল

কিশোর, পরিষ্কার করে বলল, মূর্তিটা কোথা থেকে এসেছে জানতে চায় সে। থমকে গেল দোকানি। কয়েক মুহূর্ত জবাব দিতে পারল না। তারপর বলল, 'আমার বিশ্বাস, একজন লোকই জারসি ডেভিলের মূর্তি বানানোর ক্ষমতা রাখত, স্বয়ং ডেগো গালুশ।'

'পাইন ব্যারেনের সেই ডাকাত সর্দার?' জিজ্ঞেস করল রবিন, 'বহু বছর আগে আউট-ল হয়ে গিয়েছিল যে?'

'হ্যাঁ। তবে তার তৈরি মূর্তি এটার মত ছোট্ট প্লাস্টিকের পুতুল ছিল না। সে বানিয়েছিল লোহা দিয়ে, অনেক বড় করে। সিডার নবের একটা গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল মানুষকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। যাতে বাইরের কেউ ঢুকে ডাকাতদের গোপন আস্তানার খোঁজ পেয়ে না যায়।'

'ওই মূর্তিটার কি হলো জানেন কিছু?' জানতে চাইল কিশোর।

'না। ইদানীং আর কেউ দেখেছে বলে না। বোধহয় কোন ট্যুরিস্টের হাতে পড়েছিল, স্যুভনির হিসেবে নিয়ে চলে গেছে।'

প্রচুর কথা বলে দোকানি, অনেক বলেছে জারসি ডেভিল সম্পর্কে, কিন্তু তার মধ্য থেকে কাজে লাগার মত কোন তথ্য বের করতে পারল না কিশোর। এতক্ষণে জিম হাচিনসের ছবিটা বের করল সে। দেখাল। দেখে অন্য দু-জনের মত রাগল না দোকানি, তবে কিছু বললও না। ছবিটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল, মাথা নাড়ল, তারপর চুপচাপ চলে গেল পেছনের ঘরে। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল ওদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে তার।

বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না গোয়েন্দাদের।

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

উত্তেজিত হয়ে আছে মুসা। বোরিস তখনও হ্রদের পাড়ে মাছ ধরছে।

'কি পেয়েছি দেখো এসে!' কিশোররা গাড়ি থেকে নামতেই বলল মুসা।

ডাকাতের ছাউনির ধ্বংসাবশেষের কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল সে। কাঠের গায়ে খোদাই করা অক্ষরগুলো দেখাল। পচে গেছে কাঠ। কিন্তু তবু পড়া যায় লেখাটা: FISHHOOK P.

'আরে!' ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'ডেগো গালুশের চিঠিতেও তো ফিশহুক কথাটা লেখা আছে!'

চিঠিটা বের করল কিশোর। বাক্যটা পড়ল আরেকবার: ফিশহুকে তার নিচেই রেখেছি রূপাগুলো, দশ কদম উত্তরে কাক যেখানে ওড়ে।

মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি মনে হয়?'

'এখানেই কোথাও গুপ্তধন লুকানো আছে বলছে?'

রবিনের কথায় মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। চিঠিটা পড়ে মনে হয়, দলের দু-জন লোকের কাছে চিঠিটা পাঠিয়েছিল ডেগো, যারা তখন সিডার নবেই ছিল। ওদেরকে বলা হয়েছে তার সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে, তারমানে সে তখন এখানে ছিল না, অন্য কোথাও ছিল। তাহলে রূপার জিনিসগুলোও এখানে ছিল না, অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছিল সে।'

দোকান থেকে আনা খাবার রান্না করে খেয়ে নিল ওরা। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে তখন বনতলে। ক্যাম্পের আগুনের পাশে গল্প করতে বসল পাঁচজনে। জারসি ডেভিলের কথা শুনে মুসা আর বোরিস দু-জনেই ভয় পেয়ে গেল।

'এ ধরনের কাহিনী আমাদের ব্যাভারিয়াতেও শোনা যায়,' বোরিস বলল। 'তবে এটা আরও ভয়ঙ্কর।'

'রাতের বেলা এসে যদি চড়াও হয়?' ভয়ে ভয়ে বনের দিকে তাকাতে লাগল মুসা।

'আরে দূর!' হাত নাড়ল কিশোর। 'এসব গালগল্প বিশ্বাস করে ভয় পাওয়ার কোন মানে হয় না। রাতে বনের মধ্যে কত রকমের শব্দই হতে পারে, পেঁচা ডাকে, নিশাচর অন্য প্রাণীর ডাকও শোনা যায়। ওগুলোরই কোনটাকে জারসি ডেভিলের চিৎকার বলে ভুল করে হয়তো লোকে।'

বেশি রাত করল না ওরা, সকাল সকালই শুয়ে পড়ল। রাতের বেলা একটা ভারী শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। সেটা আবার শোনার আশায় কান পেতে রইল।

শোনা গেল আবার। বুম করে উঠল।

'শুনলে?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

'কিসের শব্দ?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো, দেখা যাক,' কিশোর বলল।

তাঁবু থেকে সাবধানে বেরিয়ে এল ওরা। নিভে এসেছে ক্যাম্পের আগুন। কোথা থেকে হয়েছে শব্দটা, বোঝার জন্যে আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল তিনজনে।

তাঁবুর দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল বোরিস, 'কি-কিছু দেখলে?' গলা কাঁপছে তার।

বিশালদেহী মানুষটার এমন জুজুর ভয় দেখলে হাসি পায় কিশোরের। কিন্তু এই মুহূর্তে পেল না। আওয়াজটা তার কাছেও অদ্ভুত লেগেছে। 'না, দেখিনি,' জানাল সে।

'অনেকক্ষণ থেকেই শব্দটা শুনছি,' মুসা বলল। 'এরকম হলে ঘুমানো যায় নাকি। শয়তানের গল্প খামোকা করে না এখানকার মানুষ।'

কিসে শব্দ করছে দেখার জন্যে টর্চ জ্বেলে পাহাড়টার দিকে এগোতে যাবে কিশোর, এই সময় ওপরের অন্ধকার থেকে ডাইভ দিয়ে নেমে এল একটা বড় পাখি। ডানা ছড়িয়ে কোণাকুণি উঠে যাওয়ার সময় আবার বুম করে শব্দ হলো একটা। পাখিটাই করল।

হেসে ফেলল রবিন। 'নিশাচর বাজ।'

'হ্যাঁ, পোকা ধরছে,' কিশোর বলল। 'চলো, ঘুমাতে যাই। মুসা, ভয় গেছে তোমার?'

মুখ গোমড়া করে মুসা বলল, 'জঘন্য শব্দ করে! পাখি যে এমন করতে পারে জানতাম না!'

পরদিন সকালে, ওরা যখন নাস্তা তৈরি করতে বসেছে এই সময় মোটরসাইকেলে চড়ে হাজির হলো একজন লোক। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'মর্নিং!'

তার সঙ্গে কথা বলতে গেল তিন গোয়েন্দা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর পকেট থেকে ছবিটা বের করে দেখাল কিশোর। অবাক হলো লোকটার মুখের ভাব বদলাল না দেখে।

শান্তকণ্ঠে বলল লোকটা, 'নিশ্চয় চিনি। যেতে চাও? চলো, এখুনি নিয়ে যাব তার কাছে।'

নয়

লোকটার জবাব শুনে শুরুতে তো দ্বিধায়ই পড়ে গেল গোয়েন্দারা, মজা করছে কিনা ভেবে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছেন?'

লোকটা অবাক হলো এবার। 'মিথ্যে বলার কি হলো? চিনি তো।'

জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। হালকা-পাতলা গড়ন, হাড় বেরোনো রোগাটে শরীর, রোদে পোড়া মুখ, মাথায় লালচে পাতলা চুল। আন্তরিক ব্যবহার।

'আসলে এখানে আসার পর থেকে অন্যরকম ব্যবহার পেয়েছি তো, তাই বিশ্বাস করতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'যাকেই প্রশ্ন করেছি, মুখ কালো করে ফেলেছে। আপনিই কেবল করলেন না। আসুন না, এককাপ কফি খেয়ে যান।'

'চলো।'

'আমরা এখনও নাস্তা করিনি। কয়েকটা মিনিট যদি দেরি করেন, আপনার সাথে যেতে পারি।'

দ্রুত খাবার গিলে নিতে লাগল তিন গোয়েন্দারা। জিম হাচিনসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে যে নির্দোষ—এতদিন পর এই কথা শুনলে মুখটা কেমন হবে তার দেখতে চায়। কিন্তু সবাই যেতে পারবে না, ক্যাম্প পাহারা দেয়ার জন্যে থেকে যেতে হবে একজনকে। কে থাকবে? কারও থাকতে মন চাইছে না। শেষে মুসা বলল লটারির ব্যবস্থা করতে। এবং তার শিকার হলো সে নিজেই। তাকেই থাকতে হবে। গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি আর করা, যাও তোমরা। আমি বসে বসে মাছ ধরব।'

গাড়িতে চড়ে মোটরসাইকেল আরোহীর পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল কিশোররা। আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল লোকটা। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, মাঝে মাঝে গর্ত। দু-ধারে ঘন বন। সেই পথ ধরে চলে রোদ-বৃষ্টিতে মলিন হয়ে যাওয়া একটা কেবিনের কাছে এসে পৌঁছল ওরা।

নামতে ইশারা করল লোকটা। নামল সবাই।

'এখানে কেউ বাস করে বলে তো মনে হয় না,' বলল কিশোর।

'না, এখন আর করে না।'

পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা আয়তাকার ঢিবির কাছে নিয়ে এল লোকটা। বড় গাছ নেই এখানটায়। ঘাস, ছোট ছোট ঝোপ, বুনো ফুলের ঝাড়ে ছেয়ে আছে। ঢিবির মাথার কাছে বসানো ক্রুশটা দেখে কবর চিনতে অসুবিধে হলো না গোয়েন্দাদের। ক্রুশের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে জিম হাচিনসের নাম, এবং মারা যাওয়ার সাল-তারিখ।

'গত শীতে নিউমোনিয়া বাধিয়ে এখানে এসে উঠেছিল সে,' মোটরসাইকেল আরোহী জানাল। 'আর বাঁচেনি।'

বেচারা মানুষটার দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হলো সবাই। ওরা এসেছিল, তার মুক্তির খবর জানিয়ে হাসিমুখ দেখতে, অথচ তার বদলে এ কি দেখল!

'এ ঘরেই থাকত নাকি সে?' কেবিনটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। বহু বছর থেকেছে।'

ওদেরকে সঙ্গে করে পুরানো কেবিনটাতে নিয়ে এল লোকটা। আহামরি কিছু তো নয়ই, ঠিক কেবিনও বলা চলে না, বরং একটা ছাউনি। দুটো ঘর, দুটোই প্রায় খালি। মরচে পড়া একটা স্টোভ, ভাঙা একটা লোহার চারপায়া, পায়া-ভাঙা কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা টেবিল, আসবাব বলতে এইই।

এটা যে জিম হাচিনসেরই ঘর, সেটা বোঝার একমাত্র উপায় একটা পুরানো তোয়ালে। তাতে তার নামের নিচে ইউ এস নেভির মনোগ্রাম ছাপ দেয়া, সরকারি জিনিস। প্লাস্টিকের ভাঙা একটা টয়লেট কেসও পাওয়া গেল, অনেক পুরানো দাঁতক্ষয়া একটা টুথব্রাশ আর দোমড়ানো একটা শেভিং ক্রীমের টিউব পাওয়া গেল তাতে। দেয়ালে লাগানো রয়েছে হলদে হয়ে যাওয়া একটা ফটোগ্রাফ, গ্রুপ ফটো, নেভিতে থাকতে বন্ধুদের সঙ্গে তুলেছিল জিম।

'এইই আছে, না?' বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'হ্যাঁ। আরও জিনিস ছিল। কিন্তু গরীব মানুষের তো অভাব নেই এখানে। কাজে লাগার মত যা যা পেয়েছে নিয়ে চলে গেছে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাম্পে ফিরে চলল গোয়েন্দারা।

খবর শুনে মুসাও গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'মন ভাল করতে হলে এখন সাসাফ্রাস মিল্কশেক খেতে হবে, আর কোন উপায় নেই।'

'সেটা আবার কি?' শঙ্কিত হয়ে বলল রোভার, 'তোমার তৈরি কোন সাংঘাতিক অখাদ্য নয় তো!'

তৈরিটা আমারই, তবে অখাদ্য হতে যাবে কেন? খুব ভাল জিনিস। না খেলে বুঝবেন না। প্রকৃতিতে কোন জিনিসেরই অভাব নেই। বনে বাস করতে হলে বনের জিনিস চিনতে হবে, এখান থেকেই বেঁচে থাকার উপকরণ জোগাড় করতে হবে।'

'হয়েছে,' হাসি ফুটল রবিনের মুখে, 'তোমার লেকচার থামাও। চলো দেখি টেস্ট করে, কি বানিয়েছ?'

রঙটা দেখে মিল্কশেক পছন্দ হলো না কারোরই, কিন্তু একবার চুমুক দিয়েই দ্বিধাও করল না আর কেউ। ঢকঢক করে খালি করে দিল গেলাস। দারুণ সুস্বাদু।

'হুঁ, ভাল,' স্বীকার করল কিশোর। 'কিন্তু আমার মনে হয় না এটা গিলেই মন ঠিক হবে আমাদের।'

'কেন, মানুষটা মারা গেছে বলে?'

'না। মানুষটা যে মারাই গেছে, শিওর হতে পারছি না বলে।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা, 'কিন্তু এইমাত্র না বললে তার কবর দেখে এসেছ?'

'কবর একটা দেখেছি বটে, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না ভেতরে জিমই শুয়ে আছে।'

'তার নাম লেখা ক্রুশ দেখেও না?'

'না। আমাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যেও লাগানো হয়ে থাকতে পারে ওটা। কবরের ওপরটা অনেক বেশি ধসে গেছে, ঘাস আর ঝোপঝাড়ে এমনই ছেয়ে আছে, দেখে মনে হয় অনেক বেশি পুরানো। ক্রুশটাও পুরানো কাঠের, তবে তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না। খোলা জায়গায় পড়ে থাকা পুরানো কাঠ তুলে এনে ক্রুশ বানানো এমন কি কঠিন। খোদাই করে লেখাটাও কাঠের তুলনায় অনেক নতুন মনে হয়েছে আমার কাছে।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে বোরিস আর রোভার। কিশোরের কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল রোভার, 'ঠিকই বলেছে। আমিও লক্ষ করেছি।'

'কেবিনের ভেতরটা দেখেও মনে হয় না, গত শীতে কেউ বাস করেছে ওখানে। অনেক আগে থেকেই ওটাতে লোক থাকে না, দেখেই বোঝা যায়।'

'কি করব তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আবার গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখব। লোকটা সঙ্গে থাকায় তখন ভালমত দেখতে পারিনি।'

'চলো তাহলে, দেরি কিসের?' তাগাদা দিল মুসা।

ইচ্ছে করেই এবার পাহারা দেয়ার জন্যে ক্যাম্পে রয়ে গেল বোরিস। পুরানো কবর-টবর তার মন খারাপ করে দেয়।

গাড়ি চালাল রোভার। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে সেই পুরানো কেবিনটার কাছে চলে এল আবার। গাড়ি থেকে নামল ছেলেরা। কিশোরের নির্দেশে গাড়িতে বসে রইল রোভার।

'প্রথমে কবরটা দেখব,' কিশোর বলল। 'দেখি কোন সূত্রটুত্র পাওয়া যায় কিনা?'

কাঠের ক্রুশটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। হঠাৎ বলে উঠল, 'দেখো, পেয়ে গেছি সূত্র! ক্রুশের গোড়ার চেয়ে গর্তটা বড়! ঢলঢল করছে ক্রুশ।'

'হয়তো গাঁথতে চায়নি,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'জোরাজুরি করে চেপে ঢোকানো হয়েছে, তাতে সরে গেছে চারপাশের মাটি, গর্ত মোটা হয়ে গেছে।'

'আগে দেখে যাও, তারপর বলো। পরিষ্কার বোঝা যায়, অন্য ক্রুশ ছিল এখানে, এটার চেয়ে মোটা। সেটা তুলে ফেলে দিয়ে এটা বসানো হয়েছে। অনেক জায়গা বেরিয়ে আছে চারপাশে।'

এগিয়ে গেল কিশোর। দেখে বলল, 'হুঁ, ঠিকই বলেছ। ক্রুশটা বেশিদিন আগে গাঁথা হলে গর্তের চারপাশের ফাঁক মাটিতে ভরে যেত।' ক্রুশটা ধরে টান দিল সে। সহজেই উঠে চলে এল ওটা। গোড়ায় লেগে থাকা আলগা মাটি মুছে ফেলল। 'দেখো, ওপরের আর গোড়ার রঙে কোন তফাৎ নেই। নাহ, কোন সন্দেহ নেই আর, নতুনই বসানো হয়েছে।'

একটা ঝোপের কাছ থেকে শোনা গেল রোভারের চিৎকার। কোন ফাঁকে যে সরে গেছে সে খেয়ালই করেনি তিন গোয়েন্দা। দৌড়ে গেল সেখানে।

আরেকটা ক্রুশ হাতে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল রোভার। ওদেরকে দেখিয়ে বলল, 'দেখো এটা কি!'

সবাই দেখল, এই ক্রুশটাতে নাম খোদাই করা রয়েছে 'হারম্যান ডাউনিল'। মারা গেছে দশ বছর আগে। অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখা। গোড়াটা নতুন ক্রুশটার গোড়ার চেয়ে মোটা, রঙটাও অনেক কালো—কাঠ অনেক দিন মাটির নিচে থাকলে যেমন হয়, তেমন। গর্তে খাপে খাপে বসে গেল।

আচমকা ওর হাত খামচে ধরে মুসা বলল ফিসফিস করে, 'আস্তে! কে জানি আসছে!'

ওদের ডানে গাছের জটলার ভেতরে খসখস শব্দ হলো।

'চোখ রেখেছিল কেউ আমাদের ওপর!' আবার বলল মুসা।

মাথা নিচু করে সেদিকে দৌড় দিল সে। পেছনে ছুটল অন্য তিনজন। সরে যাচ্ছে পদশব্দ। জটলার অন্যপাশে এসে দেখল ওরা, ছুটতে ছুটতে ঘন পাইনবনের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে একটা লোক। বনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'ছড়িয়ে পড়ো!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল কিশোর। 'ধরতে হবে ওকে!'

দু-দিকে অনেকটা করে সরে গিয়ে বনের দিকে দৌড় দিল চারজনে। কিন্তু লোকটার কাছে পৌছার আগেই মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। দেখতে দেখতে দূরে সরে গেল।

'দূর,' রাগে হাত মুঠো করে ফেলল মুসা, 'গেল! আমি শিওর, সেই লোকটাই! হাড্ডিসার কঙ্কালটা!'

'মনে হয়,' কিশোর বলল। 'তবে লোকটা ওভাবে চুরি করে আমাদের ওপর চোখ রাখতে এসে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত করে দিয়ে গেল।'

'কী?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা ও রবিন।

'ওই লোকই ক্রুশটা কবরের মাথায় গেড়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছিল

জিম হাচিনস মারা গেছে। তারমানে জিম মারা যায়নি, এখনও বেঁচে আছে ধরে নিতে পারি আমরা।'

'ঠিক,' রবিন বলল। 'হয়তো এই বনের মধ্যেই আছে।'

হালকা মন নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই কানে এল গোঙানোর শব্দ।

'বোরিসের কিছু হয়েছে!' চিৎকার করে বলেই তাঁবুর দিকে দৌড় দিল রোভার।

স্লীপিং ব্যাগের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে বোরিস। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। পেট চেপে ধরে আছে।

'কি ব্যাপার?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'কি হয়েছে আপনার?'

ছুটে গিয়ে ভাইয়ের পাশে বসে পড়ল রোভার। তিন গোয়েন্দাও এগিয়ে গেল।

'বিষ!' গোঙাতে গোঙাতে জবাব দিল বোরিস।

'বিষ!' আঁতকে উঠল কিশোর।

'বুনো আঙুর। ঝোপের মধ্যে ঢুকে দেখি থোকায় থোকায় ঝুলে আছে। টসটসে রসাল। লোভ সামলাতে পারলাম না। মুখে দিয়ে দেখি জঘন্য! গিলিনি, থু-থু করে ফেলে দিয়েছি! কিন্তু দু-এক ফোঁটা রস যা পেটে গেছে, তাতেই শুরু হয়ে গেল ব্যথা!'

'তারমানে আঙুর নয় ওগুলো।'

'তাহলে কি? আঙুরের মতই তো দেখতে!'

'কোন ঝোপটাতে?'

বলল বোরিস। রোভারকে তার কাছে রেখে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ঝোপটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। আঙুরের মতই দেখতে একধরনের লালচে কালো ফল দেখতে পেল ওরা।

একটা থোকা ছিঁড়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এল কিশোর।

গোঙাচ্ছে বোরিস। মুখ ফ্যাকাসে।

'এই জিনিস খেয়েছেন?' ফলগুলো দেখাল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'এ আঙুর নয়। এগুলোর নাম হচ্ছে মুন-সীড। চাচার সঙ্গে একদিন বনে গিয়েছিলাম পাখি শিকার করতে। এগুলো দেখে আমিও লোভ সামলাতে পারিনি। আরেকটু হলেই মুখে দিয়ে ফেলেছিলাম। থাবা দিয়ে ফেলে দিল চাচা। বলল, সাংঘাতিক বিষাক্ত। আপনার ভাগ্য ভাল থু-থু করে ফেলে দিয়েছেন। বেশি গিললে মারাই যেতেন।'

তাড়াতাড়ি রোভারকে চা বানাতে বলল কিশোর। খানিকটা গরম পানি খাইয়ে দিল বোরিসকে। তারপর বড় একমগ চা খেতে দিল।

আস্তে আস্তে ব্যথা সারল বোরিসের।

এই ঘটনার পর সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সবাই। পাইন বন দেখতে যত সুন্দর, বিপদও যে তত বেশি, বুঝে ফেলল এটা। সঙ্গে করে

কয়েকটা রেফারেন্স বই নিয়ে এসেছে রবিন। ওল্টাতে শুরু করল। কোন্ কোন্ ব্যাপারে সাবধান হতে হবে, পড়ে পড়ে বাতলে দিতে লাগল।

তার কথায় মনোযোগ নেই কিশোরের। নিউ জারসির একটা নতুন ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছে। আনমনে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ বলে উঠল, 'অ্যাই শোনো, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়!'

দশ

মুখ তুলে তাকাল সবাই।

রবিন জানতে চাইল, 'কি বুদ্ধি?'

'হ্যামারের কথা মনে আছে?' সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার সাইমন যে বলেছেন?'

'পাইন ব্যারেনে যে ধরা পড়েছিল, যার পকেটে শয়তানের মূর্তিটা পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। কি ভাবে ধরা পড়েছিল লোকটা, মনে আছে?'

'আছে। একটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে পড়েছিল, একজন পুলিশ অফিসার তাকে চিনতে পেরে ধরে নিয়ে যায়।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'অহেতুক গ্যাস স্টেশনে ঢুকতে যাবে কেন সে, বলো?'

'তাই তো!' দ্বিধা করল রবিন। কান চুলকাল। 'পেট্রলের জন্যে ঢুকলে গাড়ি নিয়েই ঢুকত। নিশ্চয় ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'ঠিক। কিন্তু তাকে ধরার পর গাড়িটা পেল না কেন পুলিশ? পেলে নিঃসন্দেহে সিজ করে নিয়ে যেত।'

'বুঝেছি!' তুড়ি বাজাল মুসা, 'চোরাই গাড়ি! ইঞ্জিনে ট্রাবল দিলে কোথাও লুকিয়ে রেখে গ্যাস স্টেশনে ঢুকেছিল পার্টসটা কেনার জন্যে। তখন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। গাড়িটার ব্যাপারে আর টুঁ শব্দ করেনি সে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। এখন বলো, খারাপ ইঞ্জিনের গাড়ি কতটা দূরে ফেলে যাবে? হেঁটে গেছে, এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।'

'খুব কাছেই রেখে গিয়েছিল,' জবাব দিল রবিন, 'এ তো সহজ কথা।'

'বেশ। পুলিশ যখন গাড়িটা পায়নি, তাহলে এখনও ওটা ওখানেই পড়ে আছে...'

'খাইছে!' সোজা হয়ে বসল মুসা; কিশোরের এত কথা বলার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। 'গিয়ে দেখা দরকার! সত্যি যদি গাড়িটা থেকে থাকে, ভেতরে মূল্যবান সূত্র মিলতে পারে!'

'ঠিক এই কথাই ভাবছি আমিও। কিন্তু প্রথমে আমাদের জানতে হবে, কোন স্টেশনটায় ঢুকেছিল লোকটা, কারণ ওটার কাছাকাছিই আছে গাড়িটা।

কি করে জানব?'

'কি করে?' জানতে চাইল দুই সহকারী।

চুপ করে ওদের কথা শুনছিল বোরিস আর রোভার। রোভার বলল, 'খুব একটা কঠিন হবে না। এই বুনো এলাকায় গ্যাস স্টেশন বেশি থাকবে না। একটা কি দুটো। কোন স্টেশন থেকে হ্যামারকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ সেটা জানা কঠিন হবে না মোটেও।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এ জন্যেই ম্যাপটা দেখছিলাম আমি। দুটো স্টেশন আছে। একটা বড়, আরেকটা ছোট। প্রথমে বড়টাতেই যাব আমরা।'

'কে কে যাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমি আর রবিনই যাই। বোরিস তো অসুস্থই, শুয়ে থাকতে হবে। রোভারেরও তার কাছে থাকা উচিত। আর ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ করবে। মেটাল ডিটেক্টরটা জোড়া লাগিয়ে ফেলবে। হয়ে গেলে তাঁবুর আশেপাশে খুঁজে দেখবে গুপ্তধন লুকানো আছে কিনা।'

রওনা হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। সিডার নব থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলল ওরা।

শেষ বিকেলে বড় গ্যাস স্টেশনটায় পৌছল। গাড়ি থামাল রবিন। এগিয়ে এল একজন মেকানিক। কথা বলার জন্যে নেমে গেল কিশোর। ট্যাংকে পেট্রল ভরতে বলল লোকটাকে। সফ্‌ট্ ড্রিংক মেশিন থেকে তিনটে সোডার গ্লাস ভরে নিল রবিন। একটা দিল মেকানিককে, খাতির করার জন্যে।

এটা-সেটা বলতে বলতে আসল কথায় এল কিশোর, 'শুনলাম, কয়েক দিন আগে এদিকের কোন একটা স্টেশন থেকে নাকি একজন ডাকাতকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ?'

'হ্যাঁ। আমাদের এখান থেকেই নিয়ে গেছে। আমি ছিলাম তখন।'

'গোলাগুলি হয়েছে?'

'না। যে অফিসার তাকে ধরেছে তার গাড়ির ফ্যান-বেল্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা পাল্টাতে ঢুকেছিল এখানে। সাদা পোশাকে ছিল, তাই বুঝতে পারেনি ডাকাতটা। সোজা হেঁটে এসে পড়ল বাঘের খপ্পরে। লোকটা কিছু বোঝার আগেই পিস্তল বের করে তার পিঠে ঠেকিয়ে দিল অফিসার। তারপর হ্যান্ডকাফ লাগাতে আর অসুবিধে কি।'

'পাইন ব্যারেনে কি করতে এসেছিল ডাকাতটা?'

'কি জানি। পুলিশ বলতে পারবে।'

'কোন দিক থেকে এসেছিল?'

হাত তুলে হাইওয়ের বাঁ-দিকে দেখাল মেকানিক। 'খোশমেজাজে শিস দিতে দিতে ঢুকল লোকটা, কল্পনাই করতে পারেনি দুই মিনিট পরেই মেজাজ অন্য রকম করে দেয়া হবে তার।'

ড্রিংক শেষ করে, মেকানিককে ধন্যবাদ দিয়ে আবার গাড়িতে চড়ল দুই গোয়েন্দা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এগোল বাঁ দিকে। কয়েকশো গজ এসে

রবিনকে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। নেমে পড়ল দু-জনে।

'তুমি ওদিকে যাও, আমি এদিকে যাই,' রবিনকে বলল কিশোর। 'আস্তে আস্তে খুঁজবে, কিছুতেই যেন চোখ না এড়ায়। চোরাই গাড়ি হলে ভালমতই লুকিয়েছে হ্যামার। নইলে এতদিনে পুলিশের চোখে পড়ে যেত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে ডানে এগোল রবিন, কিশোর বাঁ-দিকে।

খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল দুই গোয়েন্দা। ঝোপের মধ্যে অসংখ্য মশা আর ডাঁশের আড্ডা, সাড়া পেলেই বনবন করে উড়াল দেয়, কামড়ে কামড়ে হাত-মুখ ফুলিয়ে দিল ওদের। থাবা দিয়ে কপাল থেকে ডাঁশ আর মশা তাড়াতে তাড়াতে এগোল রবিন। ভয় পাচ্ছে, কতক্ষণ এই অত্যাচার সহ্য করতে পারবে?

ঢালু বেয়ে নামতে গিয়ে দুই-দুইবার পা ফসকাল কিশোর, আছড়ে পড়ল একবার, আরেকটু বেকায়দা মোচড় লাগলেই যেত পায়ের গোড়ালি ভেঙে। কাঁটাডালে লেগে হাতের চামড়া ছড়ে গেল। সেই সঙ্গে মশা আর ডাঁশের অত্যাচার। তবে কোন কিছুই দমাতে পারল না তাকে। দৃঢ় সংকল্প করেছে, গাড়িটা এখানে থেকে থাকলে খুঁজে বের করবেই।

আধঘণ্টা পর রবিনের চিৎকার শুনতে পেল সে, তার নাম ধরে ডাকছে। ঝোপঝাড় ঠেলে দৌড়ে এসে রাস্তায় উঠল সে। ডান দিকে এগোতে এগোতে রবিনের নাম ধরে ডাকল। সাড়া দিল রবিন, 'এই যে আমি, এখানে।'

আরও কাছাকাছি গিয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' ঘন জঙ্গলের ভেতর থেকে জবাব এল রবিনের।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার কাছে পৌঁছে গেল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন।

একটা বালির টিপিতে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। লতা আর ঝোপের গভীর জঙ্গল ওখানটায়। ফলে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে গাড়ি। সহজে চোখে পড়ে না।

'এটাই, কোন সন্দেহ নেই!' উত্তেজনায় কণ্ঠ কাঁপছে কিশোরের।

'হ্যাঁ। উফ্, যা মশার মশা, রক্ত সব খেয়ে ফেলল! তাড়াতাড়ি করা দরকার, নইলে মেরে ফেলবে!'

গাড়িটা একটা গানমেটাল রঙের টু-ডোর সেডান, দামী জিনিস। ভেবেছিল, গিয়ে পার্টসটা কিনে নিয়ে চলে আসবে, কতক্ষণ আর লাগবে। তা ছাড়া এখানে কেউ আসবেও না। দরজায় তালা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি হ্যামার।

দরজা খুলতেই গুঞ্জন করে উঠল মশার দল। হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে ওগুলোকে সরাতে সরাতে ভেতরে উঁকি দিল রবিন। ইগনিশনে লাগানো রয়েছে চাবি। সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে একটুকরো কাগজ পড়ে থাকতে দেখা গেল।

প্রায় ছোঁ দিয়ে কাগজটা তুলে নিল রবিন। কিশোরকে দেখাল, 'দেখো কি

পেয়েছি!'

পেন্সিলে আঁকা একটা নকশা, তার নিচে লেখা:

হ্যামার—এই নকশামত চলো।

'এ তো সাংঘাতিক জিনিস!' চোখ বড় বড় করে ফেলল কিশোর। 'কাজের কাজই করলাম মনে হয় একটা!'

পেছনের সীটে দেখা গেল একটা আলট্রাভায়োলেট সানল্যাম্প, ব্যাটারিতে চলে। আরেকটা জিনিস আগ্রহ জাগাল কিশোরের— ড্যাশবোর্ডে পড়ে থাকা একটা দেশলাইয়ের বাক্স, পাইরেট ট্যাভার্ন নামে একটা কাফের বিজ্ঞাপন করা হয়েছে বাক্সের ওপরের পিঠে। কি ভাবে যেতে হবে নকশা এঁকে দেখিয়েও দেয়া হয়েছে। পাইন ব্যারেনের কাছেই, উপকূলের ধারে কাফেটা। তার সন্দেহ হলো, এই কাফের কথাই বলেননি তো সাইমন, যেটাতে চোর-ডাকাতেরা আড্ডা দেয়?

মশার কামড়ের কথা ভুলে গিয়ে কাগজে আঁকা নকশাটা দেখতে লাগল দু-জনে।

বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'যে পথে এসেছি আমরা, সেটাই দেখানো হয়েছে। এই দেখো, গ্যাস স্টেশনটাও আঁকা আছে।'

'আর এই যে এই রাস্তাটা,' নকশায় আঙুল রেখে রবিন বলল, 'আমাদের মাইলখানেক সামনে। এগিয়ে গিয়ে মোড় নিয়ে এটাতে পড়ার কথা ছিল বোধহয় হ্যামারের। কিন্তু যেতে আর পারেনি, গাড়ি খারাপ হয়ে যায়।'

'কথা হলো, এই পথ তাকে কোথায় নিয়ে যেত?'

হাসল রবিন, 'সেটা নাহয় আমরাই বের করে নেব।...কিন্তু আর তো থাকতে পারছি না!' জোরে জোরে চাপড় মারল সে, 'শেষ করে ফেলল ব্যাটারা!'

বিশ মিনিট পর সেই শাখাপথটার মোড়ে গাড়ি নিয়ে এল রবিন। পাশে বসে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে কিশোর। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তা। জায়গায় জায়গায় গর্ত। ঢুকে গেছে পাইনবনের মধ্যে। খুব সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে রবিন, গর্তে পড়ে যাতে এক্সেল কিংবা স্প্রিঙ না ভাঙে। এত আস্তে চালানোর পরও সাংঘাতিক ঝাঁকুনি লাগছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপাশে ডুব দিয়েছে পড়ন্ত সূর্য। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে বনতলে, বনের স্বাভাবিক বিষণ্নতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এমন অদ্ভুত এক পরিবেশ। গোধূলি বেলায় এমন এক জায়গায় পৌঁছল ওরা, যেখানে রাস্তা খুবই সরু হয়ে গেছে, ঘন ঝোপ আর গাছের ডাল এমনভাবে এসে পড়েছে পথের ওপর, যে গাড়ি নিয়ে আর এগোনো যায় না।

'এবার কি করব?' রবিনের কণ্ঠে নিরাশা।

জবাব না দিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। হ্যামারের গাড়ি থেকে সানল্যাম্পটা নিয়ে এসেছে, সেটা নিল সঙ্গে। চারপাশে আলো ফেলে দেখতে লাগল। একটা গাছে আলো পড়তে তীরচিহ্ন জ্বলজ্বল করে উঠল।

'নিশ্চয় ফ্লুরেসেন্ট রঙ লাগানো!' রবিন বলল।

'দেখো, ডানে নির্দেশ করছে।'

রবিনও নেমে এল গাড়ি থেকে। আলো-হাতে নির্দেশিত পথে এগোল দু-জনে। দশ গজ পর পরই ও রকম তীরচিহ্ন রয়েছে।

বনের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে পায়েচলা পথ। চলতে চলতে বারবার চারপাশে আলো ফেলে দেখছে কিশোর, যাতে কোন চিহ্ন থাকলে চোখ এড়িয়ে না যায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল দু-জনেই। ভীষণ চমকে গেছে। সামনে অন্ধকারের ভেতর থেকে যেন বাতাস ফুঁড়ে উদয় হলো একটা বিকট জ্বলজ্বলে মূর্তি।

'জারসি ডেভিল!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

এগারো

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল দু-জনে। কুৎসিত, বিকৃত, জ্বলজ্বলে মূর্তিটা বাদুড়ের মত ডানা মেলে যেন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'ওটা আসল নয়, রবিন।'

'হ্যাঁ,' খসখসে স্বর বেরোল রবিনের কণ্ঠ থেকে, গলা শুকিয়ে গেছে। 'নড়ছে না। কি ওটা?'

রবিনের মতই অবাক হয়েছে কিশোরও। সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেল মূর্তিটার দিকে। ভয়ঙ্কর চেহারার জিনিসটাকে ছুঁয়ে দেখল। হেসে ফেলল পরক্ষণেই। 'বুঝেছি। লোহা দিয়ে তৈরি সেই শয়তানের মূর্তিটা, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে ডেগা গালুশ যেটা বানিয়েছিল, দোকানদার যেটার কথা বলেছে।'

এগিয়ে এসে রবিনও পুরানো মূর্তিটা ছুঁয়ে দেখল। 'তবে ডেগার আমলে ফ্লুরেসেন্ট পেইন্ট আবিষ্কার হয়নি। তখন এমন জ্বলজ্বল করত না।'

'তা তো বটেই। এই রঙ পরে লাগানো হয়েছে। নিশ্চয় ডিয়াবোলোর লোকেরা। ওরাই হয়তো গাছের গায়ে চিহ্ন এঁকেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কিন্তু কেন?'

জবাব জানা নেই কিশোরের।

ঘড়ি দেখল রবিন। অস্বস্তি বোধ করছে। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার হয়ে যাবে। এখানে আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, চলো।'

গাছগুলো দেখতে সব একরকম লাগছে অন্ধকারে, গায়ে চিহ্ন আঁকা না থাকলে গাড়ির কাছে ফেরাই কঠিন হয়ে যেত। গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা। ঘোরানোর জায়গা নেই। ব্যাকগীয়ার দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যেতে লাগল রবিন।

কাজটা খুব কঠিন। রাস্তা খারাপ, অন্ধকার, তার ওপর ঝোপঝাড় আর গাছের ডাল নেমে এসেছে পথের ওপর। হেডলাইট সামনের দিকে, পেছনে আলো পড়ে না, কেবল আবছা একধরনের উজ্জ্বলতা।

তবে নিরাপদেই ঘুরানোর মত জায়গায় গাড়ি নিয়ে এল সে।

সিডার নবে ফেরার পথে রহস্যটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আর কথা বলতে ভাল লাগল না, উত্তেজনা কমে যেতেই খিদে টের পেল। মনে পড়ল, বহুক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি।

ক্যাম্পে ফেরার জন্যে তর সইছে না কারোরই, এতটাই খিদে। সঙ্গে করে খাবার আনতে ভুলে গেছে, বোকামিই হয়ে গেছে। পথে কোন খাবারের দোকানও চোখে পড়ল না।

ওরা আশা করেছিল, কষ্ট করে কোনমতে ক্যাম্পে ফিরতে পারলেই হয়, খাবার রেডি পাবে। কিন্তু ক্যাম্পে ফিরে যা শুনল, তাতে একেবারে ভেঙে পড়ল।

মুসাকে গোমড়া মুখে বসে থাকতে দেখে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

'কোন্ শয়তান জানি এসে আমাদের সমস্ত খাবার নিয়ে চলে গেছে!' করুণ গলায় জানাল মুসা।

'মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা,' রোভার বলল। 'সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখি আমাদের খাবারগুলো সব নিয়ে গেছে।'

'গাধামি হয়ে গেছে!' গোঁ গোঁ করে বলল বোরিস, 'একজনের অন্তত তাঁবুতে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কে জানে এমন হবে! এই বনের মধ্যে খাবারও যে চুরি হয় তা কি আর জানতাম!'

'মানুষই? অন্য কিছু না তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অন্য কী?' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা।

'তুমি যা ভাবছ, তা না, শয়তানের কথা বলছি না। র‍্যাকুন-ট্যাকুন?'

'না। ভালমত দেখেছি। র‍্যাকুনে হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেত। কিন্তু এই চোরটা দুধের কার্টন, সোডার বোতল সব নিয়ে গেছে,' রাগে হাত মুঠো করে ফেলল মুসা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ধরতে পারলে...'

'...ঘাড়টা মটকে দিতাম!' বাক্যটা শেষ করে দিল বোরিস।

'কোন চিহ্ন-টিহ্ন পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নাহ্,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল রোভার, 'তেমন কিছুই না।' ভ্যানের পেছনে টর্চের আলো ফেলল সে। 'ওই দাগগুলো শুধু। ওতে কোন লাভ হবে?'

এগিয়ে গেল কিশোর। ভালমত দেখল। পায়ের ছাপ পড়েছিল বোধহয়, পাইনের ডালপাতা দিয়ে ঘষে মুছে দেয়া হয়েছে। 'না, এখানে কিছু বোঝার নেই। তবে আঙুলের ছাপ বোধহয় জোগাড় করা যাবে।'

অনেক চেষ্টা করে দুটো ছাপ বের করতে পারল সে।

'কে এই কাজ করেছে বলো তো?' প্রশ্ন করল রবিন।

'কি করে বলি? এল ডিয়াবোলোর লোক হতে পারে। তাহলে বুঝতে হবে কাছাকাছিই আছে ওরা। কিংবা আমাদের সেই গুপ্তধন শিকারীও হতে পারে, হারগিনস ডফার।'

'অথবা সেই তালপাতার সেপাই মোটরসাইকেল আরোহী। জিম হাচিনসের মৃত্যু সংবাদ দিয়েও আমাদের তাড়াতে না পেরে এখন অন্য পথ ধরেছে।'

হ্যাঁ, এটা হতে পারে—একমত হলো রবিন, বোরিস আর রোভার।

'কিন্তু তা তো হলো,' মুসা বলল। 'কে চুরি করেছে, সেটা তো বড় কথা নয়; কথা হলো পেট তো জ্বলে যাচ্ছে। খাব কি?'

আবার খিদের কথা মনে পড়ল রবিন আর কিশোরের। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল রবিন।

কিশোর বলল, 'অত দুশ্চিন্তার বোধহয় কিছু নেই। এখনও গেলে দোকানটা খোলা পাওয়া যেতে পারে। এনে রান্না করতে আর কতক্ষণ লাগবে।'

একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর রোভার। রবিনকে নিয়ে গাড়িতে করে রওনা হয়ে গেল।

খাবার না আসা পর্যন্ত কিছু করার নেই। মুসার পাশে বসে পড়ল কিশোর, 'হ্যাঁ, আসল কথা জিজ্ঞেস করতেই তো ভুলে গেছি। মেটাল ডিটেক্টরের কি খবর? গুপ্তধন পেয়েছ?'

'কিসের গুপ্তধন,' গোমড়া মুখে জবাব দিল মুসা। 'দু-চার জায়গায় একআধটু গুনগুন করেছে, খুঁড়ে দেখি পুরানো টিন, গাড়ির ভাঙা পার্টস।'

'একটা শিক্ষা কিন্তু হলো। এরপর থেকে ক্যাম্পে কাউকে পাহারায় না রেখে আর বেরোনো যাবে না।'

'গাধামিটা আমিই করেছি,' ভোঁতা গলায় বলল বোরিস। 'শুয়ে থাকতে থাকতে ভাল্লাগছিল না, চলে গেছিলাম।'

'যা হবার হয়েছে, এখন আর ভেবে লাভ নেই। দোকানে খাবার পেলেই বাঁচি।'

ওদের ভাগ্য ভাল, দোকানের কাছে এসে দেখল রবিনরা, জানালায় আলো আছে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে টাকমাথা দোকানদার।

'বাপরে!' হেসে বলল সে, 'ভাল খিদে তো তোমাদের। কাল না এত খাবার নিয়ে গেলে, সব শেষ?'

খাবার চুরির কথা বলে ফেলতে যাচ্ছিল রোভার, রবিনের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল। বলতে মানা করছে রবিন। এখানে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। এমনও হতে পারে, যে লোকগুলো বসে আছে তাদেরই কেউ কাজটা করেছে।

জবাব একটা দেয়া লাগে, তাই বলল রবিন, 'না, সব খেতে পারিনি। কি

ভাবে যেন পড়েটড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে খাবারগুলো।... ভাল কথা, আজ সকালে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। তাকে দরকার ছিল, কিন্তু নাম জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।'

'দেখতে কেমন?'

'লালচে চুল, রোগা-পাতলা, মুখের চামড়ায় কালো কালো দাগ। মোটরসাইকেল চালায়।'

'ও, ইয়াম নরটনের কথা বলছ,' বলে উঠল বসে থাকা একজন লোক।

'কোথায় পাব তাকে বলতে পারেন? সিডার নবে ক্যাম্প করেছি আমরা।'

'সে থাকে এখান থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণ-পশ্চিমে।' কি করে যেতে হবে সেখানে বাতলে দিতে লাগল লোকটা।

তার বলা সবে শেষ হয়েছে, এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দোকানের দরজা। ঘরে ঢুকল বুনো চেহারার একজন লোক। গায়ে ফ্ল্যানেলের শার্ট, পরনে মলিন কর্ডুরয় প্যান্ট।

ভুরু কুঁচকে তাকাল দোকানদার, 'কি ব্যাপার, ডন? ভূতে তাড়া করল নাকি?'

'ভূ-ভূতই!' তোতলাতে শুরু করল আগন্তুক। 'ওটার কথা ব-বহুত শুনেছি, কিন্তু নি-নিজের চো-চোখে দেখব ভাবিনি!'

সর্তক হয়ে গেল বসে থাকা লোকগুলো। গুঞ্জন উঠল।

'যাহ, কি বলো!' বলল একজন।

'ঠিকই বলছি,' জবাব দিল ডন। 'যে সে ভূত নয়, ডেগো গালুশের ভূত!'

কৌতূহলী হয়ে উঠল রবিন। দেখল, বোরিসেরও চোখ সরু সরু হয়ে এসেছে।

'তোমাকে নিয়ে মজা করেছে কেউ,' বলল আরেকজন। 'কি করল বলো তো? পা টিপে টিপে তোমার পেছনে এসে কানের কাছে হাউ করে উঠল?'

'দেখো,' রেগে গেল ডন, 'মজা করছি না আমি! ওটা জ্যান্ত মানুষ হতেই পারে না!'

'কি করে বুঝলে?'

'দুই-আড়াইশো বছর আগের পোশাক পরা, মরা মানুষের মত সাদা মুখ...ওটা ভূত না হলে কি আর বললাম...'

ডনের কথা অবাক করল লোকগুলোকে, এ রকম পোশাক পরা ভূত আশা করেনি ওরা। তবে তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় বিশ্বাস করতে পারছে না ওরা।

ব্যাপারটা নাড়া দিল রবিনকে। তাড়াতাড়ি খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে প্যাকেটগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

গাড়িতে মাল তুলতে তুলতে রোভার বলল, 'কি মনে হয় তোমার? সত্যি সত্যি দেখেছে?'

'কি জানি! তবে আমাদের রহস্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে পারে এর।

জলদি চলুন, কিশোরকে খবরটা দিতে হবে।'

ওদের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে কিশোররা। খাবার পাওয়া গেছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভূতের খবর শুনে চোখমুখ বিকৃত করে মুসা বলল, 'আমার খাবারের রুচি গেল! অ্যাই কিশোর, আমাদের খাবারগুলো ভূতে চুরি করেনি তো?'

'আরে দূর!' বাতাসে থাবা মারল যেন কিশোর। 'ভূত হলে পায়ের ছাপ, আঙুলের ছাপ কিছুই রেখে যেত না। সব মানুষের শয়তানি।'

রান্না করতে বসল রোভার। সেদ্ধ বীন, গরুর মাংসের স্ট্যু, আর আলু ভাজার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। ভূতের কথা বেমালুম ভুলে গেল মুসা।

খাওয়া শেষে বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে মুছে রেখে, স্লীপিং ব্যাগে ঢুকল সবাই। সারাদিনের পরিশ্রমে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন।

ঘুমিয়েছে কয়েক মিনিটও হয়নি, জেগে গেল একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত শব্দে।

'এটা বাজপাখি নয়!' রবিন বলল।

'ঠিক বলেছ,' মুসার কণ্ঠে ভয়। 'ইনি অন্য কিছু!'

স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল কিশোর। টর্চ জ্বেলে বলল, 'চলো তো দেখি?'

'আমি পারব না!' সাফ মানা করে দিল মুসা। 'কোন কিছুর বিনিময়েই আমি এখন বাইরে যাব না!'

কিন্তু কিশোর আর রবিনের সঙ্গে যখন বোরিসরা দুই ভাইও বেরিয়ে এল, একা একা তাঁবুতে থাকার আর সাহস হলো না তার। বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো।

উত্তেজিত হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সবাই, এই সময় আবার শোনা গেল চিৎকার।

'ওদিক থেকে!' হ্রদের পশ্চিম তীরের দিকে হাত তুলে বলল বোরিস।

'খাবার-চোরটা না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাহলে তো ভালই হয়,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল বোরিস। 'ঘাড়টা ধরে মটকে দেব...'

ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে কিশোর, তার পেছনে মুসা। অন্য তিনজনও চলল সঙ্গে।

মুসা বলল, 'দাঁড়াও, লাঠি নিয়ে নিই। পিটিয়ে তক্তা বানাব।' চোরের কথায় ভূতের কথা ভুলে গেছে সে।

পাহাড়ের গোড়ায় এসে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। চাঁদ আছে, কিন্তু বনের এখানটায় তার আলো তেমন পৌঁছতে পারছে না। তবে পুরোপুরি অন্ধকারও নয়, মানুষ দেখা যাবে। দ্রুত একে অন্যের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল ওরা।

মুহূর্ত পরেই মুসার চিৎকার শোনা গেল। হুড়মুড় করে তার কাছে দৌড়ে

এল কিশোর, রবিন আর বোরিস।

'কি হয়েছে, মুসা, কি হয়েছে!' চিৎকার করে জানতে চাইল রবিন।

'ভূ-ভূ-ভূত!' ভয়ে কথা সরছে না মুসার।

'কই, কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে কয়েকটা গাছ দেখাল মুসা, 'ওই যে, ওখানে ছিল! ডেগা গালুশের ভূত! পুরানো আমলের পোশাক পরা, মুখটা সাদা!'

গাছগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অন্য তিনজন। কিছুই দেখতে পেল না।

এই সময় অন্ধকারে আবার শোনা গেল চিৎকার। ক্যাম্পের দিক থেকে।

'রোভার!' বলে উঠল কিশোর, 'তার আবার কি হলো!'

বারো

ক্যাম্পের দিকে দৌড় দিল আবার ওরা। বুক কাঁপছে দুরুদুরু, নীরব রাতে চারজনের পা ফেলার দুপদাপ শব্দ।

রোভারের মুখে পড়ল কিশোরের টর্চের আলো। রেগে গেছে সে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'আবার এসেছিল!'

'চোরটা?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে পড়ল, তাঁবুতে কেউ নেই। তাড়াতাড়ি দেখতে এলাম। এসে দেখি এই অবস্থা!'

রোভারের নির্দেশিত দিকে আলো ফেলল কিশোর। হাঁ হয়ে খুলে আছে ভ্যানের দরজা। আইস চ্যাস্টটা বের করে আনা হয়েছে। মাটিতে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে খাবার।

'আবার খাবার চুরি করতে এসেছিল শয়তানটা!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

'নিয়েছে নাকি কিছু?' দেখার জন্যে এগোল রবিন।

রোভার বলল, 'মনে হয় নিতে পারেনি। আমার সাড়া পেয়েই পালিয়েছে।'

দ্রুত একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা গেল, কিছু নিতে পারেনি। খাবারও কমই নষ্ট হয়েছে। নিজের অজান্তেই কিশোরের হাত চলে গেল পকেটে, আঙুলে লাগল মূর্তিটা। পকেটে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়। বার বার এটার জন্যেই চোর আসে না তো? হ্যামারের গাড়ি থেকে যে আলট্রাভায়োলেট সানল্যাম্পটা এনেছে, ওটাও আছে। ওটা নেয়ার জন্যেও আসতে পারে। কিন্তু তাহলে খাবার চুরি করে কেন? এই খাবার চুরি একটা দিকই নির্দেশ করে, খেতে না পেয়ে ওরা যাতে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতে কার কি লাভ?

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। রোভারকে বলল, 'ভাগ্যিস এসেছিলেন…চিৎকারটা ওই চোরটার সৃষ্টি, আমাদেরকে তাঁবু থেকে সরানোর জন্যেই করেছে ওই কৌশল।'

'কিন্তু আমি যে নিজের চোখে ভূতটাকে দেখলাম!' মুসা বলল।

'কিসের ভূত?' জানতে চাইল রোভার।

'ডেগা গালুশের!' আরেকবার ভূতের ঔপনিবেশিক পোশাক আর লাশের মত চেহারার বর্ণনা দিল মুসা।

'ওটাও যে চালাকি নয় কে বলল তোমাকে?' কিশোর বলল, 'ভূতুড়ে চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভূতটাকেও দেখা যায়, বিশ্বাসযোগ্য হয় অনেক বেশি।'

'কিন্তু এ সব কেন করছে? ওই চিৎকার মানুষের হতে পারে না! বাপরে বাপ, কি সাংঘাতিক! এত তাড়াতাড়ি ওই পোশাকই বা কোত্থেকে জোগাড় করল সে?'

'এইটা অবশ্য একটা কথা—এত তাড়াতাড়ি জোগাড় করল কি ভাবে?'

'সেটা কেবল ভূতের পক্ষেই সম্ভব। আর কোন ব্যাখ্যা নেই।'

'ভূত তো হতেই পারে না। হয়তো পোশাকটা আগে থেকেই তার কাছে ছিল, সুযোগমত কাজে লাগিয়েছে। আরেকটা কথা ভাবছি, চোর আর ভূত এক লোক নয়। আলাদা আলাদা।'

ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করল ওরা। তারপর আবার তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে নাস্তার পর ইয়াম নরটনের খোঁজে বেরোল তিন গোয়েন্দা। বাড়িটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। একটা ছাউনিমত তৈরি করা হয়েছে, বেড়ার কাজ সারা হয়েছে টার পেপার দিয়ে। কাছেই পড়ে আছে চাকাবিহীন মরচে পড়া দুটো গাড়ি, ক্র্যানবেরির কতগুলো শূন্য বাক্স, আর একগাদা কর্ডউড। ছাউনির সামনের বেড়ায় হেলান দিয়ে রাখা আছে মোটরসাইকেলটা।

গাড়ির শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরোল ইয়াম নরটন আর বছর ছয়েকের ছোট একটা মেয়ে। মেয়েটার মাথায় লালচে-সোনালি চুল, পায়ে জুতো-স্যান্ডেল কিছু নেই, খালি। হাতে একটা কাঠের পুতুল। গোয়েন্দাদের চকচকে গাড়িটা কৌতূহলী হয়ে দেখছে।

'দারুণ গাড়ি তো তোমাদের,' বলল সে। 'এত সুন্দর আর দেখিনি।'

'তুমিও খুব সুন্দর,' হেসে বলল কিশোর। 'নাম কি তোমার?'

'ডল। কই সুন্দর? চেহারা তো খারাপ হয়ে গেছে। গত বসন্তে অসুখ হয়েছিল যে। সবাই বলে, আমার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কে বলে?' হেসে এগিয়ে গেল মুসা। 'তুমি খুব সুন্দর। নামটা যেমন ডল, চেহারাটাও পুতুলের মতই।'

খুশি হলো মেয়েটা। পরক্ষণেই বিষণ্ণ হয়ে গেল আবার, 'মরেই যেতাম, বুঝলে। চিকিৎসা করে আমাকে সারিয়ে তুলেছেন…'

'থাক থাক, হয়েছে,' বাধা দিল তার বাবা, 'তোমার অসুখের খবর শুনতে নিশ্চয় আসেনি ওরা।

লম্বা, রোগাটে লোকটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে তাকাতে পারছে না যেন ছেলেদের দিকে। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে একহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

জীবিকার জন্যে কি কাজ করে লোকটা, ভাবতে লাগল কিশোর। এখনও কাজে বেরোয়নি, তার মানে নিয়মিত কোন কাজ পায় না সে। পাইন ব্যারেনে কিছু কিছু লোক আছে, খুব কষ্টে কাটে তাদের দিন, পড়েছে কিশোর। আর কোন কাজ পায় না বলে বনের নানা রকম জিনিস বিক্রি করে পেট চালায়। এই যেমন, বসন্তে স্ফ্যাগনাম নামে এক ধরনের শ্যাওলা তোলে, প্যাকেজিঙের কাজে আর ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার হয় এগুলো। গরমের শেষ দিকে পেড়ে আনে ব্লুবেরি আর ক্র্যানবেরি। আর পুরোটা শীতকাল ধরে কাঠুরের কাজ করে।

কি ভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না কিশোর। শেষে একবার অহেতুক কেশে নিয়ে বলল, 'আমরা একজন লোককে খুঁজতে এসেছি। তার নাম জিম হাচিনস। জরুরী একটা খবর আছে তার।'

কর্কশ কণ্ঠে নরটন বলল, 'সে মারা গেছে, বলেছিই তো।'

'তা তো বলেছেন,' নরটন যে মিথ্যে বলছে, সরাসরি এ কথা বলতে বাধছে কিশোরের। 'কিন্তু ভুলও তো হতে পারে আপনার। আমাদের বিশ্বাস, এখনও এই বনেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে, পুলিশের ভয়ে।'

'কিন্তু এখন আর সে ভয় করার প্রয়োজন নেই তার,' কিশোরের কথার সঙ্গে যুক্ত করল রবিন। 'অনেক আগেই তার ওপর থেকে খুনের অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল। 'আরও একটা সুখবর আছে তার জন্যে। অনেক টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন তার চাচা। তার ভাই জন হাচিনস তাকে সেই সম্পত্তির ভাগ দেয়ার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সময়মত গিয়ে দাবি করতে না পারলে সম্পত্তির ভাগ হারাবে জিম।'

শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল নরটনের। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিশোরের মুখের দিকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল, 'সরি, আমি আর কিছু বলতে পারছি না। আমি জানি, গত শীতে নিউমোনিয়ায় মারা গেছে জিম হাচিনস।'

কবরটা যে পুরানো, এ কথা নরটনকে বোঝাতে গেল মুসা। তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'দেখুন, সম্পত্তির কথাটা সত্যিই বলছি আমরা। বিশ্বাস করতে পারেন। জিম হাচিনসের সত্যিকারের বন্ধু যদি হয়ে থাকেন আপনি, কিংবা কোনভাবে যোগাযোগ থাকে তার সঙ্গে, দয়া করে খবরটা দেবেন।'

আর একটাও কথা না বলে বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল সে, 'চলো, যাই।'

সবশেষে গাড়িতে উঠল মুসা। ওঠার আগে ডলের দিকে তাকিয়ে একবার হাত নাড়ল। রিয়ারভিউ মিররে কিশোর দেখল, নরটনের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

মুখের ভাব বদলে গেছে। যেন কোন একটা ব্যাপারে দ্বিধায় পড়ে গেছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে যুদ্ধ করছে নিজের মনের সঙ্গে।

'কি মনে হয়?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'লোকটা মিথ্যে বলেছে?'

'আমাদের যে বিশ্বাস করতে পারছে না, এটা ঠিক। একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, জিম হাচিনসকে বাঁচাতে চাইছে সে।'

'খবরটা দেবে তো জিমকে?'

'কি জানি। দেখি অপেক্ষা করে, দেয় কিনা।'

ক্যাম্পে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিশোর বলল, পাইরেট'স ট্যাভার্নে যাবে তদন্ত করতে। হ্যামারের গাড়িতে পাওয়া দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে নকশা আঁকা আছে, খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না। মুসা আর রবিনও যেতে রাজি হলো।

ক্যাম্প থেকে বেশ অনেকটা দূরে ক্যাফেটা। গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ের কাছেই সাদা, বড় একটা বাড়ি। সামনে পার্কিং লট।

অর্ডার নিতে এসে ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়েট্রেস। শেষে জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'তোমরা তিন গোয়েন্দা না?'

অবাক হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

রবিন জানতে চাইল, 'কি করে চিনলেন?'

'পত্রিকায় ছবি দেখেছি তোমাদের। কে জানি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বেরোয়ে ওরকম একটা পত্রিকা ফেলে গিয়েছিল টেবিলে, তাতে দেখেছি। সে জন্যে তোমাদের চেহারা চেনা চেনা লাগছিল। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছ না তোমরা? পেয়েছ?'

'নাহ্,' হাসল কিশোর। 'অহেতুক পরিশ্রম, খোঁজাখুঁজিই সার।'

মহিলা ওদের চিনে ফেলায় আলোচনার সুবিধে হলো। কিশোর জানতে চাইল, গাঁটাগোট্টা, খসখসে কণ্ঠস্বর, শজারুর মত খাড়া খাড়া চুল, হলদেটে সাফারি জ্যাকেট পরা কোন লোককে দেখেছে কিনা এখানে। হ্যামারের চেহারার এই বর্ণনাই ওদেরকে দিয়েছেন ডিকটর সাইমন।

'দেখেছি!' মাথা দুলিয়ে বলল মহিলা। 'খসখসে কণ্ঠস্বর বললে তো, সে জন্যে চিনতে পারলাম। লোকটার গলা শুনে আমারও অবাক লেগেছিল, যেন একটা কোলাব্যাঙ। কিন্তু সে তো হপ্তাখানেক আগের কথা। দুই হপ্তাও হতে পারে। ঠিক মনে নেই।'

'তার সঙ্গে কেউ ছিল?'

'না। একা এসেছিল।'

কাছেই একটা বুদে একান্তে কথা বলছে দু-জন লোক। এদিকে পেছন করে আছে একজন, মুখ দেখা যাচ্ছে না তার। অন্যজনের রোদে পোড়া মুখ, সাদাটে-লাল চুল। কালো একটা ব্যাগের জিপার খুলল একজন। ভেতর থেকে যে জিনিসটা বের করল, দেখে চমকে গেল কিশোর। একটা পোর্টেবল সানল্যাম্প।

পাশে বসা রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে তাকে সতর্ক করল কিশোর। ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি এখানে প্রায়ই আসে?'

চট করে লোকগুলোর দিকে তাকাল একবার মহিলা। কিশোরের কণ্ঠস্বরেই যেন রহস্যের গন্ধ পেয়েছে সে। গোয়েন্দা যখন জিজ্ঞেস করছে, নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। ব্যাপারটাতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছে মহিলা। বলল, 'দাঁড়াও, ভাল করে দেখে আসি। শিওর হয়েই বলছি।'

রান্নাঘরে চলে গেল সে। ছেলেদের খাবার নিয়ে ফেরার পথে ইচ্ছে করেই বুদের ধার ঘেঁষে এগোল, আসার সময় মুখ ফিরিয়ে ভালমত দেখল একবার লোকগুলোকে। এগিয়ে এসে টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে নিচু স্বরে বলল, 'না, আগে দেখিনি। আজই প্রথম দেখলাম। যে ভাবে ফিসফাস করে কথা বলছে, সন্দেহই জাগায়। ভাবছি, ডিয়ারজ্যাকার নয় তো?'

'ডিয়ারজ্যাকার?' জিজ্ঞেস করল মুসা, 'সেটা আবার কি?'

'মৌসুম ছাড়া যারা মাংসের জন্যে বেআইনী ভাবে হরিণ শিকার করে। মাংস বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ থাকে এদের। অনেক হরিণ মেরে ফেলে।'

কাজ করতে চলে গেল মহিলা।

খাবার চিবাতে চিবাতে আড়চোখে লোকগুলোকে লক্ষ করতে লাগল কিশোর। অন্য দু-জনকে তাকাতে মানা করল, সন্দেহ করে বসতে পারে। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল সাদাটে-লাল চুলো লোকটা। বুদ থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে এগোল।

'কোথায় যায় দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'তোমরা বসো। গাড়ি থাকলে কি গাড়ি, নাম্বার কত, দেখে আসব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রবিন। উঠে গিয়ে কিশোরের চেয়ারটায় বসল। নজর রাখল বুদের লোকটার দিকে।

রবিনের দিকে মুখ করে বসে আছে মুসা। কফির কাপটা হঠাৎ তার ঠোঁটের কাছে এসে থমকে গেল। চোখে বিস্ময়।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

'ভোঁতা-নাক!'

আস্তে ফিরে তাকাল মুসা। দরজার দিকে মুখ করে বসেছে এখন লোকটা, বোধহয় সঙ্গীর ফেরার অপেক্ষায় আছে। 'খাইছে, সে-ই তো!'

কিশোর যে গেছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগল দুই গোয়েন্দা।

'এত দেরি করছে কেন?' বিড়বিড় করল মুসা।

'ভাল ঠেকছে না আমার,' রবিন বলল। 'চলো, দেখি।'

বিলের টাকা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল রবিন। মুসাও উঠল। দরজার দিকে এগোল একজনের পেছনে একজন। চলতে চলতে চট করে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল মুসা, ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ভোঁতা-নাক।

সরু করিডর ধরে ডাইনিং রুম থেকে ছোট লবিতে বেরিয়ে এল দু-জনে। সেটা ধরে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর মোড় নিয়ে একটা গলি চলে গেছে রেস্টরুম আর ফোন বুদের দিকে।

চলতে চলতে যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। তাকিয়ে আছে বুদের ভেতর পড়ে থাকা দেহটার দিকে। প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'সর্বনাশ! কিশোর!'

তেরো

বুদের দিকে দৌড় দিল দু-জনে।

চোখের পাতা কাঁপছে কিশোরের, হুঁশ ফিরছে। গুঙিয়ে উঠল। তারপর চোখ মেলল। উৎকণ্ঠিত হয়ে দুই বন্ধুকে তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল। 'কি হয়েছে আমার?'

'আমরাও তো সেটাই জানতে চাচ্ছি!' মুসা বলল।

মাথার একপাশে হাত দিল কিশোর। 'উহ্, ব্যথা! বাড়ি মেরেছিল!'

উঠে বসল সে। তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রবিন আর মুসা। ধরে ধরে বুদের বাইরে নিয়ে এল। লবিতে চেয়ারে এনে বসিয়ে দিল।

'কি হয়েছিল?' আবার জানতে চাইল মুসা।

আহত জায়গাটা ডলতে ডলতে জানাল কিশোর, 'ডাইনিং রুম থেকে করিডরে বেরিয়েই দেখি লোকটা গায়েব। অবাক হলাম, এত তাড়াতাড়ি পার্কিংলটে চলে গেল! দৌড় দিলাম। ভাবতেই পারিনি, লুকিয়ে থেকে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গলির মোড়টার কাছে পৌঁছুতেই পেছন থেকে এসে বাড়ি মারল মাথায়। তারপর বোধহয় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বুদে ভরেছে। আমি আর কিছু টের পাইনি।'

'ওর সঙ্গীটা কে জানো?' রবিন বলল, 'ভোঁতা-নাক।'

'তাই নাকি!' সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'কোথায় এখন?'

'আসার সময় তো কেবিনেই বসে থাকতে দেখলাম,' জবাব দিল মুসা।

'বেরোনোর আরও পথ থাকতে পারে।'

'তা পারে,' একমত হলো রবিন। 'আমরা ভেবেছি আমাদের লক্ষ করেনি, কিন্তু ঠিকই চিনে ফেলেছিল ব্যাটারা। নইলে তোমাকে বাড়ি মারত না। আর এই কাণ্ডের পর ভোঁতা-নাকও নিশ্চয় ধরা পড়ার জন্যে বসে নেই।'

তাড়াতাড়ি আবার ডাইনিং রুমে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। দেখা গেল, কিশোরের অনুমানই ঠিক। লোকটা নেই।

'আমরা বেরোনোর পর পরই বোধহয় পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'আমরা যখন বেরোচ্ছি, আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।'

ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, পেছনের দরজা দিয়ে লোকটাকে

বেরোতে দেখেছে সে।

দৌড়ে পার্কিংলটে বেরিয়ে এল তিনজনে। জানে, পাবে না, তবু ক্ষীণ একটু আশা, যদি লোকটা তখনও থেকে থাকে? কিন্তু দু-জনের কাউকেই চোখে পড়ল না। নিরাশ হয়ে নিজেদের গাড়ির কাছে ফিরে এল ওরা।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর, 'অ্যাই! একটা কথা! বোধহয় একটা সূত্র পেয়েছি!'

'কি সূত্র?' একসঙ্গে জানতে চাইল মুসা ও রবিন।

'বেরোনোর সময় আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল লোকটা!'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।

শিস দিয়ে উঠল রবিন, 'হ্যামারের ল্যাম্পটার মত!'

বোকা হয়ে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, 'কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'হ্যামারের গাড়িতেও এরকম একটা ল্যাম্প পেয়েছি, ভুলে গেছ?' বুঝিয়ে দিল কিশোর, 'জিনিসটা অকারণে নিশ্চয় বয়ে বেড়ায়নি, কোন উদ্দেশ্য ছিল। সে-জন্যেই এসেছিল পাইন ব্যারেনে। যে লোকটা আমাকে বাড়ি মেরেছে তার কাছেও সানল্যাম্প, ধরেই নেয়া যায় সে-ও হ্যামারের মতই অপরাধী।'

'লোকটা কে, শিওর হওয়া যায় কি করে?' জবাবের আশায় কিশোরের মুখের দিকে তাকাল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। তুড়ি বাজাল, 'দাঁড়াও, মিস্টার সাইমনকে ফোন করি।'

কার-টেলিফোন আছে ওদের গাড়িতে। মুসা আর রবিন বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল, কিশোর ঢুকল ফোন করার জন্যে। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে জানাল, 'মিস্টার সাইমনকে পাওয়া গেল না। তিনি রকি বীচে নেই। ল্যারি কংকলিনকে পেয়েছি, তাকে জানিয়েছি সব। বলেছে, ফোনের কাছে থাকতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোঁজ নিয়ে জানাবে।'

ল্যারি কংকলিন মিস্টার সাইমনের ব্যক্তিগত বিমানের পাইলট। গোয়েন্দাগিরিতেও সাহায্য-সহযোগিতা করে।

'তা তো হলো,' রবিন বলল। 'কিন্তু এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?'

'থাকব না। সেদিন তো অন্ধকারে দেখেছি, আজ একবার দিনের আলোয় দেখতে চাই জারসি ডেভিলের মূর্তিটাকে।'

'হঠাৎ করে আবার ওটা দেখার শখ হলো কেন?'

'আরেকটা সানল্যাম্প দেখলাম যে।'

'তারমানে এই লোকদুটোও ওদিকেই গেছে বলে তোমার ধারণা?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

রাস্তাটা এখন আর অপরিচিত নয়, তা ছাড়া দিনের আলো, আগের বারের চেয়ে অনেক দ্রুত এগোতে পারল ওরা। একই জায়গায় এনে গাড়ি রাখল রবিন। যে কোন মুহূর্তে ল্যারি কংকলিনের ফোন আসতে পারে,

একজনকে গাড়িতে থাকতে হবে। মূর্তিটা আগের বার দেখেনি মুসা, তাই কিশোরের সঙ্গে সে-ই চলল, রবিন বসে রইল গাড়িতে।

বনে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। অন্ধকারে জ্বলে ফ্লুরেসেন্ট আলো, দিনের আলোতে ম্লান হয়ে যায়। চিহ্নগুলো খুঁজে বের করতে বেশ অসুবিধেই হলো কিশোরের। তবে একটা জিনিস সাহায্য করল ওদের—গাছের গোড়ায় ঘাস দলেমুচড়ে আছে, এখানে ওখানে দু-চারটা ঝোপেরও ডাল ভাঙা, লোক চলাচলের চিহ্ন এগুলো। ওসব দেখে দেখে এগোতে পারল ওরা।

অবশেষে চোখে পড়ল শয়তানের মূর্তিটা।

ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে থমকে দাঁড়াল মুসা। বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। বোধহয় দোয়া-দরূদই পড়ল।

তার ভয় দেখে হাসল কিশোর। 'খুব সুন্দর তাই না? কথা হলো, এটাকে এখানে ঝুলিয়ে রেখে গেল কেন ডিয়াবোলোর লোকেরা?'

এদিক ওদিক তাকাল মুসা, চোখে অস্বস্তি। 'ডেগা গালুশ যে কারণে ঝোলাত হয়তো সেই একই কারণ...' আচমকা থেমে গেল সে। 'খাইছে!'

'কি হলো?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের কণ্ঠ।

'ওই গাছটায়! দেখো!' লম্বা একটা ওক গাছের দিকে হাত তুলল মুসা।

কিশোরও দেখল। ধাতব কতগুলো জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে গাছে, উঁচু টাওয়ারে চড়ার জন্যে যেমন লাগানো থাকে অনেকটা তেমনি। বুঝতে অসুবিধে হলো না, চড়ার জন্যেই লাগানো হয়েছে ওগুলো।

ওপরে তাকাল দু-জনে। অনেক উঁচুতে গাছের ডালে একটা কাঠের মাচামত বানানো হয়েছে। ভাল করে না তাকালে ঘন ডাল-পাতার জন্যে চোখে পড়ে না।

'লুকআউট পোস্ট!' কিশোর বলল, 'ওখানে উঠে নজর রাখে।'

'কারা?'

'দেখতে হবে।'

এগোতে গেল মুসা, তাকে থামাল কিশোর, 'দাঁড়াও, আগে ভাল করে দেখে নিই লোকটোক আছে কিনা।'

বেশ খানিকটা পিছিয়ে এল দু-জনে। তারপর গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, নজর ওপরের দিকে। দেখল, গাছের ওপরে মাচা কিংবা কোন ডালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। কাউকে চোখে পড়ল না। ফিরে এসে তখন উঠতে শুরু করল দু-জনে। মুসা আগে, কিশোর তার পেছনে।

চারকোনা করে তৈরি মাচাটাকে ঘিরে রেলিঙ লাগানো হয়েছে, যাতে কিনার দিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয় না থাকে। চারকোনায় চারটে খুঁটি লাগিয়ে তার ওপরে ঘাস-পাতা দিয়ে একটা চালাও বানানো হয়েছে। বসে চোখ রাখার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা। ভেতরে একটা চামড়ার কেসের মধ্যে রয়েছে একটা আয়না আর একটা দূরবীন।

দূরবীনটা তুলে নিয়ে চোখে লাগাল মুসা। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'কি সাংঘাতিক! সব দেখা যায়! তীরের কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে তা-ও

দেখা যায়!'

কিশোরের হাতে যন্ত্রটা তুলে দিল সে।

কিশোরও দেখল। দৃশ্য দেখে অবাক হলো মুসারই মত।

'অ্যাই!' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা, 'দেখো, ঝিক-ঝিক করছে কি!'

একবার দেখেই বুঝে ফেলল কিশোর, 'আয়নায় রোদ প্রতিফলিত করে আলো ফেলছে কেউ। সঙ্কেত দিচ্ছে। এখানেও আয়না রাখার কারণ বুঝতে পারছি। সঙ্কেতের জবাব দেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু মোর্স কোড বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ওদের কোন নিজস্ব কোড আছে।' আলোটা আসছে পশ্চিম দিক থেকে, দূরবীন দিয়ে সেদিকে তাকাল কিশোর। বড় ধূসর রঙের একটা ক্যাম্পার গাড়ি চোখে পড়ল, দাঁড়িয়ে আছে বড়রাস্তার ধারে। ওটাতে বসেই আয়নায় সঙ্কেত দিচ্ছে লোকটা।

মুসাকে সে কথা জানাল কিশোর।

'আচ্ছা, ওদের কাছে দূরবীন নেই তো?' মুসা বলল, 'তাহলে আমরা যেমন দেখছি, আমাদেরও দেখে ফেলবে! হতে পারে, মাচার ওপরে লোক দেখেছে বলেই সঙ্কেত দিতে শুরু করেছে।'

'ঠিক বলেছ! ও রকম জায়গায় গাড়ি রেখেছেই মাচার দিকে চোখ রাখার জন্যে। ওরা জানে, মাচায় উঠবে কেউ।'

'আমাদের চেহারা স্পষ্ট না দেখতে পেলেই বাঁচি!'

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আলোর প্রতিফলন থামল, তারপর শুরু হলো আবার, আগের চেয়ে দ্রুত নড়াচড়া করছে।

'জবাব না পেলে সন্দেহ হবে ওদের,' কিশোর বলল। 'দেখতে আসতে পারে।'

'আমরাও সঙ্কেত দিই না কেন?'

'কি করে? ওদের কোডই তো জানি না আমরা।'

'তাতে কি? খামোকাই আয়নাটা নাড়তে থাকব। ওরা ভাববে, সঙ্কেত ভুলে গেছে ওদের লোক, কিংবা কোন গোলমাল করে ফেলেছে। সন্দেহ জাগতে কিছুটা দেরি হবে, তাতে খানিকটা সময় পাব আমরা, ওই সুযোগে গাড়ির কাছে চলে যেতে পারব।'

'বাহ্, বুদ্ধি আজকাল খুলতে আরম্ভ করেছে তোমার,' মুসার বুদ্ধিটা পছন্দ হলো কিশোরের। আয়নাটা তুলে নিয়ে গাড়ির দিকে করে নাড়তে লাগল, ওরা যে ভাবে নাড়ছে, মোটামুটি তার নকল করে।

থেমে গেল ওপাশের সঙ্কেত। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু আর আলো দেখা গেল না।

'ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না আমার!' বিড়বিড় করল কিশোর।

মুখ খুলতে গিয়েও বন্ধ করে ফেলল মুসা, গাছের নিচে ঝোপের মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে। ফিসফিস করে বলল, 'শুনলে?'

'হ্যাঁ। এই গাছের দিকেই আসছে। জলদি নামো!'

ওরা নামার আগেই লোকগুলো গোড়ায় পৌছে গেলে আটকা পড়তে হবে, আর নামতে পারবে না। তাই তাড়াহুড়ো করে নামতে আরম্ভ করল ওরা। হাত ফসকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙার ভয়ও করল না। ওঠার চেয়ে নামা সহজ, তাই নিরাপদেই নেমে এল মাটিতে। একছুটে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে।

লোকগুলোর এগোনোর শব্দ এখন স্পষ্ট কানে আসছে। লাঠি বা ওরকম কোন জিনিস দিয়ে ডালপাতা পিটাতে পিটাতে আসছে।

'শিওর, আমাদেরকেই খুঁজছে!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'গাড়ির লোক নয় ওরা। আগে থেকেই ছিল আশেপাশে কোথাও। গাড়ি থেকে নেমে আসতে হলে আরও সময় লাগত, এত তাড়াতাড়ি পারত না।'

মাথা নিচু করে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইল ওরা।

এই সময় কানে এল কথা, 'গাছ থেকে নামতে দেখেছি আমি। এখানেই কোথাও আছে।'

'হুঁ, দূরে যাওয়ার সময় পায়নি,' বলল দ্বিতীয়জন। একটা ঝোপে লাঠি দিয়ে জোরে খোঁচা মেরে দেখল ভেতরে কিছু আছে কিনা।

'কুত্তাটা কই?' প্রথমজন জানতে চাইল।

'নৌকায়। কেন?'

'এভাবে খুঁজে অহেতুক সময় নষ্ট করছি। ওটাকে আনলে চোখের পলকে বের করে ফেলবে। চলো, গিয়ে নিয়ে আসি। গ্যাস গ্রেনেডও আনব। কুত্তাটা বিফল হলে গ্যাস ছড়িয়ে বের করে আনব ওদের।'

'কথাটা মন্দ বলোনি। কিন্তু আমরা গেলেই যদি সুযোগ পেয়ে পালায়?'

'তাহলে তুমি থাকো এখানে, পাহারা দাও। ওদের চোখে পড়লে পিছু নেবে। একা একা আটকাতে যেয়ো না। ওয়াকি-টকিতে আমাকে জানাবে সব।'

'ঠিক আছে।'

পায়ের শব্দ দূরে সরে যেতে শুনল গোয়েন্দারা। অন্য লোকটা গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, একাই ওদেরকে খুঁজছে এখন।

'কুত্তা নিয়ে আসা পর্যন্ত বসে থাকা উচিত হবে না,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'কিন্তু যাই কি করে? লোকটা তো দাঁড়িয়ে আছে।'

'পা টিপে টিপে পেছন থেকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব তার ওপর। মুহূর্তে কাবু করে ফেলতে হবে, নইলে সঙ্গীকে সতর্ক করে দেবে। দাঁড়াও, আরেকটু কাছে আসুক।'

এগিয়ে আসছে পদশব্দ। ঠাস ঠাস করে লাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে ঝোপের গায়ে।

'চলো!' বলল কিশোর।

নির্দেশ পেয়ে আর মুহূর্ত দেরি করল না মুসা। লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরোল

ঝোপ থেকে। শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল লোকটা। লাঠি তুলল বাড়ি মারার জন্যে। কিন্তু তার আগেই ডাইভ দিল মুসা। উড়ে গিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল লোকটার পেটে। অসম্ভব শক্ত তার খুলি, এর গুঁতো যে একবার খেয়েছে, জীবনে ভুলবে না। হুঁক করে উঠল লোকটা, শব্দ করে ফুসফুসের বাতাস বেরিয়ে এল হাঁ করা মুখ দিয়ে। সামনের দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে গেল শরীর। পড়ে যেতে শুরু করল।

ততক্ষণে কিশোরও পৌঁছে গেছে। একটানে লাঠি কেড়ে নিল লোকটার হাত থেকে। পড়ার আগের মুহূর্তে থাবা দিয়ে একটা ডাল ধরে ফেলল লোকটা। ওটা ধরে পতন ঠেকাল অনেক কষ্টে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না। ঘাড়ে পড়ল লাঠির বাড়ি।

কাটা কলাগাছের মত টলে উঠে পড়ে গেল লোকটা। পড়েই রইল, কোন নড়াচড়া নেই। নিথর। ঘাবড়ে গেল কিশোর, 'মেরে ফেললাম না তো!'

'এত জোরে মারলে কেন?'

'হুঁশ ছিল নাকি!'

তাড়াতাড়ি লোকটার পাশে বসে নাড়ি দেখল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'নাহ্, মরেনি! গণ্ডারের ঘাড়!'

লতা দিয়ে শক্ত করে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল দু-জনে মিলে। লোকটার গলার স্কার্ফ খুলে নিয়েই তার মুখে গুঁজে দিল যাতে চিৎকার করতে না পারে।

'যাক,' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল মুসা, 'ইচ্ছে করলেও আর ওয়াকি-টকিতে দোস্তকে খবর দিতে পারবে না।'

'চলো, পালাই! আর এক মুহূর্তও এখানে না…' বলেই দৌড় দিল কিশোর।

গাড়ির দিকে ছুটল দু-জনে।

হঠাৎ একটা শেকড়ে পা বেঁধে গিয়ে হুড়ুম করে আছড়ে পড়ল মুসা। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, 'মাগ্লোহ্, মরে গেছি!'

হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। এগিয়ে এল মুসাকে সাহায্য করার জন্যে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আবার বসে পড়ল মুসা, 'গেছে আমার গোড়ালিটা! এক্কেবারে শেষ!'

ঠিক এই সময় দূরে শোনা গেল কুকুরের ডাক। দু-জনের চোখের সামনেই যেন দুলে উঠল ডোবারম্যান পিনশার কুকুরের ভয়ঙ্কর মুখের ছবি। ধীরে ধীরে জোরাল হতে লাগল ঘেউ ঘেউ শব্দ। এগিয়ে আসছে দ্রুত।

চোদ্দ

মরিয়া হয়ে মুসাকে তুলে ধরল কিশোর। বলল, 'আমার গায়ে ভর দিয়ে এগোও! দাঁড়িয়ে থেকো না, জলদি করো!'

পা ফেলতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিন্তু আর বসল না। কিশোরের কাঁধে ভর রেখে যতটা দ্রুত সম্ভব হাঁটতে লাগল।

হেলান দিয়ে বসে ক্যাসেট প্লেয়ারে মিউজিক শুনছিল রবিন, কিশোর আর মুসাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে সোজা হয়ে বসল। বুঝতে পারল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলে নেমে এল মাটিতে। 'কি হয়েছে?'

'কুত্তা নিয়ে তাড়া করেছে আমাদের!' কিশোর জানাল। 'আছাড় খেয়ে গোড়ালি মচকে ফেলেছে মুসা! জলদি স্টার্ট দাও!'

কুকুরের ডাক শোনা গেল। আর কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল না রবিন। আবার উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।

মুসাকে পেছনের সীটে উঠে বসতে সাহায্য করল কিশোর। নিজে উঠল সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে। দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি পিছাতে শুরু করল রবিন। আলো আছে, তাই গতি বাড়িয়ে চালাতেও অসুবিধে হলো না। ঘোরানোর মত প্রশস্ত জায়গায় আসার আগে কথা বলল না। গাড়ি ঘুরিয়ে, একরাশ ধুলো উড়িয়ে ছুটল। পেছনে কাউকে আসতে দেখা গেল না। বড় রাস্তাটা চোখে পড়ার পর শরীরটা ঢিল করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, এবার বলো, কি হয়েছিল?'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

'সর্বনাশ! আমি তো কিছুই টের পাইনি!' রবিন বলল। 'তোমাদের ধরতে পারলে আমাকেও ছাড়ত না। আমি কিছু সন্দেহ করার আগেই এসে ধরে ফেলত।'

পেছনের সীটে এলিয়ে পড়ে আছে মুসা। 'সর্বনাশ যা করার আমারই করেছে! পা-টা গেছে আমার!'

'দোষটা কিছুটা তোমারও,' কিশোর বলল। 'আরেকটু সাবধান হয়ে দৌড়ানো উচিত ছিল।'

'অত উত্তেজনায় সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে নাকি?'

'না থাকলে ওরকম করেই পা ভাঙে। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, ভাঙেনি। তাহলে এক পা-ও এগোতে পারতে না। স্ট্রেচার ছাড়া আনা যেত না তোমাকে। মচকেছে। খুব সামান্য। সেরে যাবে।' রবিনের দিকে ফিরল কিশোর, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, ল্যারির কোন খবর আছে?'

ঘাড় নেড়ে মানা করতে যাবে রবিন, ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন। ছোঁ মেরে তুলে নিল কিশোর, 'কে, ল্যারি?'

'হ্যাঁ।'

'কি খবর?'

'লোকটার খোঁজ নিয়েছি। নাম নিকারভ হামদামকি। অপরাধী মহলে নিকাদামকি বলে পরিচিত। ওয়ারেন্ট আছে তার নামে। অপরাধের সীমা-সংখ্যা নেই। গাড়ি চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, এমনকি মানুষ খুনের চেষ্টার জন্যেও তাকে দায়ী করা হয়।'

'খুব খারাপ কথা। আরেকটু হলে আমাকেই দিয়েছিল শেষ করে। মাথার বাড়িটা বোধহয় আস্তে হয়ে গিয়েছিল, তাই মরিনি। যাই হোক, আর কি খবর?'

'তিনবার জেল খেটেছে। ধরা পড়লে আরও একবার খাটতে হবে। এবার বোধহয় যাবজ্জীবন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'খুব সাবধানে থাকবে। নিকাকে বিশ্বাস নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমাদের গুপ্তধনের কি খবর?'

'খুঁজছি। কিছুই করতে পারিনি এখনও। কেন, কিছু জেনেছেন নাকি?'

'উপকূলের কাছে একটা শহর আছে, নাম টাকারটন; সেখানে একটা হিসটরিক্যাল সোসাইটি আছে, পাইন ব্যারেনের লোককথা আর ইতিহাসের কিছু রেকর্ড আছে তাতে। সোসাইটির সেক্রেটারি বছর দুই আগে একটা কেসে আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কাছে গেলে হয়তো কিছু তথ্য পেতে পারো।'

'তাই নাকি! দারুণ একটা খবর দিলেন! নাম-ঠিকানা বলুন তো?'

ল্যারি বলে গেল, মুখস্থ করে নিল কিশোর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আরেকটা কথা, হারগিনস ডফারের নাম শুনেছেন? উকিল?'

ছোট্ট করে হাসল ল্যারি। 'কি জানতে চাও তার সম্পর্কে?'

'কি কি জানেন?'

'আদালতে বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। পশার মোটেও ভাল না, নামডাক নেই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে মক্কেলদের কাছ থেকে। সেটা তদন্ত করে দেখছে এখন স্টেট বার অ্যাসোসিয়েশন।'

'কি অভিযোগ?'

'এই যেমন অ্যাসোসিয়েশনের কাছে বিচার দিয়েছে একজন মক্কেল, একটা দামী দলিল নাকি রাখতে দিয়েছিল ডফারের কাছে। কিন্তু ডফার সেটা হারায়। ভুল করে নাকি ডিপজিট-বক্সে না রেখে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়, সেখান থেকে হারিয়ে যায়। সে বলছে, এটা স্রেফ দুর্ঘটনা, তার অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন এ কথা বিশ্বাস করেনি।'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। বলল, 'দামী দলিলটা কি বুঝতে পারছি। ডেগা গালুশের চিঠি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

ল্যারিকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে লাইন কেটে দিল কিশোর। যা যা জেনেছে জানাল দুই সহকারীকে। শেষে বলল, 'এই জন্যেই ফটোকপি করা চিঠিটার কথা শুনে এত অস্থির হয়ে গিয়েছিল ডফার। যে করেছে সে নিশ্চয় প্রমাণ করে দিতে পারবে যে আসল চিঠিটা ডফারের কাছেই আছে, ওখান থেকে কপি করেছে।'

'তারমানে নিশ্চিত জেল,' সামনের পথের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। ব্যথা অনেক কমে এসেছে মুসার পায়ের। কারও সাহায্য ছাড়াই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারছে। বোঝা যাচ্ছে, তাড়াতাড়িই সারবে।

সকাল সকাল খেয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। বলল, জরুরী কাজ আছে, খাওয়ার পর করতে হবে সেগুলো।

রান্না সারতে দেরি হলো না। ভেড়ার মাংসের গরম গরম কাবাব চিবুতে চিবুতে বলল সে, 'ডিয়াবোলো এখন এখানে কেন, বোধহয় বুঝতে পারছি। ওয়ান্টেড লিস্টে আছে, অর্থাৎ পুলিশ যাদের খুঁজছে এমন সব অপরাধীদের দেশ থেকে বের করে দিতে সাহায্য করছে সে।'

'ঠিক,' রবিন বলল, 'আমারও কিন্তু একথাটাই মনে হচ্ছিল।'

'কেন মনে হলো তোমাদের ওকথা?' মুসার প্রশ্ন। মুখ ভর্তি গোস্ত। কথা বলতেই অসুবিধে হচ্ছে।

'হ্যামারের কথা ভেবে,' জবাব দিল কিশোর। 'সে ডিয়াবোলোর একজন কাস্টোমার।'

'আর ওই নিকাদামকি হলো আরেকজন,' বলল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রোভার, 'হ্যামারকে কাস্টোমার বললে কেন?'

'কাস্টোমারই তো বলব। অপরাধীদের বের করে দেয়ার জন্যে একেকজনের কাছ থেকে নিশ্চয় অনেক টাকা নেয় ডিয়াবোলো। এটা তার ব্যবসা। টাকা ছাড়া মুফতে করতে যাবে না কিছুতেই।'

'কি করে বলো তো?'

পকেট থেকে শয়তানের মূর্তিটা বের করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। আরেক টুকরো মাংস মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে নিল। তারপর বলল, 'ধরা যাক, চুক্তি হয়ে গেলে, প্রথম কিস্তির টাকা চুকিয়ে দেয়ার পর প্রতিটি কাস্টোমারকে একটা করে এই জারসি ডেভিলের পুতুল দেয়া হয়। এটা হলো টিকেট। তারপর তাদেরকে পাইরেটস ট্যাভার্ন রেস্টুরেন্টে যেতে বলা হয়। ওখানে ডিয়াবোলোর লোক থাকে। পুতুল দেখে কাস্টোমার চিনে নেয়। একটা আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্প আর নকশা দিয়ে বলে দেয়া হয়, বনের মধ্যে কোনখান দিয়ে কি ভাবে যেতে হবে। রাতের জন্যে বসে থাকে কাস্টোমার। ল্যাম্পটা সে-জন্যেই দেয়া হয়। অন্ধকার হলে বনে ঢুকে ফ্লুরেসেন্ট পেইন্টের চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে যায় জারসি ডেভিলের মূর্তিটার

কাছে, যেখানে আছে গাছের মাথায় লুকআউট পোস্ট।'

দম নেয়ার জন্যে থামল কিশোর।

সবাই খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি মুসাও প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিশোর থামতেই বলল, 'থামলে কেন?'

বোরিস জানতে চাইল, 'তারপর কি করে?'

'বনের ধারে কাছাকাছি নিশ্চয় কোন নদী বা খাল আছে, যেটার সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ,' আবার বলতে লাগল কিশোর। 'গাছের মাথায় চড়ে একটা নদীমত দেখেছি। বনের মধ্যে লোকগুলো একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছিল, কুত্তাটা কোথায়? অন্যজন জবাব দিয়েছিল, নৌকায়। পানি ছাড়া নৌকা থাকতে পারে না।

'যাই হোক, লুকআউট পোস্টে উঠে বসে থাকে ডিয়াবোলোর লোক। কাস্টোমার গাছের কাছাকাছি এলে লোকটা নেমে তাকে নিয়ে যায় নৌকার কাছে। নৌকায় করে সাগরে, যেখানে জাহাজ অপেক্ষা করে। লোকটাকে জাহাজে তুলে দেয়া হয়। তখন তাকে নিয়ে গিয়ে কোন বিদেশী বন্দরে নামিয়ে দেয় জাহাজ। ব্যস, ডিয়াবোলোর দায়িত্ব শেষ।'

'সাংঘাতিক!' আবার খেতে শুরু করল মুসা।

বোরিস জিজ্ঞেস করল, 'খাওয়ার পর জরুরী কাজ আছে বললে? কি কাজ?'

'আজকে পাইরেটস ট্যাভার্নে নিকাদামকিকে ল্যাম্প দিতে দেখেছি। নিশ্চয় নকশাও দেয়া হয়েছে তাকে। আমার ধারণা আজ রাতেই ওই বনে ঢুকবে সে, পাচার হওয়ার জন্যে।'

হাসল বোরিস। ভালুকের থাবার মত বিশাল থাবা দিয়ে গাল চুলকাল। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল। বলল, 'তখন আমরা গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসব, এই তো? যাক, এদ্দিনে একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গেল। বসে থাকতে থাকতে ঘুণ ধরে যাচ্ছিল গায়ে।'

তাঁবু খালি ফেলে যাওয়া যাবে না। ঠিক হলো, রোভার থাকবে পাহারায়। তার সঙ্গে থাকবে মুসা, কারণ তার পায়ে ব্যথা। জরুরী মুহূর্তে ঠিকমত দৌড়াতে না পারলে নিজে তো বিপদে পড়বেই, অন্যদেরও ফেলবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই গাড়ি নিয়ে রওনা হলো কিশোর, রবিন আর বোরিস। বড় রাস্তার কাছে এসে গলিটা দিয়ে না এগিয়ে মোড়ের কাছে ঝোপের মধ্যে গাড়িটা ঢুকিয়ে রাখল রবিন। গলির শেষ মাথায় গাড়ি নিলে ফেরার সময় অসুবিধে হয়ে যায়।

আরেকটা ঝোপে লুকিয়ে বসল গোয়েন্দারা। বোরিস জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাটা এলে কি করব? ঘাড় মটকে দেব?'

'না,' কিশোর বলল। 'গাড়ি থেকে নামলেই ধরে ফেলব। ঘাড়-টার মটকানোর দরকার নেই।'

তাতে খুব একটা খুশি হতে পারল না যেন বোরিস। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হো-কে!' অর্থাৎ, ও-কে।

'গাড়ি নিয়ে যদি এগোয়?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাহলে গাছপালার আড়ালে থেকে অনুসরণ করব। জোরে জোরে হাঁটলেই গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে পারব।'

'এক কাজ করি, একটা গাছে উঠে যাই। তাহলে আগে থেকেই দেখতে পাব তাকে, তোমাদের সাবধান করে দিতে পারব।'

'বেশি ওপরে উঠো না,' সতর্ক করে দিল কিশোর। 'তাহলে নামতে দেরি হবে।'

মাটি থেকে ফুট দশেক ওপরের একটা ডালে গিয়ে বসল রবিন। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি ডালটার গোড়া পোকায় খাওয়া। বসতে না বসতেই মড়মড় করে উঠল, সে কিছু করার আগেই তাকে নিয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে। নিজের অজান্তেই চিৎকার বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে।

শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর, ডাকাতদের শুনে ফেলার ভয়ে। তাড়াতাড়ি বলল, 'চুপ! চুপ! বেশি ব্যথা পেয়েছ?'

'নাহ্, ব্যথা পাইনি। বুঝতে পারিনি…'

'থাক, আর গাছে চড়ার দরকার নেই। এখানেই এসে বসো…'

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনে থেমে গেল কিশোর। এগিয়ে আসছে শব্দটা।

হেডলাইট দেখা গেল। মোড়ের মাথায় এসে গতি কমাল। গাড়ির নাক ঘোরাতে যাবে, এই সময় জ্বলে উঠল একটা শক্তিশালী স্পটলাইট। ভারী, জোরাল একটা কণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'থেমো না! এগিয়ে যাও!'

পরক্ষণেই টাশ্ টাশ্ করে ফাঁকা গুলির শব্দ হলো কয়েকবার, গাড়ির চালককে হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে।

থামল না আর গাড়িটা, নাকও ঘোরাল না, সোজা ছুটে চলে গেল হাইওয়ে ধরে।

পনেরো

বোবা, বিমূঢ় হয়ে বসে রইল গোয়েন্দারা।

এরকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাই করতে পারেনি কিশোর। রাগত কণ্ঠে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের দেখে ফেলেছিল ডাকাতেরা! চলো দেখি লোকটাকে ধরা যায় কিনা?'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল এবার বোরিস। কিশোর আর রবিন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। গাড়িটাকে রাস্তার দিকে মুখ করেই পিছিয়ে ঢুকিয়েছিল রবিন, এ ধরনের কোন জরুরী মুহূর্তের কথা ভেবে, তাই বের করে আনতে মোটেও বেগ পেতে হলো না বোরিসকে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভারের চেহারা দেখেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'তুমি দেখেছ?'
'না।'
'তবে নাকাদামকিই এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে ছাড়া এই বুনোপথে রাতের বেলা আর কে নামতে যাবে?'
অনেক আগে চলে গেছে গাড়িটা। গাঢ় রঙের একটা শেভি গাড়ি, কোন মডেল খেয়াল করতে পারেনি গোয়েন্দারা, আচমকা উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল ওদের। নাম্বার প্লেট দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। এরকম পরিস্থিতির জন্যে তৈরিই ছিল না ওরা। থাকলে অতটা চমকে যেত না।
ওস্তাদ ড্রাইভার বোরিস, গাড়িটাও ভাল, তীব্র গতিতে ছুটছে। তবে শেভির ড্রাইভারও কম ওস্তাদ নয়। প্রাণপণে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বোরিসের সঙ্গে পারছে না। ক্রমেই কমে আসছে মাঝখানের দূরত্ব।
'পিস্তল নেই তো ওর কাছে?' রবিন বলল।
'থাকতেই পারে,' বলল কিশোর। 'এরকম অপরাধীর কাছে না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক। তবে ওর বেশি কাছে যাচ্ছি না আমরা। কেবল দেখে আসব কোথায় যায়, পরে পুলিশকে জানাব।'
ড্যাশবোর্ড রেডিওতে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। সামনে রোডব্লক দেয়া গেলে লোকটাকে ধরে ফেলতে পারবে পুলিশ।
সামনের গাড়ির জানালা দিয়ে কিছু একটা বেরোতে দেখল কিশোর।
বোরিসেরও চোখে পড়ল সেটা। হেডলাইটের আলোয় চকচক করে উঠল ভাঙা বোতলের কাঁচের মত জিনিস। গতি না কমিয়েও ওগুলোকে এড়ানোর জন্যে শাঁই করে পাশে কাটল সে। কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারল না। চাকার নিচে লেগেই গেল।
ভ্রাম করে বিকট শব্দে ফাটল সামনের একটা টায়ার। চাকা বসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। ভয়াবহ ঝাঁকুনি খেতে খেতে সরে যাচ্ছে রাস্তার পাশের দিকে।
এই অবস্থায় রবিন বা কিশোর হলে কিছুতেই সামলাতে পারত না গাড়িটাকে, বোরিস চালাচ্ছে বলেই পথের পাশের খাদে পড়া থেকে বাঁচল ওরা। আশ্চর্য দক্ষতায় ব্রেক কষে, স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটাকে থামিয়ে ফেলল সে, দুর্ঘটনা ঘটল না।
পুরো তিরিশ সেকেন্ড বোবা হয়ে বসে রইল ওরা। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকের ভেতরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আস্তে আস্তে কমে এল সেটা। তখন রবিন বলল, 'বাঁচালেন, বোরিস!'
কিন্তু জবাব দিল না বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান, গাড়িটাকে ধরতে পারল না বলে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে তার।
তিক্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'গেল, আর ধরতে পারলাম না!'
কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে বেরিয়ে এল ওরা। সামনের বাঁ দিকের চাকাটা গেছে। স্পেয়ার চাকা আছে গাড়িতে, বদলাতে বিশ মিনিট লাগল।

নাকাদামকির পিছু নেয়ার কোন উপায় নেই আর, হারিয়ে যাওয়ার জন্যে বিশ মিনিট অনেক সময়। পুলিশকে খবর দিয়েও আর লাভ নেই।

ক্যাম্পে ফিরে চলল ওরা।

'কোন লাভই হলো না,' গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে থেকে নিরাশ কণ্ঠে বলল রবিন।

'একেবারেই হয়নি বলতে পারো না,' কিশোর বলল। 'নাকাদামকিকে যদি আজকেই পাচারের কথা থাকে, তাহলে জাহাজটা থাকবে তীরের কাছাকাছি।'

'তাই তো!' ঝট করে সোজা হয়ে বসল রবিন। 'হয়তো আগামী চব্বিশ ঘণ্টাই থাকবে, স্মাগলারদের সঙ্কেতের অপেক্ষায়।'

'ঠিক। এখন কোনমতে মিস্টার সাইমনের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে, তিনি কোস্ট গার্ডকে হুঁশিয়ার করে দেবেন জাহাজটার ওপর নজর রাখার জন্যে।'

'এক্ষুণি ফোন করো!'

ডায়াল করল কিশোর। রিঙ হতে লাগল। ওপাশ থেকে ধরতে দেরি হলো। বাড়িতে সাইমনের ভিয়েতনামী চাকর নিসান জাং কিম ছাড়া আর কেউ নেই। সে ছিল রান্নাঘরে। চুলায় রান্না ফেলে এসে ধরতে পারছিল না বলেই দেরি হয়েছে, জানাল। মিস্টার সাইমন বাড়ি নেই। ল্যারি কংকলিনও কাজে বেরিয়েছে, পরদিন ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না।

লাইন কেটে দিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। আনমনেই বিড়বিড় করল, 'নাকাদামকিকে তুলে নিলে আজ রাতেই তুলে নেবে। দিনের আলোয় তোলার সাহস করবে না নিশ্চয়। আজ রাতে নিতে না পারলে কাল ওকে খুঁজে বের করার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারি।'

ক্যাম্পে ফিরল ওরা। সব শুনে মুসা আর রোভারও খুব দুঃখ করল—নাকাদামকি অল্পের জন্যে হাতছাড়া হয়ে গেল বলে।

অনেক রাত হয়েছে। আপাতত আর কিছু করার নেই। শুয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু ঘুম আসতে চাইল না কারও চোখে। সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। বাইরে স্তব্ধ নীরব রাত, মাঝে মাঝে ঝিঁঝি ডাকছে, আবার থেমে যাচ্ছে। থেকে থেকে অদ্ভুত ভারী স্বরে বুম বুম করে উঠছে পাইনবনের নিশাচর বাজ। হঠাৎ অন্য ধরনের একটা শব্দ কানে ঢুকতেই মুসা বলে উঠল, 'শুনলে! অ্যাই, ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না,' সাড়া দিল কিশোর। 'ফগহর্নের মত লাগল। জাহাজ।'

একটা বিচিত্র শব্দ হলো, বনের স্বাভাবিক শব্দ নয়। আর শুয়ে থাকতে পারল না ওরা। তাঁবু থেকে বেরোল।

রোভার বলে উঠল, 'ওই দেখো ওটা কি!'

পাহাড়ের গোড়ায় একটা সবজে আভা দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে।

এইবার আর তাড়াহুড়ো করল না গোয়েন্দারা, আরেকবার সব পশু

করার ইচ্ছে নেই। দ্রুত আলোচনা সেরে নিল। এবারও মুসা আর রোভার থাকবে তাঁবুর পাহারায়, অন্য তিনজন দেখতে যাবে আলোটা কিসের।

সাবধানে ঢাল বেয়ে এগোল কিশোর, রবিন আর বোরিস। তিনজনের হাতেই একটা করে লাঠি, আক্রমণ এলে আত্মরক্ষার জন্যে।

কাছাকাছি যেতেই নিভে গেল আলোটা। কিন্তু তার আগেই যা দেখার দেখে ফেলেছে কিশোর, চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, ফাঁদ!'

একটা লতায় পা বেধে হোঁচট খেল রবিন। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

ষোলো

চেষ্টা করেও রবিনকে ধরতে পারল না কিশোর। তিন লাফে কিশোরের পাশ কাটিয়ে চলে গেল বোরিস, শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল রবিনকে, সরিয়ে আনল বিপজ্জনক এলাকা থেকে।

ওখানেই বসে পড়ে ফোঁপাতে শুরু করল রবিন।

ফাঁদের ওপর টর্চের আলো ফেলল কিশোর। হাঁ করে আছে ইস্পাতের ভয়ঙ্কর দাঁতওয়ালা একটা ভালুকধরা ফাঁদ। সময়মত বোরিস আটকাতে না পারলে তার মধ্যে গিয়ে পড়ত রবিন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল সে। এর মধ্যে পা পড়লে বিশাল ভালুকও ছুটতে পারে না। মানুষের পা পড়লে চামড়া-মাংস তো কাটবেই, হাড়ও দু-টুকরো হয়ে যাবে।

পায়ের চাপে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল। ঝট করে সেদিকে টর্চ ঘোরাল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। লোকটাকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরি, এ তো ডফার! ধরো, ধরো!'

লোকটার পেছনে দৌড় দিল তিনজনে। সাংঘাতিক ছুটতে পারে ডফার। কিন্তু কিছুতেই তাকে পালাতে দেবে না বোরিস। ভীষণ রেগে গেছে। বোকা বানিয়ে তাদেরকে তাঁবু থেকে বের করে এনেছে ভালুকধরা ফাঁদে ফেলার জন্যে। এত্তবড় শয়তান লোককে কিছুতে পালিয়ে যেতে দেবে না সে।

ঘন বনে ঢুকে পড়ল ডফার। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল। গাছের শুকনো ডালটা সর্বনাশ করে দিয়েছে তার। ওটাতে পা না পড়লে তাকে দেখতে পেত না গোয়েন্দারা, সে যে লুকিয়ে ছিল জানতে পারত না। মরিয়া হয়ে ওদেরকে খসানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে কিশোরের টর্চের আলোর বাইরে যেতে পারল না।

হাঁপিয়ে পড়ল ডফার। গতি কমে আসতে লাগল। বোরিসের কিছুই হয়নি, সে সমান তালে ছুটছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ডফারের ওপর। এতবড় দেহের ধাক্কা সামলাতে পারল না ডফার, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

কলার ধরে তাকে টেনে তুলল বোরিস। একটা গাছের সঙ্গে চেপে ধরল।

'ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ডফার।

ভালুকের থাবার মত বিশাল থাবা তুলল বোরিস। 'ছাড়ব মানে! বত্রিশটা দাঁত না ফেলেই? আরেকটু হলেই ছেলেটার পা-টা শেষ করে দিয়েছিলে!'

তিনজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল উকিল। 'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না!'

ইশারায় বোরিসকে মারতে নিষেধ করে শীতল দৃষ্টিতে ডফারের দিকে তাকাল কিশোর। 'পারছেন না? শীঘ্রি পারবেন, পুলিশের কাছে গেলেই। দলিল চুরির অপরাধে ওরা আপনাকে খুঁজছে।'

'বাজে কথা বলে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, খোকা!' আচমকা গমগম করে উঠল ডফারের কণ্ঠ, আদালতে আসামীকে জেরা করার সময় যেভাবে কথা বলে তেমনি ভঙ্গিতে। সামলে নিয়েছে ধাক্কাটা। 'কোন অপরাধ প্রমাণ না করে কাউকে আটকাতে পারো না তুমি, আইনত সেটা অপরাধ। আমি একজন অভিজ্ঞ উকিল, মনে রেখো কথাটা। আমাকে কিছু করে পার পাবে না।'

কিন্তু ধমক দিয়ে কিশোরকে কাবু করতে পারল না সে। তার মুখের ওপর হেসে উঠল কিশোর। 'আমাদের বিপদ তো পরে হবে, মিস্টার ডফার, নিজের বিপদ সামলানোর কথা ভাবুন আগে। বার অ্যাসোসিয়েশনের লোকেরা আপনাকে খুঁজছে।'

স্থির হয়ে গেল ডফার। হাঁ হয়ে গেল। কিশোররা যে সব জানে, ভাবেইনি।

দ্রুত লোকটার ওপর চোখ বোলাল কিশোর। ফ্ল্যানেলের শার্ট গায়ে, পরনে খাকি প্যান্ট। পায়ে ভারী রবার সোলের জুতো, নিচে বেশ গভীর করে খাঁজ কাটা, যাতে হাঁটার সময় কোনমতেই পিছলে যেতে না পারে।

'এই জন্যেই,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর, 'সেদিন আমাদের খাবার চুরি করার পর জুতোর ছাপ মুছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল আপনার। মাটিতে গভীর ছাপ পড়ে গিয়েছিল, তাই না? তবে উকিল হিসেবে আঙুলের ছাপের কথাও ভাবা উচিত ছিল আপনার। গাড়ির দরজার হাতলে আপনার আঙুলের ছাপ পেয়েছি আমরা, আদালতে সেগুলো দাখিল করা হবে। তো, এখন যাচ্ছিলেন কোথায়? আপনার গাড়ির দিকে? কাছেই রেখেছেন বুঝি ওটা? আমাদের খাবারের প্যাকেটগুলোর দু-চারটা এখনও আছে না ওর মধ্যে?'

জবাব দিল না ডফার। তবে চোখ দেখেই বুঝতে পারছে কিশোর, তার অনুমান ঠিক।

ভাগ্য যখন বিরূপ হতে থাকে, সবদিক থেকেই হতে থাকে। ডফারের বেলাতেও তাই ঘটল। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা একটা খামের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন, 'এটা আবার কি?' উপুড় হয়ে খামটা তুলে নিল সে।

'এটা আমার!' রবিনের হাত থেকে খামটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল

ডফার। 'তোমাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময় পকেট থেকে পড়েছে। দাও, দাও ওটা।'

রবিনের হাত থেকে খামটা নিয়ে নিল কিশোর। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের খামের ভেতরে দেখা যাচ্ছে হলদে হয়ে আসা কাগজ। বের করে টর্চের আলোয় দেখতে শুরু করল সে।

ডফারকে ধরে রেখেছে বোরিস, শত চেষ্টা করেও হাত ছাড়াতে পারল না উকিল, খামটা নিতে পারল না।

দেখতে দেখতে শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'এই তো ডেগা গালুশের আসল চিঠি!'

ডফারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাচিয়ে রবিন বলল, 'এটাই তাহলে মক্কেলের কাছ থেকে চুরি করেছেন। আপনার অপরাধের আরও একটা বড় প্রমাণ পাওয়া গেল।'

এরপর আর কিছু করার নেই, একেবারে কুঁকড়ে গেল ডফার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। বলল, 'চুরি করিনি, বিশ্বাস করো···হারিয়ে গিয়েছিল, আজ সকালে কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি···রকি বীচে ফিরেই যার জিনিস তাকে দিয়ে দিতাম··· তোমাদের গাড়ি থেকে খাবার চুরি করেছি আমি স্বীকার করছি, তবে ইচ্ছে করে নয়···মাথাটা কেমন গড়বড় হয়ে গিয়েছিল···প্রচণ্ড মানসিক চাপ চলছে আমার···'

'মানসিক চাপ তো বাড়ি বসে থাকেননি কেন?' ধমক দিয়ে বলল কিশোর, 'ভালুকের ফাঁদ পাততে আসার শয়তানি বুদ্ধিটা তো ঠিকই মাথায় গজিয়েছিল। কেন পেতেছিলেন? ভেবেছেন আমাদের কেউ জখম হলে এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হব? নানা ভাবে আমাদের তাড়ানোর চেষ্টা করেছেন আপনি। কেন? গুপ্তধন খুঁজতে সুবিধে হবে বলে?'

কিশোরের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ডফার বলল, 'ফাঁদ পেতেছি বটে, কিন্তু ক্ষতি তো আর হয়নি, বেঁচে গেছ···বললাম না মানসিক চাপ, নইলে অমন কাজ কেউ করে?' খাতির করার ভঙ্গিতে বলল, 'দাঁড়াও, সবুজ আভাটা কি দিয়ে তৈরি করেছি দেখাচ্ছি তোমাদের,' পকেট থেকে ছোট একটা টর্চলাইট বের করল সে, কাঁচের ওপর সবুজ রঙের স্বচ্ছ প্লাস্টিক কয়েক পরত করে জড়ানো। জ্বেলে দেখাল, 'এই দেখো। আসলে ক্ষতি করার জন্যে এসব করিনি। বনের মধ্যে আছ, ভাবলাম ভূতের ভয় দেখিয়ে একটু মজা করি···তবে ফাঁদ পেতে কাজটা ঠিক করিনি স্বীকার করছি।···ইয়ে, ডেগা গালুশের গুপ্তধন খোঁজা চালিয়ে যেতে পারো তোমরা, আমি আর বাধা দেব না। এমনও হতে পারে, একসঙ্গেই খুঁজতে পারি আমরা। তাতে আমার মক্কেল কিছু মনে করবে না। তারপর পেয়ে গেলে তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেব। ঠিক আছে?'

'আপনার মাথা আসলেই খারাপ হয়ে গেছে,' ভোঁতা স্বরে বলল কিশোর। 'আপাতত চিঠিটা আমার কাছেই থাক, পুলিশের হাতে তুলে দেব। পুলিশই এটা পৌঁছে দেবে আপনার মক্কেলের কাছে। তিনি তখন ঠিক করবেন

আপনার ওপর থেকে অভিযোগ তুলে নেয়া যায় কিনা।'
ডফারকে ছেড়ে দিল বোরিস।
মার খাওয়া কুত্তার মত কাঁধ নামিয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল লোকটা।
তাঁবুতে ফিরে এল গোয়েন্দারা।
পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে টাকারটনের হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। শহরে এসে ওটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না। প্রায় একশো বছরের পুরানো বেশ সুন্দর একটা বাড়ি। তাতে সোসাইটিটা প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁর নাম অ্যারিগিন উইনার।
হাসিখুশি, মিশুক মানুষ তিনি। চোখে হাসি নিয়ে ছেলেদের স্বাগত জানালেন। হাত মেলাতে মেলাতে বললেন, 'আমি জানতাম তোমরা আসবে। এত দেরি করেছ বলেই বরং অবাক হয়েছি। পত্রিকায় দেখেছি ডেগো গালুশের গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহী তোমরা।'
'সত্যি কি আছে ওগুলো?' জানতে চাইল কিশোর।
'পাওয়া যায়নি এখনও একথা ঠিক,' ঘুরিয়ে জবাব দিলেন উইনার।
'তারমানে আপনার বিশ্বাস, আছে ওগুলো। যাই হোক, ডেগো গালুশের ব্যাপারে কোন রেকর্ড কি আছে আপনাদের এখানে?'
'আছে,' মাথা ঝাঁকালেন সোসাইটির বৃদ্ধ সেক্রেটারি। 'এসো, দেখাব।'
বিরাট একটা ঘরে গোয়েন্দাদের নিয়ে এলেন উইনার। বুককেস, ফাইল কেবিনেট আর কাঁচের ডিসপ্লে কেসে বোঝাই ঘরটা। কেসের মধ্যে যত্ন করে রাখা হয়েছে নানা রকম জিনিস—ঐতিহাসিক নিদর্শন।
পুরানো ফাইল আর কাগজপত্র ঘেঁটে ওরা জানতে পারল: সতেরোশো একাশি সালের মার্চের চার তারিখে টাকারটনের কাছে ধরা পড়ে ডেগো গালুশ।
'তারমানে এর পরদিন চিঠিটা লিখেছিল সে!' বলল রবিন।
জানা গেল: তার দুই সহকারী পিটার আর ডেনফ্রে ধরা পড়ে যথাক্রমে মার্চের ৫ এবং ৬ তারিখে, উপকূলেরই দুটো বিভিন্ন জায়গা থেকে।
'এর অর্থ,' অনুমানে বলল কিশোর, 'ডেগোর চিঠি পেয়ে গুপ্তধনের ভাগ নিতে আসার সময় ধরাটা পড়ে ওরা।'
'এবং সেই জন্যেই বোধহয়,' মুসা বলল, 'তাদের কাছে রূপার কিছু পাওয়া যায়নি, কারণ তখনও জিনিসগুলো হাতেই পড়েনি। ওদের কাছে তেমন কিছু পাওয়া গেলে লেখা থাকত।'
'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন।
আরও জানা গেল: অসংখ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল ওই তিন ডাকাত। পুরানো খবরের কাগজের একটা কাটিঙে লেখা আছে—ফাঁসিকাঠে চড়ানোর পর ব্যঙ্গের হাসি হেসে ডেগো বলেছিল, 'দশ কদম উত্তরে আরেকজন মরা মানুষের সাক্ষাৎ পাবে, যদি তুমি ভাগ্যবান হও!'
'খাইছে! এটা আবার কি কথা?' মুসা বলল।

'কি?' তার দিকে তাকাল অন্য দুই গোয়েন্দা।

কাটিংটা ঠেলে দিল মুসা।

কিশোর আর রবিনও পড়ল। কিশোর বলল, 'এই *দশ কদম* কথাটা চিঠিতেও লেখা আছে, যদিও ওখানে আছে *দশ কদম উত্তরে কাক যেখানে ওড়ে।* কিন্তু মানে কি এ কথার?'

'তা বলতে পারব না,' হাত নাড়ল মুসা।

রবিন বলল, 'তবে আমার বিশ্বাস, ছাউনিতে যে P অক্ষরটা দেখেছে মুসা, সেটা দিয়ে পিটারের কথা বোঝানো হয়েছে।'

'কিন্তু ফিশহুকের মানে কি?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কিশোর।

'কি আর,' জবাব দিয়ে দিল মুসা, 'বড়শি। মাছ ধরার বড়শি।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'অত সহজ না। অন্য কিছু বুঝিয়েছে।'

এ ব্যাপারে উইনার কোন সূত্র কিংবা তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন না ওদেরকে। কথা দিলেন, জানার চেষ্টা করবেন, এবং জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সোসাইটি থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা

ক্যাম্পে ফেরার পথে এসে দাঁড়াল ইয়াম নরটনের ঘরের সামনে।

'আবার এসেছ তোমরা!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা।

'আরেকবার জানাতে এলাম আপনাকে,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'জিম হাচিনসের ওপর থেকে খুনের অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে। চাচার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক টাকার মালিক হয়েছে সে।'

'আর কতবার বলব জিম হাচিনস নিউমোনিয়ায় মারা গেছে!'

এই সময় ঘর থেকে প্রায় দৌড়ে বেরোল ডল। বলল, 'তোমরা এসেছ! এখনি চলে যাবে?'

হেসে জবাব দিল মুসা, 'তোমার আব্বা তো তাই চায়। কি আর করব?'

কিশোর তাকিয়ে আছে মেয়েটার হাতের কাঠের পুতুলটার দিকে। মনে পড়ে গেল জন হাচিনসের কথা—ছুরি দিয়ে কাঠ কেটে, চেঁছে পুতুল বানাতে ভালবাসত জিম!

ডলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডল, পুতুলটা কোথায় পেলে?'

'যাও, ঘরে যাও!' আচমকা চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন নরটনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'ওদের সঙ্গে কোন কথা নেই তোমার!'

যাওয়ার একটু ইচ্ছেও ছিল না ডলের, কিন্তু বাবার আদেশ অমান্য করতে পারল না। কাঁদো কাঁদো মুখ করে চলে গেল ঘরের ভেতর।

এখানে থেকে আর কোন লাভ নেই। গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। চলতে আরম্ভ করল গাড়ি।

কিছুদূর আসার পর রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, পুতুলটার কথা জিজ্ঞেস করায় অত খেপে গেল কেন নরটন?'

জবাব দিল না কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর

ভাবনায় ডুবে গেছে।

সতেরো

ক্যাম্পে ফিরে খাওয়ার পর ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান, 'আবার বেরোব আমরা।'

'কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

'পুতুলের খোঁজে।'

'পুতুল দিয়ে কি করবে?'

'পুতুল দিয়ে আমি কিছু করব না। তবে জানার চেষ্টা করব, কাঠ কুঁদে পুতুল বানানোর কারিগর এখানে কয়জন আছে, কারা কারা।'

ঠিকানাটা পেল ওরা পেট্রল স্টেশনের সেই মেকানিকের কাছে। তেল নিতে সেখানে ঢুকেছিল গোয়েন্দারা। ট্যাংকে পেট্রল ভরছে মেকানিক, কায়দা করে কিশোর বলল, 'আমার একটা ছোট বোন আছে, পুতুলের খুব শখ। কাঠের পুতুল। ভাবছি পাইন ব্যারেন থেকে স্যুভনির হিসেবে নিয়ে যাব ওর জন্যে। এখানে কে ভাল পুতুল বানায় বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়। জিমি হিগিন্স। ছুরি দিয়ে চেঁছে পুতুল বানাতে তার জুড়ি নেই।'

হিগিনসের বাড়ির ঠিকানা বলে দিল মেকানিক।

'ভাগ্য মনে হচ্ছে ভালই আমাদের,' গাড়িতে উঠে রবিন বলল। 'খোঁজাখুঁজির দরকারই পড়ল না। ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে না তোমার, কিশোর? আমরা খুঁজছি জিম হাচিনসকে, আর কারিগরের নাম জিমি হিগিন্স। আসল নামটা সামান্য বদলে নিয়ে থাকতে পারে।'

'গেলেই দেখা যাবে,' জবাব দিল কিশোর।

বনের মধ্যে জিমি হিগিনসের কেবিন। বড় রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে হয়। কয়েকটা ডগউড গাছের জটলা আর কাঁটাঝোপ ঘিরে আছে ঘরটাকে। সামনে ছোট্ট বারান্দা, সিডার কাঠের রেলিঙ। বেশ ছিমছাম, সুন্দর। এতদিন বনে টার পেপারে ছাওয়া যে সব ছাউনি দেখেছে গোয়েন্দারা, সেটার তুলনায় এটা অনেক ভাল।

কিন্তু ডাক দেয়ার পর যে মানুষটা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তাকে দেখে দমে গেল ওরা। নেভির পোশাক পরা যে লোকটার ছবি দেখেছে, তার সঙ্গে এই লোকের কোন মিলই নেই।

'মিস্টার হিগিনস?' জানতে চাইল কিশোর।

'তোমরা কারা?'

'আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। শুনলাম, আপনি খুব ভাল পুতুল বানান। কিনতে এসেছি।'

'বিক্রি করার মত পুতুল এখন নেই আমার কাছে।' কর্কশ গলায় বলে

দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল হিগিনস।

অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

'জিম হাচিনসের চেহারার মত কিন্তু লাগল না,' রবিন বলল।

'না। জিম হাচিনস তো নয়ই, জিমি হিগিনস কিনা তা-ও সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'কেন?'

'ডফার সাবধান করে দিয়ে থাকতে পারে জিমকে। বলেছে, তাঁকে খুঁজছি আমরা, সে যে কাঠের পুতুল বানাতে পারে জানি। জিম তখন অন্য কাউকে জিমি হিগিনস সাজিয়ে রেখে গেছে তার হয়ে কথা বলার জন্যে।'

'কিন্তু কথাও তো বলল না ভালমত,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা।

তার কথার জবাব না দিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। তিন পা এগোতে না এগোতেই একটা শেকড়ে পা বেধে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। 'মাগ্গোহ্!' বলে বিকট চিৎকার করে উঠল।

'কি হলো! কি হলো!' করে ছুটে গেল রবিন ও মুসা। কিশোরকে তুলে বসানোর চেষ্টা করল।

আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'উফ্, গেছিরে, আমার পা-টাই ভেঙে গেছে!'

'ভেঙে গেছে!' অবাক হয়ে বলল রবিন, 'এইটুকুতেই…বলো কি?'

ঘরের জানালা খুলে গেল। উঁকি দিল লোকটা। জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছে কেন ও?'

'পা ভেঙে গেছে। একটু সাহায্য করবেন?'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল লোকটা। কি সাহায্য করবে বুঝতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল।

চিৎকার বাড়ছেই কিশোরের, 'আল্লাহরে, মরে গেলামরে! কি ব্যথা গো!'

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন আরেকজন মানুষ। লম্বা, পেশীবহুল শরীর, কালো চুল। এগিয়ে এসে মোটা লোকটার কাঁধে চাপড় দিয়ে বললেন, 'তুমি সরো। আমি দেখছি।'

কিশোরের পায়ের কাছে বসে পড়লেন তিনি। পায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

গড়াগড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কিশোরের। শান্ত ভঙ্গিতে উঠে বসে জানতে চাইল, 'মিস্টার হাচিনস?'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন মানুষটা। 'তু-তুমি…তার মানে পা ভাঙেনি তোমার, অভিনয় করছিলে!'

'আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার হাচিনস। আপনাকে বের করে আনার আর কোন উপায় ছিল না। আমি জানি, ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনার, নেভিতে মেডিক্যাল কোরে ছিলেন। অসুস্থ রোগীকে দেখে স্থির থাকতে পারে না কোন সত্যিকারের ডাক্তার, সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই, এই সূত্রটাই কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম।'

টানটান উত্তেজনার একটা মুহূর্ত। ভয়ে ভয়ে আছে গোয়েন্দারা, এই বুঝি ফেটে পড়লেন হাচিনস। কিন্তু ওদেরকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিয়ে অবশেষে হাসলেন তিনি। 'তারমানে তোমার বুদ্ধির কাছে হেরে যেতেই হলো আমাকে। নাহ, আসলেই খুব ভাল গোয়েন্দা তোমরা।'

হাসি ফুটল গোয়েন্দাদের মুখে। হাত মেলাল জিম হাচিনসের সঙ্গে।

হাচিনস জানালেন, 'এখানে জঙ্গলের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা নেই, সে জন্যে আমিই ডাক্তার সেজে বসেছি। রোগ হলেই আমার ডাক পড়ে। আধুনিক মেডিসিনে ভাল জ্ঞান না থাকলেও চিকিৎসা শাস্ত্রের আরেকটা বিদ্যা, কবিরাজিতে ওস্তাদ হয়ে গেছি বলতে পারো। একজন বুড়ো ইনডিয়ান ওঝার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার এখানে, তার কাছ থেকে শিখেছি ভেষজ চিকিৎসা। জঙ্গলে গাছগাছড়া, শেকড়-বাকড়ের অভাব নেই, অনেক কাজ হয় ওসব দিয়ে। রোগীর কাছে ডাক্তারের চেয়ে বড় আর কিছু নেই, সে জন্যেই এই এলাকার মানুষ আমার বন্ধু হয়ে গেছে। আমার পরিচয় গোপন করে রাখে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ বুজে থাকে। তোমাদের সঙ্গেও খারাপ আচরণ করেছে দু-চারজন, অন্যায়ই করেছে, অপরাধীকে আশ্রয় দেয়াও আইনের চোখে অপরাধ। আশা করি ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে না তোমরা?'

'না, তা আনব না,' বলল কিশোর। 'কারণ, আমি হলেও এইই করতাম। উপকারী বন্ধুকে সবাই সাহায্য করতে চায়। তা ছাড়া আইনের বিরোধিতা করেনি তারা, আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই নেই পুলিশের। সেটা জানানোর জন্যেই আপনাকে খুঁজছিলাম আমরা। আপনার বন্ধু নরটনকে কয়েকবার করে বলেছি, কিন্তু আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি সে।'

মাথা ঝাঁকালেন হাচিনস, 'আমাকে বলেছে সে। কিন্তু আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'আমরা পাইন ব্যারেনে আসছি শুনে আপনার চাচাত ভাই জন হাচিনস দেখা করতে এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনিই আপনাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ জানিয়েছেন আমাদের। আপনাদের দু-জনেরই এক চাচা অনেক টাকার সম্পত্তি রেখে নাকি মারা গেছেন। তার অর্ধেক ভাগ পাবেন আপনি। পনেরো দিনের মধ্যে আপনি গিয়ে যদি সেই সম্পত্তির ভাগ দাবি না করেন তাহলে পরে আর পাবেন না, উইলে সে রকমই লেখা আছে।'

জন হাচিনস যা যা বলে গেছেন, সব জিমকে বলল কিশোর। ভাইয়ের অনুশোচনার কথা বলল। মন দিয়ে শুনলেন জিম, কিন্তু মুখের উদ্বেগ কাটল না। বললেন, 'হুঁ, ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারি। তবে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না জনকে। এত সহজে স্বভাব বদলায় না। এমনও হতে পারে কায়দা করে আমাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর অন্য কোন কৌশলে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে দখল করে নেবে সমস্ত সম্পত্তি।'

'সেটা আপনাদের ব্যাপার,' কিশোর বলল। 'আমার দায়িত্ব ছিল আপনাকে জানানো, জানালাম। তবে আরও একটা কাজ করতে পারি

আপনার হয়ে, জানার চেষ্টা করতে পারি আমাদের কাছে কোন রকম মিথ্যে বলেছে কিনা আপনার ভাই।'

'করবে!' কিশোরের হাত ধরলেন জিম, 'তোমাদের উপকারের কথা তাহলে কোনদিন ভুলব না আমি!'

আবার বলল কিশোর, 'করব।'

এক রহস্যের সমাধান হলো, খুঁজে পাওয়া গেল জিম হাচিনসকে। আরেক রহস্যের কথা তুলল এখন কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডেগা গানুশের গুপ্তধনের কথা তো নিশ্চয় শুনেছেন। ফিশহুক শব্দটার কোন মানে বলতে পারেন?'

চিন্তা করে নিলেন জিম। ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'মনে হচ্ছে কোথাও শুনেছি শব্দটা। কোন বুড়ো কাঠুরের কাছে, ঠিক মনে করতে পারছি না। যদ্দূর সম্ভব, বনের মধ্যে ওই নামের কোন একটা জায়গার কথা বলেছিল লোকটা। ভুতুড়ে শহর-টহরও হতে পারে।'

'আর কিছু জানেন না, না?'

মাথা নাড়লেন হাচিনস।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠল গোয়েন্দারা। ক্যাম্পে ফিরে চলল।

একনাগাড়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'মুসা, গাড়ি ঘোরাও! এয়ার ফিল্ডে যাব আমরা!'

আঠারো

কোন প্রশ্ন না করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল মুসা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এয়ার ফিল্ডে কেন?'

'একটা প্লেন ভাড়া করব,' জবাব দিল কিশোর। 'উড়ে বেড়াব জঙ্গলের ওপর দিয়ে।'

'দোহাই কিশোর, তোমার হেঁয়ালিগুলো দয়া করে একটু ছাড়ো!'

'হেঁয়ালি করছি না আমি, অহেতুক ঘুরে বেড়াব না। গেলেই দেখবে।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। আর কোন প্রশ্ন করল না তাকে রবিন কিংবা মুসা। জানে, করে লাভ হবে না। নিজে থেকে কিছু যদি না বলে কিশোর, পেটে বোমা মেরেও তার কাছ থেকে আর কথা আদায় করা যাবে না।

এয়ার ফিল্ডে এসে দরদাম করে কয়েক ঘণ্টার জন্যে একটা ছোট টুইন-ইঞ্জিন প্লেন ভাড়া করল কিশোর।

গাড়িটা ফিল্ডের পার্কিং লটে রেখে বিমানে চড়ল তিন গোয়েন্দা। আকাশে উড়ল বিমান। উপকূল ধরে সোজা বনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল পাইলটকে কিশোর।

আকাশ থেকে খুব সুন্দর লাগছে পাইন বনটাকে। সামনে দূরে মহাসাগরের নীল-সবুজ পানির বিশাল বিস্তার। তাতে অসংখ্য ছোট-বড় ফোঁটা, দূর থেকে জাহাজ আর বোটগুলোকে অমন লাগছে।

মুসাই প্রথমে লক্ষ করল ব্যাপারটা। 'খাইছে!' বলে পাশে বসা কিশোরের কাঁধ খামচে ধরল সে। 'দেখো কাণ্ড!'

নিচের দিকে তাকাল কিশোর। সে-ও দেখতে পেল: ঘন গাছের মাথাগুলো একটা সবুজ চাদরের মত লাগছে। তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে রূপালি নদী। এমন ভাবে বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে একটা জায়গায়, দেখতে লাগছে একটা মাছধরা বড়শির মত।

'এইটাই!' বিমানের ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'এটার কথাই বলেছে ডেগো গালুশ!' বলেই চুপ হয়ে গেল পাইলটের দিকে চোখ পড়তে। অচেনা লোকের সামনে গোপন কথা এ ভাবে বলে ফেলা উচিত হচ্ছে না।

নদীর এই বাঁকটা কোন জায়গায়, ক্যাম্প থেকে কতদূরে, ম্যাপ বের করে তাতে চিহ্ন দিয়ে রাখল সে। যা দেখার জন্যে বিমান ভাড়া করেছিল, সেই কাজ হয়ে গেছে, অহেতুক আর উড়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না এখন। পাইলটকে ফিল্ডে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিল সে।

গাড়িতে করে ক্যাম্পে ফেরার পথে বন্ধুদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল কিশোর, 'জিম হাচিন্স বনের মধ্যে ভূতুড়ে শহরের কথাটা বলেই ভাবনাটা মাথায় ঢুকিয়েছে আমার। মনে হলো, তাই তো, প্লেনে করে উড়লেই তো পারি, নিচে কি আছে দেখতে পারি। এবং সত্যি, কাজটা হয়েই গেল।'

'তাহলে কি তোমার মনে হচ্ছে ওই বাঁকের কাছেই কোথাও আছে গুপ্তধন?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয়। অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে এসেছে এখন আমার কাছে।'

'তাই নাকি?' স্টিয়ারিং ধরে সামনের পথের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, 'বলোই না শুনি?'

'তোমার আবিষ্কারটা দিয়েই শুরু করি, ফিশহুক পি...'

'পি মানে তো পিটার, বুঝলাম।'

'হ্যাঁ। তখনই ভাবতে শুরু করলাম, পি দিয়ে নামের আদ্যক্ষর বুঝিয়েছে একজন লোক, ওটা তার স্বাক্ষর। কিন্তু ফিশহুক মানে কি? কেন লিখেছে ওই শব্দটা?'

'কোন ধরনের মেসেজ,' রবিন বলল।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'যতদূর মনে হয় তখন ছাউনিতে ছিল না ডেনফ্রে, শুধু পিটার একা, এই সময় ডেগো গালুশের কাছ থেকে চিঠিটা তাদের কাছে নিয়ে আসে ইনডিয়ান পত্রবাহক। পিটারের মত একজন ডাকাতের কাছে সে যুগে কাগজ-কলম থাকার কোন কারণ ছিল না, আর অকারণে ওসব জিনিস বয়ে বেড়াবেই বা কেন সে। তাই কাঠের গায়ে খোদাই করে ডেনফ্রের জন্যে মেসেজ রেখে গিয়েছিল, কোথায় দেখা করতে হবে সর্দারের

সঙ্গে।

'তাই তো!' বলে উঠল রবিন, 'এ ভাবে তো ভাবিনি! পিটার এই মেসেজ পেয়েই ছুটল, কিন্তু গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার আগেই ধরা পড়ল।'

'সে-রকমই কিছু ঘটেছে।'

দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল বোরিস আর রোভার, গাড়ির শব্দ শুনে দৌড়ে এল।

সব কথা ওদেরকে জানাল গোয়েন্দারা। বলল, নদীর বাঁকে যাবে গুপ্তধন খুঁজতে। ওদেরকে জানানোর জন্যেই আসলে ক্যাম্পে ফিরেছে ওরা। আর ফিরেছে যখন, খেয়ে নিল কিছু, তারপর আবার বেরোল। বোরিসদেরকে জানিয়ে রাখল, ঠিক কোন জায়গাটায় ওরা যাবে।

ওপর থেকে দেখেছে, তা ছাড়া দাগ দিয়ে নিয়েছে ম্যাপে, নদীর ওই বাঁকটার কাছে পৌছতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। পাথরের ছড়াছড়ি ওখানটায়। নদীটা বেরিয়েছে পাহাড়ের ঢালের নিচে একটা গুহা থেকে।

বড়শির মাথাটার কাছে দাঁড়িয়ে কিশোর বলল, 'এখান থেকে দশ কদম উত্তরে যেতে হবে আমাদের। এসো, শুরু করি।'

আকাশ থেকে দেখে বড়শির মত বাঁকটা সম্পর্কে বেশ ভাল একটা ধারণা হয়ে আছে ওদের, তবু আরও শিওর হওয়ার জন্যে কম্পাসের সাহায্য নিল ওরা। মেপে মেপে গুণে গুণে এগোল দশ কদম। এসে থামল কয়েকটা গাছের জটলার মধ্যে।

জায়গাটা মুসার চোখে পড়ল প্রথম, খানিকটা আয়তাকার জায়গা, কিছুটা যেন বসে গেছে। এর চারপাশে, ওপরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পাথর, যেন ইচ্ছে করেই পাথরগুলো ফেলা হয়েছে ওখানটাতে।

স্থির দৃষ্টিতে জায়গাটার ওপর পড়ে থাকা পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। তারপর এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা পাথর সামান্য এদিক ওদিক সরিয়ে দিতেই অবাক হয়ে তার দুই সহকারী দেখল পাথর সাজিয়ে লেখা দুটো ইংরেজি অক্ষর তৈরি হয়ে গেছে: DM.

'ডি এম!' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল রবিন, বড় বড় হয়ে গেছে চোখ, 'তারমানে ডিন মার্টিন! চিঠিতে তো এর কথাই লিখেছে ডেগা গালুশ—অবস্থা খারাপ হয়ে গেল তার এবং মারা গেল!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। শুকনো গলায় বলল, 'খারাপটা কি হয়েছিল তার, তা-ও আন্দাজ করতে ।রছি। হয় ভোজালি দিয়ে মার্টিনকে কোপ মেরেছিল ডেগা, কিংবা পাথর দিয়ে মাথায় বাড়ি।'

'কেন সেটা করবে?' মুসার প্রশ্ন।

'এ তো সহজ কথা। একজন লোক কমে গেলে গুপ্তধনের ভাগীদার কমে গেল একজন। কিংবা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিল লোকটা, টের পেয়ে খতম করে দিয়েছে ডেগা। কারণ যেটাই হোক.' এক মুহূর্ত থেমে গাল

চুলকাল কিশোর, 'তাকে খুন করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লাশটা এখানেই মাটি চাপা দিয়েছে ডেগা।'

'নিশ্চয় তার নিচেই আছে গুপ্তধনগুলো,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'তা তো বুঝলাম, এখন কি করব? খুঁড়ে দেখব?'

'ক্‌-কবর খুঁড়বে?' ইচ্ছে নেই মুসার, ভয় পাচ্ছে, 'এত পুরানো কবর!'

'খুঁড়তে হলে শাবল দরকার,' কিশোর বলল। 'পাব কোথায়? আনা উচিত ছিল, গুপ্তধন মাটির নিচেও যে থাকতে পারে ভুলে গিয়েছিলাম···যাকগে, আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। ডেগা গালুশের কথা আর বিশ্বাস করব কিনা বুঝতে পারছি না।'

ভ্রূকুটি করল রবিন, 'মানে?'

'ডেগা ছিল এক মহাধড়িবাজ লোক। তিন সহকারীর একজনকে যখন নিজের হাতে খুন করতে পেরেছে, অন্য দু-জনকেই বা বিশ্বাস করতে যাবে কেন? ওদেরকে চিঠিতে জানিয়েছে গুপ্তধনগুলো কোথায় আছে। জানা হয়ে গেলে তার আগেই এসে ওরাও তাকে ফাঁকি দিয়ে তুলে নিয়ে যেতে পারত। কেন এই ঝুঁকি নেবে ডেগা?'

'তাই তো, এটা তো ভাবিনি! কিন্তু এমনও হতে পারে, সত্যিই অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছিল মারটিন, ডেগা তার সঙ্গে বেইমানী করেনি।'

'তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। ডেগা ভাল লোক ছিল না। তার চরিত্রের কোন ভাল দিকের কথা কোথাও লেখা নেই। আমার তো মনে হয় অন্য দুই সহকারীকে ধরিয়ে দেয়ার পেছনেও তার হাত ছিল···'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'ওসব নিয়ে আলোচনা করে এখন ফায়দা কি? এসো, খোঁজার কাজটা সেরে ফেলি। *দশ কদম উত্তরে, কাক যেখানে ওড়ে* কথাটার মানে কি? কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে না।'

'মোটেও না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'চিঠিটা লিখেছেই হয়তো পিটার আর ডেনফ্রেকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে! কাক যেখানে ওড়ে বলে অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে। *যেখানেটাকে* যদি *যেভাবে* করে দিই, তাহলেই একটা অর্থ দাঁড়িয়ে যায়—সরাসরি এগোনোর কথা বোঝায়। ওড়ার সময় তো রাস্তার দরকার পড়ে না যে এঁকেবেঁকে যেতে হবে, আকাশপথে ইচ্ছেমত উড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাত্র দশ কদমের জন্যে এটা বলার মানে কি?'

'হ্যাঁ, সেই জবাবটাই আমরাও জানতে চাই!' বলে উঠল একটা খসখসে কণ্ঠ। 'বলে ফেলো!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, বেরিয়ে এসেছে বনের ভেতর থেকে। তাদের একজনকে দেখে বিশেষ অবাক হলো না গোয়েন্দারা, সেই ভোঁতা-নাক, যাকে অপরাধী বলে আগেই সন্দেহ করেছিল। কিন্তু চমকে গেল আরেকজনকে দেখে, পিটার সেবিল, সাংবাদিক, যে ওদের সাক্ষাৎকার নিয়ে পত্রিকায় ছেপেছিল।

আর যে লোকটা কথা বলেছে—লম্বা, বাদামী চামড়া, বাঁকা নাক, সে যে

এই দলের নেতা, ভিকটর সাইমন যাকে খুঁজছেন, সেটা বুঝতেও অসুবিধে হলো না ওদের।

উনিশ

'এল ডিয়াবোলো!' বিড়বিড় করল রবিন।

হেসে উঠল লম্বা লোকটা। ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত। বলল, 'চালাক ছেলে তোমরা।'

নেতার কথা সমর্থন করে, খানিকটা তোয়াজ করার ভঙ্গিতে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল তার তিন সঙ্গী।

'মনে হচ্ছে,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আমরা যে আসব আপনারা জানতেন?'

'ঠিক তা নয়,' হেসে তার গলায় ঝোলানো দূরবীনটার গায়ে হাত বোলাল ডিয়াবোলো। 'গাছের ওপরের লুকআউট পোস্টে বসে পাহারা দিচ্ছিল সেবিল। বনের ওপরে প্লেন উড়তে দেখে সন্দেহ হয়। আমাকে জানায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম তোমরাই প্লেনটা ভাড়া করেছিলে। তখন লুকআউট থেকে নজর রাখলাম তোমাদের গতিবিধির ওপর। দূরবীন দিয়ে দেখলাম তোমরা কোথায় আছ। চলে এলাম।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সেবিলের দিকে তাকাল মুসা। তার দৃষ্টি সইতে না পেরে আরেক দিকে চোখ সরাল লোকটা। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন স্বরে মুসা বলল, 'রিপোর্টার না ছাই! আপনার মত লোক সংবাদপত্রের কলঙ্ক!'

রেগে গেল সেবিল, 'চুপ করো! বেশি কথা বোলো না! নিজেদের বড় গোয়েন্দা ভেবে গর্বে তো আর মাটিতে পা পড়ে না, এত সহজে ফাঁদে পড়লে কেন? গাধার মত আমার পাঠানো টোপ গিলে বসলে কেন?'

'টোপ গিলে বসলাম মানে!' ভুরু কুঁচকে সেবিলের দিকে তাকাল কিশোর। 'সাক্ষাৎকার দিয়েছি যে সেটার কথা বলছেন?'

'না। চিঠি। ডেগা গালুশের চিঠির নকল।'

প্রশ্ন করে করে জেনে নিল কিশোর, পাইন ব্যারেনে হারগিনস ডফারকে আসতে দেখে প্রথমে তাকে গোয়েন্দা অথবা পুলিশের লোক ভেবেছিল ডিয়াবোলো। ভেবেছিল, গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। খোঁজ নেয়ার জন্যে লোক পাঠাল তার তাঁবুতে। ওখানেই ডেগা গালুশের আসল চিঠিটা দেখেছে সেই লোক।

ডিয়াবোলো শুনে নিশ্চিত হতে পারল না, চিঠিটা আসল না নকল। জালও হতে পারে। গুপ্তধনের নকশা কিংবা দলিল অনেক সময়ই জাল হয়ে থাকে। কিংবা এমনও হতে পারে, গুপ্তধন খুঁজতে আসার ছুতো করে আসলে তাকেই খুঁজতে এসেছে ডফার।

ডফার লোকটা কে, কি জন্যে পাইন ব্যারেনে এসেছে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তখন লোভী সাংবাদিক পিটার সেবিলকে ধরল ডিয়াবোলো। সে জেনেছিল, ভিকটর সাইমনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ আছে তিন গোয়েন্দার, অনেক সময় ওদের সাহায্য নেন তিনি, তদন্ত করতে পাঠান। সাইমনেরই লোক কিনা ডফার জানতে হলে তিন গোয়েন্দাকে ব্যবহার করাটাই সঙ্গত মনে করল ডিয়াবোলো। সেবিলকে পাঠাল তিন গোয়েন্দার সাক্ষাৎকার নেয়ার কথা বলে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে। গুপ্তধনের কথা শুনে যদি ওরা আগ্রহ দেখায়, তাহলে বুঝবে ওগুলোর কথা আগে থেকে জানে না ওরা, ডফারও ওদের পরিচিত কিংবা সাইমনের সহকারী নয়।

পাইন ব্যারেনে গুপ্তধন খুঁজতে এল তিন গোয়েন্দা। ডফারের ওপর থেকে সন্দেহ চলে গেল ডিয়াবোলোর। তিন গোয়েন্দার ওপর নজর রাখতে লাগল তখন—যদি কোন কারণে ওদের পিছু পিছু সাইমনও এসে হাজির হন, সেই জন্যে।

'নজর রাখার আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল,' হেসে বলল সেবিল, 'সত্যিই যদি গুপ্তধনগুলো বের করে ফেলো? সেই ক্ষমতা তোমাদের আছে, জানতাম। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এমন কিছু গুপ্তধন তোমরা খুঁজে বের করেছ, যেটাকে অসাধ্য সাধনই বলা যায়। ডেগা গালুশের গুপ্তধনের ব্যাপারেও যদি তেমন কিছু ঘটে, তাহলে আমাদের আর পায় কে? কি বলো?'

'ধরে নেয়া যায়,' ডিয়াবোলো বলল, 'এই গুপ্তধনও ওরা পেয়ে গেছে।' সাদা দাঁত বের করে আবার হাসল সে। হাত তুলে কবরটা দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখো, পাথরগুলোকে সাজিয়ে ঠিকই বের করে ফেলেছে ডিন মার্টিনের নাম। তার মানে এটাই ওর কবর।'

কবরটার কাছে এগিয়ে এল চার ডাকাত।

সেবিল বলে উঠল, 'ডেগা গালুশের চিঠি অনুযায়ী ডিন মার্টিনের কবরের নিচেই লুকানো আছে গুপ্তধন!'

ফিরে তাকিয়ে ভোঁতা-নাক আর অন্য লোকটাকে হুকুম দিল ডিয়াবোলো, 'জলদি গিয়ে শাবল নিয়ে এসো!'

'আছে?'

'আছে। ক্যাম্পারের পেছনে যেখানে টুলস রেখেছি সেখানে খুঁজলেই পেয়ে যাবে।'

পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ক্যাম্পার বলে কোন্ গাড়িটাকে বোঝাতে চেয়েছে ডিয়াবোলো, বুঝতে পেরেছে ওরা, সেই বড় ধূসর ভ্যান গাড়িটা, লুকআউটে উঠে সেদিন যেটা থেকে সঙ্কেত দিতে দেখেছিল।

গাড়িটা কাছেই কোথাও রাখা আছে, কারণ, তাড়াতাড়িই ফিরে এল ভোঁতা-নাক আর লাল-চুল। কবর খুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু পাঁচ-ছয় ফুট খুঁড়ে ফেলার পরেও কিছুই পাওয়া গেল না। শূন্য কবর।

কিশোরের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রেগে গেল হঠাৎ

ডিয়াবোলো, চিৎকার করে বলল, 'নিজেদের খুব চালাক ভাব, না! আমার সঙ্গে মস্করা! কই, গুপ্তধন কোথায়? পাথরগুলোকে তোমরাই ইচ্ছে করে ওরকম করে সাজিয়েছ...'

জবাব দিল না তিন গোয়েন্দা।

'জলদি বলো, গুপ্তধনগুলো কোথায়?'

'জানি না,' বলে সত্যি কথাটাই বলল রবিন আর মুসা।

কিশোর জবাবই দিল না। চুপ করে রইল। এতে আরও রেগে গেল ডিয়াবোলো। ধমকে উঠল, 'দাঁড়াও, কি করে মুখ খোলাতে হয়, জানা আছে আমার!'

গোয়েন্দাদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ডাকাতদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো। নদী তীরের একটা বালুচরে গাছপালার ধার ঘেঁষে তাঁবু ফেলা হয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন। কয়েকটা গাছপালার ওধারে ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর ক্যাম্পার গাড়িটা। তার কাছে কাঠিতে মাংস গেঁথে আগুনে ঝলসাচ্ছে দু-জন লোক। একজনের চুল সাদাটে-লাল, রোদে পোড়া চামড়া। লোকটাকে চিনতে পারল গোয়েন্দারা, পাইরেট'স ট্যাভার্নে দেখেছিল, নিকারড হামদামকি।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। ডিয়াবোলোকে বলল, 'শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল তাহলে। কাল রাতে বহুত শয়তানি করেছে। ভালমত একটা শিক্ষা দিয়ে দাও। এই বিচ্ছুগুলোর জন্যেই আটকে গেলাম, নইলে এতক্ষণে আমার বহুদূরে চলে যাওয়ার কথা।'

'ভেব না, শিক্ষা খানিকটা দিতেই হবে। আমার পেছনে লেগেছে, সহজে কি আর ছাড়ি,' ডিয়াবোলো বলল।

গতরাতে পালিয়ে যাওয়ার পর আবার নিশ্চয় কোনভাবে ডিয়াবোলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল নিকাদামকি—আন্দাজ করল কিশোর। আরও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, পাচার হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে সে এখন। মানুষ পাচার ডিয়াবোলোর অনেক অপরাধের একটা, তারও জলজ্যান্ত প্রমাণ এই নিকাদামকি।

নানা রকম টুলস ছড়িয়ে পড়ে আছে তাঁবুর কাছে, ভারী একটা অটোমোটিভ জ্যাকও দেখা গেল তার মধ্যে। কয়েকটা বাতিল মলাটের বাক্স দেখা গেল, ভেতরে বেশ কিছু শূন্য দুধের টিনের মত টিন, খালি বোতল আর অন্যান্য জঞ্জাল। দুটো বড় টায়ারও আছে, মনে হয় ক্যাম্পার থেকে খুলে আনা হয়েছে।

রান্না হয়ে গেল। খেতে বসল ডাকাতেরা। গোগ্রাসে গিলতে লাগল। এই সময় গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন লোক। ডিয়াবোলোকে বলল, 'বস্, জাহাজ নোঙর ফেলেছে। রাত আরেকটু বাড়লেই মাল পাঠিয়ে দেবে।'

বোঝা গেল লোকটা ডিয়াবোলোর রেডিওম্যান।

'গুড,' ডিয়াবোলো বলল। 'ক্যাপ্টেনকে বলো, মাল যাবে আমাদের এখান থেকেও। তার মধ্যে বাজে মালও আছে, ওগুলোকে এখানে রাখতে

চাই না, সরিয়ে ফেলাই নিরাপদ।' কথাটা বলেই কড়া দৃষ্টিতে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল একবার সে। 'নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখুক।'

'ইয়েস, বস্,' বলে চলে গেল লোকটা।

আনমনেই বলল ডিয়াবোলো, 'তারপর ভিকটর সাইমনকে দেখে নেব আমি। বিচ্ছুগুলোকে ফেরত চাইলে আমার শর্তে রাজি হতেই হবে তাকে!'

বাতাসে কাবাবের সুগন্ধ ভুরভুর করছে। করুণ নয়নে ডাকাতদের খাওয়া দেখছে মুসা। জঞ্জালের বাক্সগুলোর কাছে বসানো হয়েছে তিন গোয়েন্দাকে। রবিন কাত হয়ে আছে বড় বড় টায়ার দুটোর ওপর। ধাক্কা দিয়ে তাকে ওখানে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। বসানোর সময়ই লক্ষ করেছিল, কি কারণে নষ্ট হয়েছে নিচের টায়ারটা। বড় বড় দু-তিনটে কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে। ওই কাঁচই ফাঁসিয়ে দিয়েছে চাকাগুলোকে।

খাওয়ার দিকে মনোযোগ ডাকাতদের, এই সুযোগে আস্তে করে হাত দুটো পেছনে ঠেলে দিল সে। একটা কাঁচের চোখা ধারাল মাথায় ধীরে ধীরে ঘষতে লাগল বাঁধনের দড়ি।

তাড়াহুড়ো করতে পারছে না, ডাকাতদের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় সামান্য কাঁচের টুকরো দিয়ে দড়ি কাটার চেষ্টা করাটাও বড়ই কঠিন। তবু হাল ছাড়ল না সে। চেষ্টা চালিয়েই গেল।

সবার আগে খাওয়া শেষ করল সেবিল। ডিয়াবোলোর আদেশে গাড়ি থেকে একজোড়া নাইট গ্লাস বের করে নিয়ে রওনা হলো সাগর পাড়ে, জাহাজ থেকে কখন নৌকা আসে দেখার জন্যে।

একসুতা একসুতা করে কাটতে শুরু করেছে রবিনের হাতের দড়ি। কেন এটা করছে, জানা নেই। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, বুঝতে পারছে। কোন পরিকল্পনাও নেই তার। একমাত্র চিন্তা বাঁধনমুক্ত হওয়া, তারপর কোনভাবে কিশোর আর মুসার বাঁধন খুলে দেয়া। তারপর দেখা যাবে কি করা সম্ভব!

অন্ধকার গাছপালার আড়াল থেকে প্রায় ছুটে বেরোল সেবিল। বলল, 'বস্, নৌকা এসে গেছে!'

তখনও খাবার চিবাচ্ছে ডিয়াবোলো। অতটা গুরুত্ব দিল না, যেন স্বাভাবিক, নিত্যদিনকার ঘটনা এই নৌকা আসাটা। নীরবে শুধু হাত তুলে সেবিলের কথার সাড়া দিল সে।

এই সময় কাটা হয়ে গেল দড়ি, বাঁধনমুক্ত হলো রবিন। আড়চোখে তাকাল মুসার দিকে। ইঙ্গিত করল। তাকে অবাক করে দিয়ে হাসল মুসা, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল তারও বাঁধন খুলে ফেলেছে। একটা টিন দিয়ে কেটেছে দড়িটা, সেটা অবশ্য বোঝাতে পারল না। তার খুব কাছাকাছি রয়েছে কিশোর, তার বাঁধনটা খুলে দিতে পারবে সে।

সশব্দে ঢেকুর তুলল ডিয়াবোলো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। সহকারীদের নির্দেশ দিল, 'এই, তাড়াতাড়ি সারো। বিচ্ছুগুলোকে নিয়ে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল ভোঁতা-নাক আর লাল-চুল। পা বাড়াল গোয়েন্দাদের দিকে।

'রেডি!' ফিসফিসিয়ে নির্দেশ দিল কিশোর। একটা খালি বোতলের গলায় চেপে বসল তার আঙুল।

রবিন পেল একটা র‍্যাঞ্চ। মুসা পেল আরেকটা বোতল।

'এই, ওঠো!' ধমকের সুরে বলল লাল-চুল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। একযোগে আক্রমণ করল দুই ডাকাতকে।

বিশ

র‍্যাঞ্চ আর বোতলের বাড়ি খেয়ে চোখের পলকে ধরাশায়ী হলো ভোঁতা-নাক আর লাল-চুল।

গর্জে উঠল ডিয়াবোলো, 'অ্যাই ধরো, ধরো ওদের!'

সেবিল আর আরও দু-জন ছুটে গেল গোয়েন্দাদের দিকে। ডাকাতদের সাহায্য করার একান্ত ইচ্ছে নিকাদামকির, কিন্তু দ্বিধা করতে লাগল সে। ভয়াবহ অস্ত্র রয়েছে ছেলেদের হাতে, র‍্যাঞ্চ আর বোতলের বাড়ি, দুটোই মারাত্মক। ঠিকমত লাগলে অক্কা পেতেও দেরি হবে না।

শোনা যাচ্ছে মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। তীরে পৌঁছেছে বোট।

হাতে র‍্যাঞ্চের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে 'বাবাগো!' বলে বসে পড়ল সেবিল। মাথার একপাশে হাত দিয়ে টলে উঠল বাবুর্চি, কাবাব রান্না করেছিল যে।

গাছের আড়াল থেকে দু-জন নাবিককে বেরিয়ে আসতে দেখে তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল ডিয়াবোলো, 'ধরো! ছেলেগুলোকে ধরো!'

পিটিয়ে চারজন ডাকাতকে চিত করে দিয়েছে গোয়েন্দারা, অন্য চারজন ঘিরে ফেলল ওদেরকে। প্রথম চারজনের মত অসাবধান হচ্ছে না। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। বোতল আর র‍্যাঞ্চ তুলে বাড়ি মারার জন্যে তৈরি তিন গোয়েন্দা। ছুরি বের করল দুই নাবিক। কঠিন হাসি হাসল ডিয়াবোলো। পিস্তল বের করল।

বুঝে গেল গোয়েন্দারা। লড়াই শেষ। পিস্তলের বিরুদ্ধে আর কিছু করার নেই ওদের।

ঠিক এই সময় নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চার ডাকাত সতর্ক হওয়ার আগেই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনটে ছায়ামূর্তি। আগুনের আলোয় তাদেরকে চিনতে পারল গোয়েন্দারা। একজনকে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো। তিনি এখানে এসে হাজির হবেন কল্পনাই করতে পারেনি। গোয়েন্দা ভিক্টর সাইমন। অন্য দু-জন বোরিস আর রোভার।

বিশাল এক গ্রিজলি ভালুকের মত ডিয়াবোলোর ঘাড়ে এসে পড়ল

বোরিস। তার হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিতে দুই সেকেন্ডও লাগল না। বাকি তিন ডাকাতের দু-জনের হাতে ছুরি থাকলেও ওদেরকে কাবু করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না গোয়েন্দাদের, কারণ সংখ্যায় ওরা এখন ছয়জন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্দিদের হাত-পা বাঁধার কাজও সারা হয়ে গেল।

উত্তেজনা শেষ হতেই প্রচণ্ড ক্লান্তি লাগল। ধপ করে মাটিতেই বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা। অন্য তিনজনও বসল।

পুরো দুটো মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। তারপর নীরবতা ভাঙল কিশোর, 'একেবারে সময়মত এসে হাজির হয়েছেন!'

রবিন জিজ্ঞেস করল সাইমনকে, 'আপনি এখানে এলেন কি করে, স্যার?'

'এল ডিয়াবোলো কোথায় আছে, খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম আমি,' সাইমন বললেন। 'তোমরা যেদিন পাইন ব্যারেনে এলে আমিও সেদিনই এসেছি। ছদ্মবেশে ঢুকেছি বনে। ডিয়াবোলোকে খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ওপরও নজর রেখেছিলাম আমি। আজ বিকেলে বনের ওপর প্লেন উড়তে দেখেই বুঝে গেলাম ওটা তোমাদের কাজ। তাঁবুতে গেলাম খোঁজ নিতে। বোরিস আর রোভার জানাল ফিশহুকের মানে বের করে ফেলেছ তোমরা, সেখানে গেছ। তোমাদের দেরি দেখে তখন অস্থির হয়ে আছে বোরিসরা। আমি এদিকেই আসব শুনে সঙ্গে আসতে চাইল। কিছুতেই রেখে আসতে পারলাম না। এখন তো দেখি নিয়ে এসে ভালই করেছি।'

ক্যাম্পারের রেডিওর সাহায্যে পুলিশকে খবর দিলেন সাইমন। বলে দিলেন বনের কোন জায়গাটায় আসতে হবে।

পুলিশ আসতে সময় লাগবে। ততক্ষণ বসে বসে বন্দিদের পাহারা দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

'কয়েকটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার হয়ে আসছে আমার কাছে।' মিস্টার সাইমনকে বলল কিশোর, 'ভোঁতা-নাক আর লাল-চুলোই আপনার পিছু নিয়েছিল। যেই বুঝতে পেরেছে আপনি ওদের জন্যে বিপজ্জনক, আপনাকে ডার্ট ছুঁড়ে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল লাল-চুলো।'

মাথা ঝাঁকালেন সাইমন, 'হ্যাঁ, ছদ্মবেশ নিয়েও ওদের চোখে ধুলো দিতে পারিনি।'

'মিস্টার লুইসের ম্যাপটা কি ওরাই চুরি করেছিল?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমার তা মনে হয় না,' সাইমন বললেন। 'গুপ্তধন খোঁজায় আগ্রহ ছিল না ওদের।'

'তাহলে নিশ্চয় ডফারের কাজ,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, সে হতে পারে। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল তো, ম্যাপটা তার দরকার ছিল।'

'ডেগা গালুশের ভূতও নিশ্চয় সে-ই সেজেছে?' আবার প্রশ্ন করল রবিন।

হাসলেন সাইমন। 'না, সেটা আমি। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম সেদিন, কিন্তু এসে দেখি তোমাদের ক্যাম্পের কাছে উঁকিঝুঁকি

মারছে একটা লোক। আমাকে দেখে দিল দৌড়।'

'নিশ্চয় ডফার,' বলল কিশোর। 'কিন্তু ভূত সেজে আপনি বনে ঘোরাঘুরি করছিলেন কেন?'

'বনে নতুন কাউকে দেখলেই সন্দেহ করে বসে এখানকার মানুষ, তার পেছনে লাগে। এতে তদন্ত করতে অসুবিধে হচ্ছিল আমার। তাই ভূত সাজলাম, যাতে চোখে পড়লে কিছু জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, ঝেড়ে দৌড় দেয়।'

হাহ্ হাহ্ করে হাসল মুসা। বলল, 'আমারও কলজে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু ডেগা গালুশের পোশাক জোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

'ডেগা গালুশের নয় ওগুলো। তবে তার মত করে পরেছি বলতে পারো। শহরের একটা পুরানো জিনিসের মার্কেট থেকে কিনেছি।'

অনেক রাতে পৌঁছল পুলিশ। থানা থেকে রওনা হওয়ার আগেই কোস্ট গার্ডকে সতর্ক করে দিয়েছিল। স্মাগলারদের জাহাজটা আটক করল কোস্ট গার্ড। নৌকাটা পাওয়া গেল নদীতে—সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নদীটার। নৌকায় নানা রকম চোরাই মাল, সব সিজ করে নিয়ে গেল পুলিশ।

জিম হাচিনসকে খুঁজে পাওয়া গেছে। শয়তানের মূর্তি রহস্যেরও মীমাংসা হয়ে গেছে। বাকি আছে আর একটা কাজ, গুপ্তধনগুলো বের করা। পরদিন সকালে সেই কাজটাই করতে চলল তিন গোয়েন্দা।

ডিন মার্টিনের কবরটার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা, আগের দিন যেটা খুঁড়েছিল ডাকাতেরা। শাবলগুলো আগের জায়গায়ই পড়ে আছে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কোনখান থেকে খোঁড়া শুরু করব?'

'দাঁড়াও, দেখি,' জবাব দিল কিশোর, 'আগে দশ কদম উত্তরে হেঁটে যাই। তারপর বোঝা যাবে।'

'কাল তো সেটা করা হয়েছিল।'

'কাল সেটা করেছিলাম বড়শির মাথা থেকে, আজ এগোব কবরের কাছ থেকে।'

এক দুই করে গুনে এগোতে শুরু করল কিশোর। উত্তেজিত হয়ে তার পেছনে এগোল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিন্তু হতাশ হলো। আর কোন কবর কিংবা গর্তের চিহ্ন দেখা গেল না। যেখানে এসে থামল, সেখানে পড়ে আছে একটা ওক গাছ। অনেক পুরানো। পোকায় খেয়ে আর সাপ-বিচ্ছুসহ নানা রকম কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধতে গিয়ে ফোঁপড়া করে ফেলেছে ভেতরটা।

'এবার?' ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

তার কথার জবাব দিল না কিশোর। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা ঝোপের দিকে। গাছের কাণ্ডটা ঢুকে গেছে ঝোপটাতে। কাঠের তৈরি একটা জিনিসের খানিকটা দেখা যাচ্ছে ডালপাতার ফাঁক দিয়ে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অন্য দু-জনও দেখে ফেলল ওটা।

কাছে গিয়ে ভাল করে জিনিসটা দেখতেই চিনে ফেলল ওরা, ওটা কি। একটা ক্রো'জ নেস্ট বা কাকের বাসা। তবে সত্যিকারের কাকের বাসা নয়

ওটা। আগের দিনের পালের জাহাজে মাস্তুলের ওপর ঝোলানো অনেকটা ঝুড়ির মত একটা জিনিস থাকত, তাতে চড়ে বসে দূরে লক্ষ্য রাখার জন্যে। একে বলা হত ক্রো'জ নেস্ট। খুব ভাল কাঠ দিয়ে বানানো হত ওগুলো, সহজে নষ্ট হত না।

রবিন বলল, 'তীরে এসে ভেঙে পড়া কোন পুরানো জাহাজ থেকে বোধহয় জোগাড় করেছিল এটা ডেগা। যে জাহাজটা লুট করেছিল সে, সেটারও হতে পারে অবশ্য। *কাক যেখানে ওড়ে* বলে ক্রো'জ নেস্টই বোঝাতে চেয়েছে সে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে কাকের বাসাটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। এগিয়ে গিয়ে কি ভেবে ওটা ঠেলা দিতেই নিচ থেকে বেরিয়ে পড়ল মানুষের হাড়।

'খাইছে!' বলে এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল মুসা।

কিন্তু কিশোর ওসবের ভয় করে না, ঠেলে আরেকটু সরাল ক্রো'জ নেস্ট। নিচে দেখা গেল একটা কঙ্কাল। বিড়বিড় করল সে, 'শিওর, এটা ডিন মার্টিনের কঙ্কাল! তারমানে এখানেই কোথাও আছে গুপ্তধন!...কিন্তু ফোঁপড়া গাছের সঙ্গে কাকের বাসার কি সম্পর্ক?' বুঝে ফেলল হঠাৎ, 'ঠিক! এই কাণ্ডের নিচেই কোথাও আছে জিনিসগুলো!'

তিনজনে মিলে ঠেলতে শুরু করল কাণ্ডটাকে। দুই পাশে ওটার ঘন হয়ে জন্মে আছে আগাছা। শেওলায় পিচ্ছিল হয়ে থাকা কাণ্ডটা সরাতেই নিচে দেখা গেল ধাতব একটা জিনিসের খানিকটা। আগাছা আর শেওলা পরিষ্কার করলে বেরিয়ে পড়ল একটা লোহার সিন্দুক। রূপার নানা রকম জিনিসে ওটা বোঝাই। ধাতু হিসেবে যতটা দামী, তার চেয়ে অনেক বেশি অ্যানটিক মূল্য ওগুলোর। অত ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য ওদের নেই।

গাছের ডালপাতা দিয়ে জায়গাটাকে ঢেকেঢুকে রেখে পুলিশকে খবর দিতে চলল ওরা।

টেলিফোন বাজল একসময়। ধরল কিশোর। ভিকটর সাইমন করেছেন। তাঁকে অনুরোধ করেছিল কিশোর, জিম হাচিনসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে শিওর হয়ে যেন ফোনে জানান। সেটা জানানোর জন্যেই ফোন করেছেন তিনি। জানালেন, সত্যিই জিমের ওপর থেকে খুনের অভিযোগ তুলে নিয়েছে পুলিশ, তার ভাই জন হাচিনস মিথ্যে কথা বলেননি। কোন রকম অসৎ উদ্দেশ্যও নেই তাঁর।

সাইমনকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে দুই বন্ধুকে খবরটা দিল কিশোর।

রবিন বলল, 'ভালই হলো। পুলিশকে গুপ্তধনের কথা জানিয়ে ফেরার পথে জিম হাচিনসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

থানার ডিউটি অফিসার গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা শুনে অনেক প্রশংসা করল গোয়েন্দাদের। জানাল, 'আজ সকালে ডফারকে ধরে হাজতে ভরা হয়েছে। তার মক্কেল যদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়, ভাল, না হলে জেলে যেতে হবে তাকে।'

কিশোর বলল। 'অপরাধের শাস্তি হওয়াই উচিত, নইলে বেপরোয়া হয়ে ওঠে অপরাধী।'

সার্জেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। জিম হাচিনসের কেবিনে চলল।

ওখানে গিয়ে দেখল, কেবিনের সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। পথ আটকাল লোকগুলো। কিশোর বলল, 'মিস্টার হাচিনসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমরা। তাঁর একটা খবর আছে।'

'তিনি এখানে নেই,' কর্কশ গলায় বলল একজন।

কিশোর বুঝল, ঘরের মধ্যে ঠিকই আছেন জিম হাচিনস, কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। ওদের ভয় পুলিশ আসছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাধা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ওরা।

'দেখুন,' বলল সে, 'আপনারা বুঝতে পারছেন না, তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলাটা জরুরী। তিনি এখন মুক্ত মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই পুলিশের।'

'যাও এখান থেকে!' ধমকে উঠল লোকটা। 'এক্ষুণি!' হুমকির ভঙ্গিতে গোয়েন্দাদের দিকে এগোল। চিৎকার করে বলল, 'হ্যারি, ডিক, ইয়ান, এসো তো! ধরো তো ব্যাটাদের!'

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা, বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন লোক। ছেলেদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ধীরপায়ে।

'যাও, ভাগো!' হুমকি দিল আরেকজন।

রেগে উঠতে যাচ্ছিল মুসা, বোকা বলে গাল দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'খবরদার, কিছু বোলো না এখন!' তারপর লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, 'দেখুন, আবার বলছি, এ সব করে মিস্টার হাচিনসের ক্ষতি করছেন আপনারা। যে ভয় তাঁর নেই, সেটা মনে পুষে রেখে এ ভাবে লুকিয়ে থাকার কি মানে আছে, বলুন? আপনারা আমাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না, বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি বলছি, তাঁকে আমরা সাহায্য করতে চাইছি। তিনি এখন মুক্ত মানুষ। পুলিশ কিছুই করবে না তাঁর। তাঁকে বলে দেবেন এ কথা। আমরা যাচ্ছি।'

দুই সহকারীকে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো কিশোর। এই সময় আবার খুলে গেল ঘরের দরজা। বেরিয়ে এলেন জিম হাচিনস। ডাকলেন, 'কিশোর, দাঁড়াও!'

'কি করছেন···' প্রতিবাদ করতে গেল তাঁর বন্ধুরা। কিন্তু হাত তুলে তাদেরকে শান্ত হতে বললেন হাচিনস, 'থামো তোমরা। আমার মনে হয় ছেলেগুলো সত্যিই বলছে। আমি কোথায় আছি জেনেছে ওরা। পুলিশকে খবর দিলে এতক্ষণে চলে আসত। আসেনি, তার মানে দেয়নি। আর দেয়নি যখন, নিশ্চয় অভিযোগও নেই।'

'কিন্তু…কিন্তু…' কান চুলকাল লোকটা।
'আর কোন কিন্তু নেই। বুঝতে পারছি, আমি এখন মুক্ত মানুষ।'
'হ্যাঁ, আপনি মুক্ত মানুষ,' রবিনও বলল, মুসাও বলল। 'গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনকে আপনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছিলাম আমরা। একটু আগে তিনি জানিয়েছেন, আপনার ভাই মিথ্যে কথা বলেননি। কোন অসৎ উদ্দেশ্যও নেই তাঁর।'
একে একে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালেন হাচিনস। 'আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন…এত্তো বছর পর, উফ! কি যে খুশি লাগছে…'
'মুক্ত আপনি অনেক আগেই হয়েছেন,' কিশোর বলল। 'আপনাকে সেটা জানানোর কেউ ছিল না বলেই জানতে পারেননি।'
'শুধু মুক্তই হননি,' হেসে বলল মুসা। 'অনেক টাকারও মালিক হয়েছেন। আচ্ছা, হঠাৎ যে এতগুলো টাকা পেয়ে গেলেন, কেমন লাগছে আপনার? কি করবেন অত টাকা দিয়ে? পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবেন?'
'কেমন লাগছে? খুব ভাল। না, কোথাও যাব না আমি, এখানে, এই বনের মধ্যেই থাকব। একটা চিকিৎসা কেন্দ্র খুলব, ক্লিনিক, এখানকার মানুষের জন্যে। ভাল হবে না সেটা?'
'খুব ভাল! খুবই ভাল!' কিশোর বলল। রবিন আর মুসাও সমর্থন করল একবাক্যে।
হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল উপস্থিত জনতা। বুঝতে পারছে, জিম হাচিনসের শত্রু নয় তিন গোয়েন্দা। ওদের সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাতে লাগল ওরা।
সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল গোয়েন্দারা। তাঁবুতে ফিরে চলল। ওখানে অপেক্ষা করছে বোরিস আর রোভার। ওদেরকে সমস্ত খবর জানাতে হবে।
গাড়ি চালাচ্ছে রবিন। পেছনের সীটে পাশাপাশি বসেছে অন্য দু-জন। হঠাৎ মুসা বলল, 'আচ্ছা, গুপ্তধন যে উদ্ধার করলাম, আমরাও তো এর একটা ভাগ পাব, তাই না?'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সরকার নেবে বেশির ভাগটা, বাকিটা আমাদের। এটাই নিয়ম।'
'তাহলেও তো অনেক, অনেক টাকা। এত টাকা দিয়ে কি করব আমরা? প্রয়োজন তো নেই। এই, এক কাজ করি না কেন, এই টাকাটাও আমরা জিম হাচিনসের ক্লিনিককে দান করে দিই। পাইন ব্যারেনের সম্পত্তি পাইন ব্যারেনের উন্নতির কাজেই লাগুক। কি বলো?'
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'মুসা, মাঝে মাঝে না তোমাকে মহাপুরুষ মনে হয় আমার!…আমি রাজি।'
'আমিও,' নির্দ্বিধায় তার রায়টাও জানিয়ে দিল রবিন।

****

ভয়ঙ্কর অসহায়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

হাড়ের মত সাদা চাঁদের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে কালো মেঘ। জ্যোৎস্নায় বড় বড় গাছের ছায়া। একটা পেঁচা ডাকল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গা ছমছম করা রাত। কিন্তু ছোট্ট ছেলেদুটোর কোন ভয় নেই। একজনের বয়স পাঁচ, আরেকজনের সাত। বাড়ির পেছনের একটা বড় ডোবায় সাঁতার কাটছে ওরা।

গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়ল আরেকটা প্রাণী। লক্ষই করল না ছেলে দুটো।

প্রাণীটার মুখ আর শরীর মানুষের মত। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত বড় বড় আঁশে ঢাকা, যেন হরর ছবির কোন জলচর দানব। ছেলে দুটোর দিকে এগিয়ে চলল।

এখনও জানে না ওরা। দাপাদাপি করে চলেছে।

সাবমেরিনের মত চুপচাপ এগিয়ে এসে ভুশ করে পানির ওপর মাথা তুলল দানব। বিকট গর্জন করে উঠল।

পালানোর পথ নেই ছেলে দুটোর।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল।

প্রথমে চিনে ফেলল ছোট ছেলেটা। হেসে উঠল। 'বাবা, তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম...'

চিৎকার থামিয়ে দিল দ্বিতীয় ছেলেটাও। 'বাবা যে আমি জানতাম!'

'না, তুই জানতি না! মিথ্যে কথা বলছিস!'

'জানতাম!'

'জানলে ভয় পেয়েছিলে কেন?' ছোট ছেলের পক্ষ নিলেন হ্যারি নাইট।

'কোথায় ভয় পেলাম?'

খেলাচ্ছলে বড় ছেলে অনির হাত চেপে ধরলেন বাবা। পানিতে ধস্তাধস্তি শুরু করলেন। ছেলেও যুঝতে লাগল।

মজা পেয়ে চেঁচানো শুরু করল ছোট ছেলে তনি। সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের ওপর। বেয়ে উঠে গেল বাবার আঁশে ঢাকা কাঁধে।

'দুজনের বিরুদ্ধে একজন!' ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করলেন নাইট, 'অন্যায় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

মজা পেয়ে আরও জোরে বাবাকে চেপে ধরল দুই ছেলে।

কয়েক মিনিট খেলাটা চালিয়ে গেলেন নাইট। সাংঘাতিক লড়াই করে জেতার চেষ্টা করলেন। শেষে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'আমি শেষ! ছাড়ো এখন!'

প্রথমে সরে গেল অনি। 'বাবা তুমি বাড়ি আসায় খুব খুশি লাগছে।'

'আমারও,' বলল টনি।

'এবারও কি রাস্তায় মজার ঘটনা ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল বড় ছেলেটা।

'অনেক, অনেক,' দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে বললেন নাইট। 'এত ঘটনা, সারা শীতকাল ধরে বলেও শেষ করতে পারব না।...অনেক হয়েছে ডোবাডুবি। এখন ওঠো পানি থেকে। আর দেরি করলে তোমাদের মা রেগে যাবে। যাও।'

আস্তে পিঠ চাপড়ে দিয়ে ঠেলেঠুলে ছেলেদের পানি থেকে তুলে দিলেন তিনি। ওরা বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে, তাকিয়ে রইলেন। তারপর সামনে দুহাত লম্বা করে দিয়ে ঝাঁপ দিলেন পানিতে। চাঁদের আলোয় চকচক করছে পিঠের আঁশ। বাড়ি এলেও অলস হয়ে থাকা যাবে না, প্র্যাকটিসটা ঠিক রাখতে হবে, নইলে ভারী হয়ে যাবে শরীর।

দেখতেই শুধু বিকট, কিন্তু সিনেমার পানির দানবগুলোর মত মোটেও হিংস্র নন তিনি, সাঁতারও কাটতে পারেন না অত দ্রুত। প্রচুর শব্দ তুলে সাঁতার কেটে ডোবার মাঝখানে এসে মুখ নিচের দিকে করে ভেসে রইলেন চুপচাপ। এমন করে থাকতে ভাল লাগছে। বাড়ি এলে সবই ভাল লাগে। রাস্তায় ছোটার একটা উন্মাদনা আছে, কিন্তু বাড়ির মত শান্তি নেই।

ড্রাইভওয়েতে দাঁড় করিয়ে রেখে আসা ভ্যানটার কথা ভাবলেন তিনি। গায়ে উজ্জ্বল রঙে বড় বড় করে লিখিয়ে নিয়েছেন: দি অ্যালিগেটর ম্যান, অর্থাৎ কুমির-মানব। পাশে তাঁর নিজের একটা বড় ছবি আঁকা, চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে আছেন তিনি। অ্যালিগেটর-ম্যানের নিচে লেখা: এটা কি? মানুষ? জানোয়ার? নাকি দানব?

মুখ তুলে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন নাইট। গাড়িটাকে বিশ্রাম দিতে পেরে ভাল লাগছে। নিজেকেও দিতে পারছেন। বাড়ি থাকার এই এক আনন্দ।

আবার ডাকল কুকুরটা। পানিতে কান ডোবানো থাকায় অস্পষ্ট শোনাল শব্দ। ওই ভাবে ভেসে থেকেই ভাবলেন তিনি, পড়শীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাতে যাতে এ ভাবে কুকুর ছেড়ে না রাখে। এত ডাকাডাকি ভাল লাগে না।

আরেকটা শব্দ কানে এল তাঁর। ডোবার অন্য প্রান্তে ঝপাৎ করে কি যেন পড়ল।

ছেলেগুলো ফিরে এল নাকি আবার? নাহ্, এবার আর প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। কড়া কথা বলেই বিদেয় করতে হবে।

মাথা তুলে ফিরে তাকালেন তিনি। কাউকে চোখে পড়ল না। কিছুই

দেখলেন না।

কেবল চোখে পড়ল পানিতে আলতো ঢেউ।

নিশ্চয় দুই ভাই যুক্তি করে পানিতে ডুবে ডুবে এসে তাঁকে চমকে দেয়ার মতলব করেছে। তিনি যেমন ওদের দিয়েছিলেন।

টলটলে পানিতে চাঁদের আলোয় একটা ছায়ামত দেখতে পেলেন। মানুষ ডুবসাঁতার দিয়ে এলে যেমন দেখায়। কিন্তু একটা ছায়া কেন? তারমানে অনি একা? টনি বোধহয় আসতে সাহস পায়নি।

নাকি?

এখন তো আর ঠিক মানুষের মত লাগছে না...

আরও কাছে আসার পর মনে হলো টর্পেডোর মত কিছু। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পানি কেটে তাঁর দিকে ছুটে আসছে।

'আশ্চর্য!' আনমনে বিড়বিড় করে বললেন। 'কি ওটা?'

সরে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে লাগল তাঁর অবচেতন মন। তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু পেরে উঠলেন না। কামানের গোলার মত এসে তাঁর পেটে আঘাত হানল ওটা।

ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল শরীর। তলিয়ে যেতে লাগলেন।

হাঁসফাঁস করে, মুখ দিয়ে পানি ছিটিয়ে, পানিতে থাবা দিয়ে ভেসে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন।

আবার আঘাত করল টর্পেডো।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি। পানিতে মুখ ডুবে থাকায় ঠিকমত স্বর বেরোল না। গলা দিয়ে পানি ঢুকে গেল। ভয়ানক যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে, দুই টুকরো করে ফেলা হচ্ছে তাঁর শরীরটা।

অনেক কষ্টে তীরের কাছে পৌঁছালেন। দুই হাতে মাটি খামচে ধরে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেন। পরক্ষণে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। পিঠে আবার গুঁতো মেরেছে টর্পেডোটা। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে। ব্যথা কমানোর জন্যে চিত হয়ে শুয়ে মাটিতে চেপে ধরলেন পিঠ। এবং একটা মারাত্মক ভুল করলেন।

পেটের চামড়ায় একসারি ক্ষুর চালানোর যন্ত্রণা। চাঁদের আলোয় যা দেখলেন, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কলকল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল পেট থেকে। শেষবারের মত চাঁদের দিকে মুখ তুললেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন।

চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে আসতে শুরু করল।

দুই

'কি ব্যাপার,' জানতে চাইল মুসা, 'অত খুশি খুশি লাগছে কেন?'

জঞ্জালের নিচে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ঢুকে বসেছে ওরা।

ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটা চওড়া হলো কিশোরের। টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকল।

এই হাসি আর এই ভঙ্গি রবিনের অতি পরিচিত। বড় বেশি উত্তেজিত এখন কিশোর পাশা।

জিজ্ঞেস করল রবিন, 'রহস্য পেয়েছ নাকি?'

হাসিটা মুছল না কিশোরের। নীরবে মাথা দোলাল। নানা রকম জিনিস উপচে পড়ছে ওর বিরাট টেবিল থেকে। জিনিসের ভিড়ের মধ্যে থেকে টেনে বের করল একটা খাম। একটা ছবি বের করে বাড়িয়ে দিল অন্য পাশে টুলে বসা দুই সহকারীর দিকে।

হাতে নিল রবিন। দেখতে দেখতে ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল।

মুসাও হতবাক। রবিনের হাতের ছবির দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'খাইছে! শেষ পর্যন্ত ভিনগ্রহবাসীর দে'খা পেয়েই গেলে!'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'এটা ভিনগ্রহবাসীর ছবি নয়। মানুষ।'

'মাই গড!' চোখমুখ কুঁচকে ফেলেছে রবিন। 'কি হয়েছিল ওর?...অদ্ভুত...মানুষের শরীরে আঁশ...'

'জন্ম থেকেই এ রকম।' টেবিলে সামান্য একটু জায়গা ফাঁকা করল কিশোর। খামের মুখটা নিচের দিকে ধরে ভেতরের ছবিগুলো ঢেলে দিল।

ওগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। ছোঁ মেরে তুলে নিতে লাগল একটার পর একটা। মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সারা শরীর আঁশে ঢাকা লোকটার।

'জন্ম থেকেই এক আজব রোগে ভুগেছে এই হতভাগ্য মানুষটি,' কিশোর বলল। 'রোগটার নাম ইকথিয়োসিস। চামড়ার বাইরের অংশ শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়ে খসে পড়তে থাকে, অনেকটা গাছের বাকলের মত। ধীরে ধীরে অদ্ভুত রূপ নেয় চামড়ার চেহারা। দেখলে মনে হয় মাছের আঁশ।'

'দুনিয়ায় কত রকমের রোগই না আছে!' মুসা বলল। 'আর হয়ও মানুষের বেশি!'

'রোগটা কি খারাপ?' জানতে চাইল রবিন।

'দেখতে যতটা, ততটা নয়। ব্যথা হয় না। রোগীর যন্ত্রণাটা হয় মানসিক, সুস্থ মানুষদের কারণে। ঘৃণার চোখে তাকায় কেউ, এড়িয়ে চলে অনেকে, কেউ বা করুণা করে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বিকলাঙ্গ কিংবা অস্বাভাবিক শরীরের মানুষ দেখলেই লোকে এমন করে। খুব নিষ্ঠুরতা মনে হয় আমার।'

'আমারও,' কিশোর বলল। 'কুৎসিত নামে ডাকে ওদেরকে। এ রকম একটা অতি পরিচিত শব্দ হলো—ফ্রিকস।'

'ফ্রিকসের মানে কিন্তু খারাপ নয়। প্রকৃতির উদ্ভট খেয়াল।'

'তাতে কি? যাকে ডাকে, তার ভাল লাগে না। কোন স্বাভাবিক

মানুষকে তো কেউ কখনও ফ্রিকস বলে না। বিকলাঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বলে বলেই ভাল শব্দটাও কুৎসিত মনে হয় ওদের কাছে। কেউই চায় না তার খুঁতকে কোন নাম দেয়া হোক, বা স্বাভাবিক মানুষেরা তাকে করুণা করুক। ভাল শব্দের মধ্যেও তখন বিকৃতি আবিষ্কার করে সে।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'তা ঠিক। এ সব নাম দেয়ার চেয়ে বরং লাঠি দিয়ে বাড়ি মারা অনেক ভাল। কথা যে ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়, পিটিয়ে অতটা দেয়া যায় না।'

'বাড়ি মারাও ভাল নয়,' কিশোর বলল। 'স্বাভাবিক মানুষকে তো কেউ অহেতুক লাঠি দিয়ে পেটাতে যায় না। বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোটা কারও অপরাধ নয়।'

'পেটাতেই হবে, এ কথা বলিনি আমি। মানসিক যন্ত্রণা কতটা খারাপ বোঝানোর জন্যে উদাহরণ দিলাম...'

'যাকগে, যা বলছিলাম। এই বিশেষ মানুষটি নিজের শরীরের খুঁতের জন্যে হীনম্মন্যতায় না ভুগে বরং সেটাকে ব্যবহার করতে শিখেছিলেন। নিজের নাম নিজেই রেখেছিলেন অ্যালিগেটর ম্যান। আসল নাম ছিল হ্যারি নাইট। সার্কাস, কারনিভাল, সাইডশোতে কুৎসিত শরীর নিয়ে খেলা দেখিয়ে ভাল আয় করতেন। লোকে তাঁর খেলা দেখে মজা পেত। চামড়া ওরকম না হলে এই খেলা তিনি দেখাতে পারতেন না।'

'মজা পেত মানে? এখন আর পায় না নাকি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'হ্যারি নাইট বেঁচে থাকলে অবশ্যই পেত।'

'ও, মারা গেছেন! কি হয়েছিল?'

'সেটাই তো জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে ফেটে যাচ্ছি আমি।' আরেকটা ছবি বের করে দিল কিশোর। 'দেখো এটা। কিছু অনুমান করতে পারো?'

একটা ডোবার পাড়ে পড়ে রয়েছে হ্যারি নাইটের মৃতদেহ। পেটে মস্ত এক গর্ত। ডিমের মত গোল। চার ইঞ্চি চওড়া।

মুখ তুলে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'অদ্ভুত জখম!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ।'

'কি দিয়ে করেছে?'

'বোঝা যাচ্ছে না। অস্ত্রটা পাওয়া যায়নি।'

'আর কোন জখম?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'কাটাকুটি নেই, তবে একটা অদ্ভুত চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। পেটের ওপরের অংশে চামড়ায় কালচে দাগ। ফোলা। শক্ত কোন জিনিস দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে।'

'তারমানে প্রথমে পিটিয়ে বেহুঁশ করেছে। তারপর ধীরেসুস্থে ছিদ্র করেছে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'ইনটারেস্টিং! পুলিশ কি বলে?'

'কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।'

'আমরা পারব?' মুসার প্রশ্ন।

'সেকথাই ভাবছি।' ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করল কিশোর। সেটা থেকে বেরোল পেটমোটা আরেকটা খাম। তাতে আরও অনেক ছবি। বাড়িয়ে দিল দুই সহকারীর দিকে। 'এগুলো দেখো।'

ওপরের ছবিটার দিকে তাকাল রবিন। মাঝবয়েসী এক মহিলা। হ্যারি নাইটের মতই তার পেটেও একটা গোল গর্ত। বিশালদেহী এক তরুণকে দেখা গেল আরেকটা ছবিতে। পেটে একই ধরনের জখম।

'মোট এগারোটা খুন হয়েছে গত কয়েক মাসে,' কিশোর বলল। 'বোঝা যায়, একই খুনীর কাজ। প্রথমটা হয়েছে অরিগনে। পরের পাঁচটা অরিগনের আশপাশে বিভিন্ন শহরে। এবং শেষ পাঁচটা ফ্লোরিডায়। রহস্যময় এই খুনীর শিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা বয়স নেই। নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। সব বয়সের, সব ধরনের মানুষকেই খুন করতে অভ্যস্ত সে।'

'ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তো?' রবিনের প্রশ্ন, 'ফ্যানাটিসিজম?'

'মনে হয় না।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

মুসা কোন মন্তব্য করল না।

শেষ ছবিটা দেখার জন্যে হাত বাড়াল রবিন। 'তাহলে কি উন্মাদ?'

'না, তাও নয়। দেখা গেছে, উন্মাদ হলে ধীরে ধীরে নৃশংসতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় খুনী। এক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেনি। সবগুলো খুনের ধরন অবিকল এক। প্রথমে বাড়ি, তারপর পেটে গর্ত। ব্যস, শেষ।'

'হিংস্র কোন জন্তুটন্তু?'

'না। একটা জন্তু এ ভাবে বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। তার হামলা চলবে বিশেষ কোন একটা অঞ্চল জুড়ে, তা-ও বনাঞ্চল। তা ছাড়া এমন কোন খুনী জানোয়ারের কথা শোনা যায়নি, যে শুধু পেটে গর্ত করে মানুষ মারে। আরও একটা কথা, জন্তু-জানোয়ার মানুষ মারে দুটো কারণে—হয় খাবারের জন্যে, নয়তো আক্রান্ত হলে। এই খুনগুলোর ক্ষেত্রে ওরকম কিছুই ঘটেনি। স্রেফ মনের আনন্দে খুন করে ফেলে রেখে যাচ্ছে যেন কেউ। কোন মোটিভও বোঝা যাচ্ছে না।'

'ভূতুড়ে কাণ্ড মনে হচ্ছে আমার!' নিচু স্বরে মন্তব্য করল মুসা। যেন জোরে বললে এই ট্রেলারের মধ্যেও ঢুকে পড়বে আজব ভূতটা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল, 'সত্যি সত্যি ভিনগ্রহবাসীদের হাত নেই তো? একটা সিনেমায় দেখেছিলাম…'

'উঁহু!' মাথা নাড়ল কিশোর। পরে বের করা ছবিগুলো আবার খামে ঢোকাল। তারপর মুখ তুলে এক এক করে তাকাল মুসা আর রবিনের দিকে। 'ভূতের মত ভিনগ্রহবাসীদের ব্যাপারে আমার এতটা অবিশ্বাস না থাকলেও, এই খুনগুলোর বেলায় সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না। জোরাল

কোন মোটিভ আছে এ সব খুনের। সেই মোটিভটা জানা গেলেই রহস্য ভেদ করা পানির মত সহজ হয়ে যাবে।'

'মোটিভটা জানা যাবে কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'অবশ্যই তদন্ত করে।'

হ্যারি নাইটের ছবিটা আবার দেখতে দেখতে বলল রবিন, 'আমি ভাবছি কষ্টের কথাটা।' মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তোমার পেটে যদি এ রকম একটা গর্ত করে দেয়া হয়, কেমন লাগবে?'

'মোটেও ভাল লাগবে না। আর বেহুঁশ অবস্থায় করলে টেরই পাব না।'

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'তদন্ত কোনখান থেকে শুরু করতে চাও?'

'গিবসনটন, যেখানে খুন হয়েছেন হ্যারি নাইট,' জবাব দিল কিশোর। 'প্লেনে করে যাব ফোর্ট লডারডেল। সেখান থেকে ভাড়া গাড়িতে গিবসনটন গ্রাম। হ্যারি নাইটের সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দেব প্রথমে। তারপর তদন্ত শুরু।'

'যেতে তো অনেক খরচ! অত টাকা কোথায়?'

'টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে,' জবাব দিল কিশোর।

'ও, ব্যবস্থাও করে ফেলেছ! কে দিল? রাশেদচাচা?'

'না, গোয়েন্দা ভিকটর সাইমন। তিনিই ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বলেছেন আমাকে। ছবিগুলো দিয়েছেন। হ্যারি নাইট ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সময়ের অভাবে তিনি গিবসনটনে যেতে পারছেন না। রহস্য সমাধানের দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তোমাদের মত নিয়ে টেলিফোনে এখন আমি হ্যাঁ বলে দিলেই প্লেনের টিকেট কিনে আনতে পাঠাবেন কিম কিংবা ল্যারিকে।'

'আমি রাজি,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল রবিন।

'আমিও,' মুসা বলল। 'কিন্তু সত্যি বলছ ভূত নেই গিবসনটনে?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'ভূত নেই, কিন্তু এমন সব মানুষ আছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না!'

তিন

গোরস্থানে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। শোকার্তদের জন্যে সাজিয়ে রাখা সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ারের মাত্র দুটো চেয়ার খালি আছে। ওগুলোতেই ভাগাভাগি করে বসল তিনজনে।

শুরু হয়ে গেছে সৎকার অনুষ্ঠান।

নিচু স্ট্যান্ডে বাইবেল রেখে পড়তে আরম্ভ করলেন যাজক। ছোটখাট মানুষ, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা ভরাট, গম্ভীর। ইংরেজিতে পড়া তাঁর শ্লোকগুলোর মানে করলে দাঁড়ায়:

'প্রভু হলেন আমার মেষপালক। আমাকে তিনি সবুজ ঘাসের মাঠে

শুইয়ে দেবেন। তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন নিথর পানির কাছে। আমার আত্মাকে নতুন শরীরে স্থাপন করবেন তিনি। তিনি কথা দিয়েছেন আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন। যদিও আমি মৃত্যু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাব...'

হাই তুলতে শুরু করল মুসা। প্লেনে ঘুমাতে পারেনি নতুন জায়গা দেখার উত্তেজনায়। এখানে আসার পথে গাড়িতেও ছিল উত্তেজিত। এখন ফ্লোরিডার রোদে আরাম পেয়ে চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

পা দিয়ে পাতা ওল্টালেন যাজক। কালো একটা শালে ঢাকা কাঁধ। হাত নেই।

দেখার সঙ্গে ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার। মুহূর্তে পুরো সজাগ।

'শয়তানকে ভয় পাই না আমি,' পড়লেন যাজক, 'প্রভুই আমাকে রক্ষা করবেন তাঁর লাঠি দিয়ে...'

মুখ তুলে তাকালেন। চোখ বোলালেন শোকার্তদের ওপর। বললেন, 'হ্যারি নাইটের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছি আমরা আজ। সে ছিল একজন প্রিয় স্বামী, চমৎকার পিতা, আন্তরিক বন্ধু...'

যাজকের দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ চলে গেল রবিনের, যেখানে বসে আছে হ্যারি নাইটের পরিবার। কালো স্যুট পরেছে ছেলে দুটো। মাথা সোজা রেখে কান্না ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু ঠোঁট কাঁপছে। ওদের মায়ের পরনেও কালো পোশাক। মাথা ঢেকেছে কালো কাপড়ে। গালে লাল রঙের চাপদাড়ি।

আস্তে করে কিশোরের বুকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'আমি যা দেখছি, তুমি কি তা দেখছ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসা দেখেনি। জানতে চাইল কি দেখেছে রবিন। দেখে হাঁ হয়ে গেল। এক এক করে বাকি সব শোকার্তদের ওপর নজর বোলাতে লাগল সে।

দুই সীট সামনে একজন মহিলা বসেছে, ওজন চারশো পাউন্ডের কম হবে না। এক চেয়ারে হয়নি, দুটো চেয়ার দখল করতে হয়েছে তার বিশাল বপু ধারণের জন্যে। অথচ তার পাশে বসা পুরুষ মানুষটি একটা চেয়ারও ভরতে পারেনি, এতটাই রোগাটে আর পাতলা শরীর, জীবন্ত এক কঙ্কাল যেন।

মাঝবয়েসী আরেক লোককে দেখা গেল উসখুস করছে। শেষে আর থাকতে না পেরে একটা ধাতব ফ্লাস্ক থেকে চুমুক দিয়ে মদ খেল। কোটের পকেটে রেখে দিল আবার ফ্লাস্কটা। কোটের একপাশ সরে যেতেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল মুসার। লোকটার পেটে গজিয়ে উঠেছে বিশাল এক টিউমার। প্রথমে টিউমারই মনে হলো। শেষে দেখল, আস্তে আস্তে নড়ছে ওটা। আরি, মানুষ! হাতা-পা-মাথা কিচ্ছু নেই! কোন অদ্ভুত উপায়ে আটকে রয়েছে মাঝবয়েসী লোকটার পেটে!

'নাইটের জন্যে শোক করতে আজ এখানে একত্রিত হয়েছি আমরা.'

বলে চলেছেন যাজক, 'আমাদের প্রিয় বন্ধুকে শেষ শ্রদ্ধা আর শেষ বিদায় জানাতে। অনেক বড় শিল্পী ছিল সে। অনেক আনন্দ দিয়েছিল আমাদের...'

পেছনে গুঞ্জন শোনা গেল। ফিরে তাকাল মুসা। গোরস্থানে ঢোকার পর চোখে ঘুমের ঘোর ছিল, কিংবা এমনটি যে হতে পারে কল্পনাই করেনি, তাই চোখে পড়েনি কিছু। এখন যতই দেখছে, হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাস্তবে নেই। ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল সারি দিয়ে বসা ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। আরে না না, কোথায় ছোট, বয়েসে ওর চেয়ে অনেক বড় একেকজন! প্রাপ্তবয়স্ক বামন মানুষ!

চোখে চোখে তাকাল একজন খুদে মানুষ। খুদে একটা হাত তুলে, মৃদু হেসে স্বাগত জানাল। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মুসা।

রবিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মুখ ফেরাতে হলো আবার।

ইঙ্গিতে দেখাল রবিন। কয়েক সারি সামনে বসে আছে একটা দৈত্য।

মুসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর। চোখে নীরব প্রশ্ন—কি রকম বুঝছ?

'ফ্রী-ফ্রী-ফ্রী...' তোতলাতে গিয়ে পুরো শব্দটা আর উচ্চারণ করা হলো না মুসার, তার আগেই গোড়ালির সামান্য ওপরে কিশোরের লাথি খেয়ে 'আঁউ' করে উঠে কথা বন্ধ। ওর কানে কানে বলল কিশোর, 'খবরদার, ওই শব্দ মুখেও আনবে না এখানে! মন থেকেই তাড়াও!'

আবার যাজকের দিকে নজর ফেরাল ওরা। তিনি বলছেন, 'হ্যারি ছিল একজন জগৎ-বিখ্যাত আর্টিস্ট, কোন বন্ধ জায়গায় আটকে রাখা যেত না তাকে, কোন সিন্দুকই তাকে ঠেকাতে পারত না; কিন্তু এখন এমন এক সিন্দুকে তাকে ঢুকতে হবে, যত বড় ওস্তাদই হোক, ওটা থেকে বেরোনোর সাধ্য নেই তার...'

সাধ্য যে আছে সেটা বোঝানোর জন্যেই যেন ঠিক ওই মুহূর্তে তাঁর সামনে রাখা কফিনটা কাঁপতে শুরু করল। মাঝপথে কথা বন্ধ হয়ে গেল যাজকের। তাকিয়ে আছেন কফিনটার দিকে। গুঞ্জন, ফিসফাস, নানা রকম শব্দ শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে।

'সত্যি নড়ছে!' আরও অনেকের মত রবিনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

মুসা স্তব্ধ। এমন ভূতুড়ে কাণ্ড জীবনে দেখেনি। উঠে দৌড় দেয়ার কথা ভাবছে। বিড়বিড় করে বলল, 'কি দেখছি খোদাই জানে!'

কিশোর চুপ। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল পেছনের সারি থেকে।

শেরিফের পোশাক পরা বিশালদেহী, মোটাসোটা, রোমশ একজন মানুষ গটমট করে এগিয়ে গেলেন কফিনটার দিকে। চেপে ধরে ওটার কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করলেন। দুই ভুরুর মাঝখানে কপালে গভীর ভাঁজ পড়েছে। কাছে দাঁড়ানো চারজন কফিন বাহকের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ডাকলেন, 'অ্যাই, সরাও দেখি!'

ধরাধরি করে কফিনটাকে কয়েক ফুট দূরে সরিয়ে রাখল ওরা।

দেখা গেল সেখানকার মাটি ফুলে উঠেছে।

ফ্লোরিডায় ভূমিকম্প!' অবাক হলো রবিন। 'শুনিনি তো কখনও!'

'ভূমিকম্পটা মানুষের সৃষ্টি,' হাত তুলল কিশোর, 'ওই দেখো!'

মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষের মাথা। প্রথমে বেরোল ঝাঁকড়া, বুনো, সোনালি রঙের চুল। তারপর আরও বুনো একটা মুখ, এবং তারচেয়েও বুনো চোখ। কারও চোখে এতটা বন্য দৃষ্টি আর দেখেনি রবিন।

মাথার পর বেরিয়ে এল পুরো দেহটা। ওপরের অংশ খালি, কোন পোশাক নেই। পরনে একটা কালো চামড়ার প্যান্ট।

কফিনের নিচে কবর বানিয়ে তাতে ঢুকে ছিল এতক্ষণ মানুষটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল। একহাতে লোহার পাত কাটার বড় একটা ছেনি, আরেক হাতে হাতুড়ি। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'আগে আমার পরিচয় দিয়ে নিই। ডক্টর রোজালি আমার নাম, ভয়ানক ভয়ানক খেলা দেখানো আমার কাম।'

রাগত প্রতিবাদ শোনা গেল চারদিক থেকে।

কেয়ারই করল না ডক্টর রোজালি। বলল, 'যতই চেঁচান, কানে ঢুকছে না আমার। আমি এসেছি আমার বন্ধুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। হ্যারি নাইটের অনেক বড় ভক্ত আমি। এই বিশাল ছেনিটা নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধা জানাব তাকে।'

ছেনির ধারাল দিকটা নিজের বুকে চেপে ধরে ওটার মাথায় হাতুড়ি পিটাতে শুরু করল সে।

আরেকটু হলে চেয়ার থেকেই পড়ে যাচ্ছিল মুসা। থাবা দিয়ে ধরে ফেলল কিশোর। 'ট্যালেন্ট আছে লোকটার!'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে রবিন। রক্ত আশা করেছিল সে। কিন্তু সামান্যতম কাটল না লোকটার বুকের চামড়া।

হাহাকার করে উঠল ডক্টর রোজালি, 'হায়রে হায়, কি কপাল আমার! হৃৎপিণ্ডটাও খুঁজে পাচ্ছি না এখন, এমনই দুর্ভাগা আমি! ওটাকে ফুটো করতে না পারলে আমার শান্তি নেই!'

তার ছেনিধরা হাতটা চেপে ধরে গর্জে উঠলেন শেরিফ, 'ভাঁড়ামি অনেক হয়েছে, থামো! এটা তোমার সার্কাসের তাঁবু নয়! একজন মানুষকে কবর দেয়া হচ্ছে...'

'আহ্, হাত ছাড়ুন!' কি জানি একটু করল রোজালি, তার বাহু থেকে হাতটা খসে গেল শেরিফের। 'আমার কাজ আমাকে করতে দিন!'

ভুরু কুঁচকে গেল শেরিফের। অবাক হয়ে নিজের ডান হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন একটা মুহূর্ত। ইশারায় শববাহকদের ডাকলেন আবার। রোজালিকে সরাতে বললেন।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল শববাহকরা। চেপে ধরল ডক্টর রোজালিকে। এতজনের বিরুদ্ধে আর কৌশল খাটল না এসকেপ আর্টিস্টের। ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল তখন।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল শোকার্তরা। রেগে গেছে অনেকেই। চারদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল গোলমাল বন্ধ করার জন্যে। একটা মানুষের দেহও স্বাভাবিক নয়। কোন না কোন খুঁত আছেই।

কাণ্ড দেখে বোবা হয়ে গেছে যেন রবিন।

মুসা হতবাক।

কিশোরের মুখে মৃদু হাসি।

চার

অবশেষে মুখ খুলল রবিন, 'উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধে ডক্টর রোজালিকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল শেরিফের।'

হাসল কিশোর। ভুরু নাচাল, 'গিবসনটন কেমন লাগছে?'

মুখ বিকৃত করে মুসা বলল, 'আমার পালাতে ইচ্ছে করছে!'

'এত তাড়াতাড়ি? সবে তো এলাম। আরও কত কিছু দেখা বাকি।'

গোরস্থানে গোলমালের একঘণ্টা পর। হ্যারি নাইটকে কবর দেয়া শেষ। শেরিফের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা শহরের এই রেস্টুরেন্ট ব্ল্যাক নাইট কাফেতে। শেরিফ কথা দিয়েছেন, এখানে ওদের সঙ্গে দেখা করবেন।

ওরা এসে বসার পাঁচ মিনিট পর এলেন তিনি। ঢুকেই বললেন, 'পুরানো এই খাওয়ার জায়গাটা কেমন লাগছে তোমাদের?'

'মেন্যু এখনও দেখিনি,' জবাব দিল কিশোর, 'তবে পরিবেশটা তো ভালই।'

'আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছে না,' মুখের ওপর বলে দিল মুসা। 'ক্যান্ডি চাইলে এনে হাজির করবে হয়তো তুলোর দলা।'

জায়গাটা রেস্টুরেন্টের মত লাগছে না রবিনের কাছেও, বরং সার্কাসের রিঙের সঙ্গে মিল বেশি। দেয়ালে লাগানো অসংখ্য পোস্টার। জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের ছবিগুলো এত জীবন্ত, মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে লাফ দিয়ে নেমে আসবে। ছাত থেকে ঝুলছে দড়াবাজিকরের খেলা দেখানোর একটা দোলনা। 'গিবসনটনে মনে হচ্ছে সার্কাস খুব জনপ্রিয়?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন শেরিফ।

'সাইডশোতেও কাজ করত নাকি হ্যারি নাইট?' জানতে চাইল কিশোর।

'করত।'

'এসকেপ আর্টিস্ট ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ। হুডিনির পর এতবড় শিল্পী আর জন্মায়নি। খবরের কাগজের শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। টিভিতেও গুণের কদর কম হত না, যদি না বাধা হয়ে দাঁড়াত শরীরের চামড়া। দেখতে কুৎসিত বলে শো-বিজনেসের লোকেরা নিতে চাইত না তাকে। মহিলারা নাকি পছন্দ করবে না, ভয়

পাবে। সারা দেশের সার্কাস আর কার্নিভালগুলোতে তাই খেলা দেখিয়ে বেড়াত নাইট। এসকেপ আর্টিস্ট তো ছিলই, চৌবাচ্চায় নেমে আরও একটা খেলা দেখাত। সেটার জন্যেই নিজের নাম রেখেছিল অ্যালিগেটর ম্যান।'

'কিন্তু ডিশের যুগে আজকাল তো এ সব সার্কাস-টার্কাস আর তেমন চলে না।'

'না, চলে না। এই হাতে গোণা কয়েকটা কোম্পানি কোনমতে টিকে আছে এখনও।'

'এখানে সার্কাসের লোক আরও আছে, তাই না?'

'আছে। অনেক। বেশির ভাগই অবসর নিয়ে বসে আছে,' শেরিফ জানালেন।

'এখানকার মানুষের সার্কাস এত পছন্দ কেন?' জানতে চাইল মুসা।

হাত ওল্টালেন শেরিফ। 'কি জানি। ওদের ইচ্ছে। একেক জায়গার মানুষের একেক রকম কাজ পছন্দ। এই যেমন পিটসবুর্গের লোকেরা ইস্পাতের কারখানায় কাজ করে, তেমনি এখানকার লোকে করে সার্কাসে।'

'কিন্তু নিশ্চয় এর বিশেষ কোন কারণ আছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'তা আছে। এর কারণ খুঁজতে হলে প্রায় সাতাত্তর বছর পিছিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ১৯২০ সালে বারনুম আর বেইলির মত বড় বড় সার্কাস-পাগল মানুষেরা এসে গোড়াপত্তন করেছিল এই শহরের। শীতকালটা ওরা কাটাতে আসত এখানে। বরফের জন্যে দেশে দেশে ঘুরেও বেড়ানো যায় না, খেলাও দেখানো যায় না, তাই ওই সময়টা সার্কাসের লোকের জন্যে ছুটি। এখানে এসে একসঙ্গে থাকে, আড্ডা দেয়। সময় হলে আবার ফিরে যায় যার যার কাজে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'মনে হয় সূত্র একটা পাওয়া গেল—খুনী সার্কাসের লোক। পেশাগত কারণে ঘুরে বেড়াতে হয় সার্কাস কর্মীকে। খেলা দেখানোর জন্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয়। খুনগুলো বিভিন্ন শহরে হওয়ার এটাই একমাত্র জবাব। কোন কারণে বিকলাঙ্গ কিংবা খুঁতওয়ালা মানুষকে দেখতে পারে না, ঘৃণা করে। সরিয়ে দিতে চায় পৃথিবী থেকে।'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'শেষ পাঁচটা খুন হয়েছে ফ্লোরিডাতে। এবং সর্বশেষ খুনটা হয়েছে এই গিবসনটনে, যেখানে কাজের অভাবে বাধ্য হয়ে অবসর নিয়ে বেকার জীবন যাপন করছে অনেক আর্টিস্ট।'

শেরিফ বললেন, 'এখানকার কেউ খুনী হতে পারে না। সবাইকে খুব ভালমত চিনি আমি। এখানে যারা আস্তানা গেড়েছি আমরা, সবারই কোন না কোন দৈহিক খুঁত রয়েছে। যাদের কোন খুঁত নেই, তারা ভাসমান, আজ আছে, কাল চলে যাবে—ডক্টর রোজালির মত। ওদের মত স্বাভাবিক মানুষেরা এখানে এসে আমাদের ফ্রিকস বলার সাহস পায় না, তবু কিছু একটা না বলে থাকতে পারে না। বলে 'ভেরি স্পেশাল পিপল্'। মেনে

নিয়েছি। স্রষ্টাই যখন আমাদের আলাদা করে দিয়েছেন, মানুষ আর করবে না কেন? যাই হোক, আসলেই আমরা স্পেশাল। এত বিচিত্র চেহারার আর আজব শরীরের মানুষ একসঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাবে না। বাইরের স্বাভাবিক মানুষদের কাছে আমরা অস্বাভাবিক, কিন্তু এখানে নিজেদের মধ্যে বেশ স্বাভাবিক। একজন খুঁতওয়ালা মানুষ আরেকজন খুঁতওয়ালাকে অস্বাভাবিক ভাবে না।'

'ভাবাটা উচিতও নয়। খুঁতটা তার দেহে, মগজে নয়,' তর্কের খাতিরে বলল রবিন। 'মগজে খুঁত তারই বলা যায়, যার মস্তিষ্ক বিকৃত। সেটা স্বাভাবিক শরীরের মানুষেরও হয়ে থাকে। ওদের মধ্যে যদি খুনী জন্মাতে পারে, ভেরি স্পেশাল পিপল্‌দের মধ্যে পারবে না কেন? মগজ তো একই।'

বাঁ বগলে ক্রাচ চেপে ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল ওয়েইট্রেস। একটা পা নেই। সোনালি চুল। সুন্দর চেহারা। শেরিফের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কেমন আছেন, শেরিফ?'

'আছি, ভালই। তুমি কেমন, শেলি?'

'ভাল।'

অর্ডার নেয়ার জন্যে তিন গোয়েন্দার দিকে ঘুরল সে।

মেন্যু দেখে খাবারের অর্ডার দিতে লাগল মুসা।

কিশোরের চোখ অন্যদিকে। সোনালি চুল, চওড়া কাঁধ, আর নিখুঁত করে ছাঁটা গোঁফওয়ালা সুন্দর চেহারার একজন মানুষের ছবি দেখছে সে। শরীরের তুলনায় পা দুটো অস্বাভাবিক খাটো লোকটার। শেলির মতই সুন্দর করে বানাতে বানাতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যেন এই লোকটাকেও খুঁতো করে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা।

চোখ ছবির দিকে, কানে আসছে ওয়েইট্রেসের কথা, 'আর কিছু লাগবে?'

'কফি, প্লীজ!' মুসা বলল। 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'এত কিছু দেখার পরেও?' রবিন বলল।

জবাব দিল না মুসা।

কিশোরকে জিজ্ঞেস করল ওয়েইট্রেস, 'তোমাকেও কি বারনুম বারগারই দেব?'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'উঁ!' মেন্যুর দিকে চোখ পড়তে কুঁচকে গেল ভুরু। হাত বাড়াল, 'দেখি মেন্যুটা? কি এটা?'

'গরুর মাংসের বড়া। ধাপ্পাবাজি নেই, একেবারে আসল...'

'বারনুম বারগারের কথা বলছি না,' মেন্যুর ছবিতে টোকা দিল কিশোর। 'এটা? এই যে, এই ড্রইংটা।'

রবিনও আবার তাকাল মেন্যুটার দিকে। সার্কাসের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের ছবি আঁকা রয়েছে খাবারের তালিকার পাশে সাদা জায়গায়। বারনুম বারগারের নামের পাশে অদ্ভুত একটা জীব। দেহের ওপরের অংশটা বানরের, বিকৃত—অস্বাভাবিক চ্যাপ্টা খুলি, সামনের দুটো

দাঁত ঠেলে বেরোনো, বাঁকা বড় বড় নখ; কিন্তু নিচের অংশে যেখানে লম্বা একটা লেজ আর পা থাকার কথা, সেখানে মাছের লেজ।

'সরি,' মাথা নাড়ল শেলি, 'ওই জিনিস দিতে পারব না। এটা কোন মৎস্য জাতীয় খাবার নয়। স্রেফ ছবি।'

'আমি ওটা চাইও না। দুঃস্বপ্নেও এর মাংস খাওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। জানতে চাইছিলাম, এটা কোন জীব...' মুখ তুলে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'মেন্যুটা থাক। আমার জন্যে কফি।'

খাবার আনতে চলে গেল মেয়েটা।

শেরিফের দিকে ফিরল কিশোর। 'আর্টিস্টের নাম লেখা আছে বার্বি নুন। এখানকার লোক?'

'হ্যাঁ। আমার অফিসের পাশেই তার স্যালুন।'

'দেখা করা যাবে?'

ছবিতে আগ্রহ নেই মুসার। সে খাবারের অপেক্ষা করছে। রবিন তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। কি দেখে এত কৌতূহল হলো কিশোরের, বোঝার চেষ্টা করছে।

শেরিফ বললেন, 'যাবে। তবে আগেই বলে দিচ্ছি, ওর চেহারার দিকে তাকিয়ো না। সহ্য করতে পারবে না।'

পাঁচ

বার্বি নুনের দরজার পাশের কলিং বেল টিপলেন প্রথমে শেরিফ। তারপর দরজায় টোকা দিলেন।

'বাড়ি নেই নাকি?' রবিন বলল।

'না, আছে। শুনতে পাচ্ছে না। যে জোরে ক্যাসেট বাজায়।'

ডেকসেটের বিশাল স্পীকারের বুম বুম কানে আসছে এখান থেকেও। হেভি-মেটাল মিউজিক।

ডেকে লাভ হবে না। ঠেলা দিয়ে ভেজানো পাল্লা খুলে ফেললেন শেরিফ। কানে এসে যেন ধাক্কা মারল ড্রামের শব্দ।

আগে আগে ঢুকলেন তিনি। অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা।

যেদিকেই তাকানো যায় শুধু দানব আর দানব। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বেবুনের মাথা আর সাপের মত চেরা জিভঅলা দানব। কোটর থেকে বেরোনো ঝুলে-পড়া চোখঅলা দানব। বিশাল একচোখো দানব, দাঁতে কামড়ে ধরা আস্ত মানুষ। যত আকারের, যত ধরনের, যত উদ্ভট, ভয়ঙ্কর, কুৎসিত, ঘিনঘিনে দানব কল্পনা করা যায়, সব করেছে বার্বি। চমৎকার হাত। জীবন্ত লাগছে ছবিগুলোকে।

কানফাটা ভয়াবহ শব্দের মধ্যে ডুবে গিয়ে গভীর মনোযোগে আরেকটা দানব আঁকছে সে, এই সময় তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে তার

ওঅর্কশপে ঢুকে পড়লেন শেরিফ।

নিতান্ত অনিচ্ছায় হাতের ব্রাশটা নামিয়ে রেখে সুইচে খোঁচা মেরে গান বন্ধ করে দিল বার্বি। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে হাসল। আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন শেরিফ, তারপরেও একটা ধাক্কা খেতে হলো ওদের। ভয়াবহ চেহারা। বুলেটের মত লম্বাটে খুলি, একটা চোখ অনেক বড়, আরেকটা ছোট, নাকের জায়গায় কেবল দুটো ফুটো, বিশাল হাঁ-এর ভেতর করাতের মত চোখা হলদে দাঁত, একপাশের গাল বাঁকা হয়ে আছে বীভৎস ভঙ্গিতে। নোংরা টি-শার্ট আর তেল চিটচিটে জিন্‌স্ পরনে, গোড়ালি ঢাকা কালো বুট। আর্টিস্টের মত তো লাগেই না, জ্যান্ত এক বিভীষিকা।

একবার তাকিয়েই অন্যদিকে চোখ ফেরাল মুসা।

ছবি আঁকার সরঞ্জামের মধ্যে রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে দেখল রবিন। অদ্ভুত চেহারার একটা বাড়ির নীলনক্সাও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ছবির সঙ্গে।

'কারা?' চোখের ইঙ্গিতে তিন গোয়েন্দাকে দেখিয়ে শেরিফকে প্রশ্ন করল বার্বি।

'তিন গোয়েন্দা। কিশোর, মুসা, রবিন।' গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শেরিফ, 'ও বার্বি নুন। কার্নিভালে একটা ফানহাউস চালায়।'

বেদনার ছাপ ফুটল বার্বির চেহারায়। 'হায়রে কপাল, কতবার বলেছি আপনাকে ফানহাউস নয় ওটা, ফিয়ারহাউস। লোকে ওতে ঢুকে মজা পায় না, পায় ভয়, আতঙ্কে জান উড়ে যায়। চোখ উল্টে পড়ে যায় অনেকে। টেনে বের করে এনে মাথায় পানি ঢালতে হয়।' চোখা দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর হাসি হাসল সে। দেয়ালে ঝোলানো নীলনক্সাটা দেখিয়ে বলল, 'আরেকটা ওরকম হাউসের প্ল্যান করেছি। আরও বেশি ভয় দেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। এটার নাম দেব টেররহাউস।'

'ভয় পাওয়াটা একধরনের আনন্দ,' যুক্তি দেখালেন শেরিফ, 'সুতরাং ফিয়ারহাউসকে ফানহাউস বলাটা ভুল নয়।'

'থাক, আর তর্ক করতে চাই না,' হাল ছেড়ে দিল বার্বি। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তা আমার এখানে কি মনে করে?'

পকেট থেকে ডিনারের মেন্যুটা টেনে বের করল কিশোর। 'আপনার এই ছবিটা আমার কাছে দুর্দান্ত লেগেছে। ভক্ত হয়ে গেছি। সেজন্যেই দেখা করতে এলাম।'

দেখা করতে এলাম। 'লেগেছে। সেজন্যে বেশ সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে এঁকেছিলাম,' খুশি হলো বার্বি। বোঝা গেল তার তেমন ভক্ত নেই। এত ভয় দেখালে আর ভক্ত থাকে কি করে? 'আমার আঁকা ভাল ছবিগুলোর মধ্যে এটা একটা।'

দেয়ালে আঁকা সব ছবিরই নাম রেখেছে সে। কোথাও মাছের মত ছবিটা দেখা গেল না। মেন্যুতে টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এর অরিজিনালটা তো দেখছি না। নাম কি এটার?'

'ফিজি মারমেড।'

'ও, ফিজি মারমেড? তাই নাকি?' বলে উঠলেন শেরিফ। 'এ রকম চেহারা!'

'তো আপনার কি ধারণা ছিল?' বার্বি বলল, 'একেবারে আসল ফিজি মারমেডের মত করে এঁকেছি। পোস্টার দেখে। হুবহু নকল। দুটো মেলালে কোন খুঁত বের করতে পারবেন না।'

'এই ফিজি মারমেড জিনিসটা কি?' প্রশ্ন না করে আর থাকতে পারল না মুসা।

'ফিজি মারমেড মানে ফিজি মারমেড, আবার কি?' মুসার অজ্ঞতায় অবাক হলো বার্বি। 'জানো না নাকি?'

'সার্কাস আর কার্নিভালের ইতিহাসে ফিজি মারমেড একটা বিখ্যাত নাম,' বলে দিলেন শেরিফ। 'ক্লাসিক এক ধোঁকাবাজি। ফন্দিটা বেরিয়েছিল স্বয়ং বারনুমের মাথা থেকে।'

শেরিফের কথা কেড়ে নিয়ে বার্বি বলল, 'পোস্টারে বারনুম লিখে দিয়েছিল, সার্কাসে ঢুকলে আসল মারমেডকেই দেখা যাবে। শহরের কেউ আর বাকি রইল না। সবাই চলে গেল মারমেড দেখতে। টিকিট কেটে ঢুকে দেখে কোথায় জ্যান্ত মারমেড, একটা বানরের পাছায় মাছের লেজ সেলাই করে দিয়েছে। ওটাই নাকি মারমেড। হাহ্ হা!'

'বানর?' সতর্ক হয়ে গেল কিশোর।

ব্যাপারটা লক্ষ করল রবিন।

'মরা বানর। শুকনো,' বার্বি বলল।

এবার বার্বির মুখের কথা কেড়ে নিলেন শেরিফ, 'লোকে শুরু করল চেঁচামেচি—ওদের ঠকানো হয়েছে বলে। বারনুম তো অবাক। যেন আকাশ থেকে পড়েছে। ঠকানো হয়েছে নাকি? বুঝতেই পারছে না যেন কিছু। শেষে মুখ কালো করে মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল, আসলে বানানোটাই খারাপ হয়ে গেছে। নইলে বোঝে কার সাধ্য, ওটা জ্যান্ত না মৃত?'

'লোকে কিছু বলল না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মুসা। 'টিকিটের পয়সা ফেরত চাইল না?'

'চাইবে কি? ঠকেছে, ওটাই তো মজা। বরং যদি না ঠকত, তাহলে পয়সা ফেরত চাওয়ার প্রশ্ন উঠত। সার্কাসে সাফল্যের সঙ্গে ঠকানোটাও একটা খেলা। ওস্তাদ খেলুড়ে ছাড়া এ কাজ পারে না কেউ। সেজন্যেই তো বারনুমের এত নাম।'

'ঠকানোটা তাহলে একদিনই,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় দ্বিতীয়বার আর ঠকতে আসত না লোকে?'

'অনেক খেলুড়ের বেলায় সেটা সত্যি হলেও বারনুমের বেলায় ছিল না। ওর মত ব্রিলিয়ান্ট ঠগবাজ খুঁজলে আর দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। বহুকাল স্টার হয়ে ছিল ফিজি মারমেড। ওই এক মরা বানর দিয়ে কতবার যে ঠকিয়েছে বারনুম! পোস্টার বদলে দিত, সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কথা।

মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ত।'

'সত্যি একটা জিনিয়াস ছিল বারনুম,' শেরিফ থামতেই বলল বার্বি। 'মানুষকে সব সময় একটা ধাঁধার মধ্যে রেখে দিত। লোকে বুঝতেই পারত না, ওর কোন্ কথাটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, কোনটা আসল আর কোনটা ধোঁকাবাজি। যখন ও নিজে বলতে শুরু করল ফিজি মারমেড বলে কিছু নেই, ধোঁকাবাজি, তখনও বিশ্বাস করল না লোকে। ভাবল এই কথাও আরেকটা ধোঁকা। নিশ্চয় আসল মারমেডকে লুকিয়ে রেখে ওদের একচোট খেলিয়ে নিচ্ছে বারনুম। সময় হলে...'

'ঠিকই বের করবে আসলটাকে,' বার্বির বাক্যটা শেষ করে দিল কিশোর।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। 'কিশোর, একশো বছর আগে জন্মানো উচিত ছিল তোমার। চমৎকার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে যেতে। বারনুম বেশি চালাক ছিল, না তুমি, সেটা প্রমাণ করার সুযোগ আর কোনদিন পাওয়া যাবে না। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমাকে ঠকাতে পারে কিনা বারনুম।'

মুচকি হাসল শুধু কিশোর।

*

বার্বির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শেরিফের দিকে ফিরল কিশোর, 'রাতটা কোথায় কাটালে ভাল হয়, কোন পরামর্শ দিতে পারেন?'

'তোমাদের থাকার মত একটা জায়গাই আছে শহরে,' শেরিফ বললেন, 'বিগ টপ মোটর ইন। ওটা একটা মোটেল আর ট্রেলার পার্কের মিশ্রণ। ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির অনেক লোক ওখানে থাকে। ভাল হোটেলের সঙ্গে তুলনা করলে ঠকবে। তবে এরচেয়ে ভাল জায়গাও আর পাবে না এ শহরে।'

'অত আরামের দরকার নেই, থাকতে পারলেই হলো। ঘরে তো আর বেশিক্ষণ থাকব না, শুধু ঘুমানোর সময়টুকু...একটা জিনিস দেখাই আপনাকে,' কয়েকটা ছবি বের করে শেরিফকে দেখাল কিশোর। 'এই যে, দেখুন। দাগগুলো দেখছেন? হ্যারি নাইট যেখানে খুন হয়েছে, ডোবার পাড়ের নরম মাটিতে এই ছাপ দেখা গেছে...'

'আমিও দেখেছি।'

'কিসের ছাপ মনে হয়েছে আপনার?'

'চিনতে পারিনি।'

'আমিও ওরকমই শুনেছি। কেউ নাকি বুঝতে পারেনি কিসের। ছবি তুলে আনার পর বিশেষজ্ঞরা দেখে সন্দেহ করেছে, এগুলো আদিম সিমিয়ান জাতীয় প্রাণীর পায়ের ছাপ হতে পারে। অতি খুদে প্রাণী।'

'সিমিয়ান?'

'বানর গোষ্ঠীর প্রাণী, যাদের লেজ থাকে না—এই যেমন, শিম্পাঞ্জী গরিলা।'

'বানরে মানুষ খুন করে? অসম্ভব!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন শেরিফ। 'ও, এ কারণেই বানরের কথা শুনে খপ করে ধরেছিলে!'

হাসল শুধু কিশোর। হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

'তোমার কি ধারণা, মরা বানর ভূত হয়ে মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে?'

'ভূত আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে?'

'জেনে নিই আগে, তারপর বলব।'

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ। কোঁকড়া চুলগুলোর নিচে বিরাট মগজটায় কোন্ ভাবনা চলেছে, অনুমানের চেষ্টা করছেন।

সেটা লক্ষ করে হেসে বলল রবিন, 'বুঝবেন না, শেরিফ, কিছুই বুঝতে পারবেন না। ও যে কিসের মধ্য থেকে কি জিনিস টেনে বের করবে, কল্পনাই করতে পারবেন না।'

ছয়

বিগ টপ মোটর ইনের ম্যানেজারকে দেখে চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা।

রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের ওপর উঠে ওদেরকে স্বাগত জানাল ম্যানেজার। অতিরিক্ত বামন। মাত্র তিন ফুট লম্বা। পা ঘেঁষে দাঁড়ানো ওর কুকুরটাও আরেক বামন। ছোট জাতের কুকুর। শরীরটা মোটামুটি স্বাভাবিক, কিন্তু পাগুলো বড় ইঁদুরের সমান।

'ডাবসন ডব্লিউ ম্যাড তোমাদের সেবায় নিয়োজিত,' নাটকীয় ভঙ্গিতে ভারী গলায় বলল ম্যানেজার। এ-ও হয়তো সার্কাসে কাজ করত। তাই এ রকম করে বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। 'ধরেই নিলাম তোমরা তিনজন ঘর চাইতে এসেছ। কটা দরকার? বড় একটা? নাকি আলাদা আলাদা?'

'বড় একটা হলেও চলে। আলাদা হলেও চলে,' জবাব দিল কিশোর।

'তিনজনের থাকার মত বড় ঘর একটাও নেই, আলাদা তিনটেও নেই।'

'ঘরই নেই। কটা দরকার তাহলে জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'আছে। কিন্তু দুটো।'

'চলবে।'

'ঘর নয় কিন্তু ওগুলো।'

'তাহলে কি?' ধৈর্য হারাল না কিশোর। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, শক্ত হয়ে গেছে মুসার চোয়াল। রেগে যাচ্ছে।

'দুটো ট্রেলার। পাশাপাশি রাখা। রাতে ঘুমাতে পারবে।'

'দিন তাহলে।'

রবিন কিছু বলছে না। মুসার চোয়ালও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ওদের মুখে একবার নজর বুলিয়ে আবার ম্যানেজারের দিকে ফিরল কিশোর। 'আগে সার্কাসে কাজ করতেন, তাই না?'

কল্পনাই করতে পারেনি এতটা রেগে যাবে ম্যানেজার। বুক টান করে দাঁড়াল। হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়ে গেল চেহারা থেকে। চোখে আগুনের ঝিলিক। 'সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেললেই পারতে তোমাদের মত তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষের গোলামি করেছি কিনা!'

কথায় কথায় চটে ওঠে এখানকার মানুষগুলো। বোধহয় খুঁতওয়ালা শরীর নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে বলেই। শান্ত রইল কিশোর। 'সরি, মিস্টার ম্যাড, এখানকার বেশির ভাগ মানুষই তো সার্কাসের লোক, তাই ভাবলাম...'

ঘোঁৎ করে উঠল ম্যাড, 'ভাবলে যে যেহেতু বামন, সার্কাস ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই হবে না আমার! তাও নিশ্চয় সার্কাস বয়, যেখানে ভাঁড়ামো করে কারণে অকারণে আর্টিস্টরা আমার পাছায় লাথি মেরে লোক হাসাবে!'

'সরি! ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিন।'

কিন্তু রাগ পড়ল না ম্যাডের। 'তোমার মোটা মাথায় একটিবারের জন্যে ঢুকল না, শরীর খাটো হলেও মাথায় একই রকম মগজ থাকে মানুষের। আমি যে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি নিতে পারি, কল্পনাও করতে পারোনি তাই। কি, চমকে গেলে তো?'

পেছনের দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধাই একটা সার্টিফিকেট দেখাল সে। 'কিংবা ভাবতে পারোনি দেশের যে কোন বড় হোটেলে চাকরি হতে পারে আমার মত বামনের, তাও ম্যানেজারের, ইউনিফর্ম পরা বয় কিংবা চাকর-বাকর নয়।'

'মিস্টার ম্যাড, আমি...'

কিন্তু থামার কোন লক্ষণ নেই ম্যাডের। 'না, তোমার চোখে, তোমাদের মত তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষদের চোখে আমি অস্বাভাবিক, মানুষের পর্যায়েই পড়ি না, সুতরাং সম্মানিত কোন কাজ কেন আমার জন্যে থাকবে? কেন আমি একজন বড় ব্যবসায়ী কিংবা এগজিকিউটিভ হতে পারব? আমার হওয়া উচিত কেবল সার্কাসের লোক...ভাঁড়!'

একটা মুহূর্তের ফাঁক পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেলল কিশোর, 'আপনার মনে আমি কষ্ট দিতে চাইনি, মিস্টার ম্যাড!'

'কষ্ট? কষ্ট কেন পাব আমি? তোমাকে দোষ দিই না। দেখেই কারও সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলাটা আসলে মানুষের স্বভাব। এই যেমন আমি তোমার সম্পর্কে করেছি।'

'করেছেন? কি করেছেন?'

'তুমি আমেরিকান নও, এশিয়ান। মগজ-টগজ কিচ্ছু নেই। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে। বাউণ্ডুলের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাস।

নইলে গিবসনটনের মত জায়গায় তোমার আসার কথা নয়।' রবিন আর মুসার ওপর নজর বুলিয়ে শুধরে দিয়ে বলল, 'তোমাদের!'

হেসে ফেলল কিশোর, 'আপনিও আমাদের ব্যাপারে ভুল করেছেন, মিস্টার ম্যাড। আমরা বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেও নই, বাউণ্ডুলেও নই, আমরা গোয়েন্দা।'

এই প্রথম জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল ম্যাড। 'গোয়েন্দা!'

'হ্যাঁ। হ্যারি নাইটের কেসটার তদন্ত করতে এসেছি। ভিকটর সাইমন নামে একজন অনেক বড় ডিটেকটিভ আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন নাইট।'

একেবারে চুপ হয়ে গেল ম্যাড। জবান বন্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পাশে রাখা রেজিস্টারটা দেখাল ইঙ্গিতে, 'খাতায় নাম সই করো।'

কাউন্টার থেকে একটা কলম তুলে খাতায় সই করে, কলমটা রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

'তুমি···তোমরা গোয়েন্দা?' প্রশ্ন করল ম্যাড। 'সত্যি?'

'কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না, বয়স কম তো···'

'খাটো হলে যদি হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি নেয়া যায়, বয়স কম হলে গোয়েন্দা হওয়া যাবে না কেন?'

খোঁচাটা নীরবে হজম করল ম্যাড। বেল বাজিয়ে হোটেল বয়কে ডাকল।

বেলবয়কে দেখেই চিনল মুসা। গোরস্থানে একেও দেখেছিল, কিংবা বলা ভাল এদেরকে দেখেছিল। সেই মধ্যবয়েসী লোকটা, যার পেট থেকে মুণ্ডহীন আরেকটা শরীর গজিয়েছে। মূল মানুষটার হাতের ফ্লাস্কটা দেখা গেল না। তবে হাঁটার টলমল ভঙ্গি দেখেই অনুমান করা যায়, কয়েক্বার ভরেছে আর খালি করেছে ওটা।

'টবি তোমাদের ব্যাগ নিয়ে যাবে,' সংক্ষেপে বলল ম্যাড, 'তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে।'

'তিনটে ব্যাগ দুই হাতে নেবে কিভাবে?' আবার কোন্ কথায় চটে ওঠে ম্যানেজার, সেজন্যে ভয়ে ভয়ে বলল মুসা।

'না পারলে তুমি একটা নিয়ে যাও। কাজ করাটা দোষের কিছু নয়।'

'আমিই পারব,' জড়ানো গলায় বলল বেলবয় টবি। মুসাকে ব্যাগ ধরতে দিল না। একহাতে দুটো, আরেক হাতে একটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। গলার জোরে বলেছে বটে, গায়ের জোরে কুলাচ্ছে না। দরজার কাছে গিয়েই হোঁচট খেল। উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

যে কোন সময় পড়ে যেতে পারে এই লোক। দুপাশ থেকে তাকে প্রায় এসকর্ট করে নিয়ে এগোল মুসা আর কিশোর। পেছন পেছন চলল রবিন।

একবার একজনকে সার্কাসে কাজ করার কথা জিজ্ঞেস করে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, তবু কৌতূহল দমাতে না পেরে সাবধানে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'টবি, কখনও সার্কাসে কাজ করেছেন আপনি?'

ভড়কে গেল মুসা। এই লোক আবার রেগে গিয়ে কি করে বসে কে জানে! হয়তো ব্যাগ দিয়েই বাড়ি মারবে। তাড়াতাড়ি পাশ থেকে সরে গেল সে।

কিন্তু ম্যাডের মত চটল না টবি। বরং গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, 'সারাটা জীবনই কাটিয়েছি সার্কাসের মঞ্চে। খবরের কাগজের হেডলাইন হয়েছি বহুবার।'

'আপনার দিকে দর্শকদের কেমন করে তাকিয়ে থাকতে দেখে আপনার অস্বস্তি লাগত না?' পেছন থেকে জানতে চাইল রবিন।

ফিরে তাকাল না টবি। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তা লাগবে কেন? বরং ভাল লাগত ওদের চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়া দেখে। মজা পেতাম। আরও আনন্দ দেয়ার জন্যে পেটের দিকে দেখিয়ে বলতাম—লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, এ হলো আমার ভাই, ববি। বড়ই লাজুক ছেলে। কিন্তু ও যা খেলা দেখাতে পারে না, তাজ্জব বানিয়ে দেবে।'

ববি কার নাম বুঝতে অসুবিধে হলো না তিন গোয়েন্দার। পেটের মুণ্ডহীন দেহটার কথা বলেছে টবি।

'খুব নাম করে ফেলেছিলেন তাহলে,' আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল কিশোর।

'ফেলেছিলাম বললে অল্পই বলা হয়। ফাটাফাটি করে ফেলেছিলাম। ববি-টবি দুই ভাইকে নিয়ে ছড়া পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছিল লোকে। আহা, কি সব দিনই না গেছে!' যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে করে ভারী হয়ে এল টবির কণ্ঠ।

'সার্কাস ছেড়ে দিলেন কেন?'

'মিস্টার ম্যাডের কথায়। খুব ভাল লোক। বুঝিয়ে-শুনিয়ে আমাকে সার্কাস থেকে বের করে আনল। বলল, নিজের দেহের বিকৃতি দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিয়ে টাকা রোজগার করাটা ঠিক নয়। তাতে আত্মসম্মান কমে। যত আনন্দই দাও, বিকৃত শরীরের মানুষের দিকে লোকে একধরনের ঘৃণা নিয়ে তাকায়, করুণা করে, তাদেরকে সে-সুযোগ দেয়াটা মোটেও উচিত নয়। সুতরাং আত্মসম্মান বাঁচিয়ে সার্কাসকে লাথি মেরে চলে এলাম। এখন টাকা কামানোর জন্যে অন্যের ব্যাগ বয়ে বেড়াই।'

'এতে আত্মসম্মান বেড়েছে না কমেছে বলে মনে হয় আপনার?'

'অনেক বেড়েছে।' ম্যাডের কথা নকল করে বলল টবি, 'কাজ করা দোষের কিছু নয়।' ব্যাগগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে রুমাল বের করে মুখ মুছল। সামনে দুটো ট্রেলার দেখিয়ে বলল, 'ওই যে, তোমাদের ঘর।' পকেট থেকে চাবি বের করে দিল কিশোরের হাতে। তারপর আবার ব্যাগগুলো তুলে নিল। নিজেরটা নিতে এল মুসা। বাধা দিল টবি, 'থাক, থাক, আমিই

পারব। নইলে টাকা নেব কেন? কাজ না করে টাকা নিলে ভিক্ষে হয়ে যাবে।'

'না, হবে না,' জোর করে টবির হাত থেকে নিজের ব্যাগটা নিয়ে নিল মুসা। বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিতে পারল না আর। দেখাদেখি রবিনও তারটা কেড়ে নিল।

কিশোর বলল, 'আপনার আর যাওয়া লাগবে না। ঘর তো দেখালেনই। আপনার ডিউটি শেষ।'

'থ্যাংক ইউ,' বলে কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাল টবি। 'তোমরা খুব ভাল ছেলে।'

ট্রেলারগুলো দেখিয়ে কিশোরকে বলল রবিন, 'যা চেহারা। ছারপোকা নেই তো? কামড়ের চোটে ঘুমোতে পারব না তাহলে।'

হাসল টবি। 'ছারপোকা নেই, তবে ফিজি মারমেডদের ব্যাপারে সাবধান।'

'মানে? বুঝলাম না!'

কিন্তু কিশোর বুঝে ফেলেছে, 'ঠগদের ব্যাপারে সাবধান করছেন তো?' হেসে মাথা নাড়ল, 'ভাববেন না, আমাদের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে সুবিধে করতে পারবে না।'

'অত জোর দিয়ে কথা বোলো না। বারনুমের অনেক সাগরেদ ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আজও বেঁচে আছে...'

অনেক পরিশ্রম করেছে, অনেক কথা বলেছে, আর ফ্লাস্ক না বের করে থাকতে পারল না টবি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টলতে টলতে চলে গেল আবার যেদিক থেকে এসেছিল।

চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রবিন।

'জোড়াটা কেমন অদ্ভুত, তাই না?'

'এখানকার সবাই তো অদ্ভুত।'

'কিন্তু টবি আর ববি বেশি অদ্ভুত। সিয়ামিজ টুইন নয়, যমজ নয়...'

'একধরনের যমজই। তবে দুজন দেখতে একরকম হয় না। কারও পেট থেকে জোড়া লাগে, কারও পিঠ থেকে। কোথায় যেন পড়েছি।'

'আমার কাছে অবাস্তব লাগছে,' মুসা বলল। 'এ রকমও যে মানুষ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।'

সাত

সেরাতে প্রচুর দুঃস্বপ্ন দেখল কিশোর। পাশের ট্রেলারে রবিনও গড়াগড়ি করতে লাগল বিছানায়। কেবল মুসা ঘুমাল নাক ডাকিয়ে। অস্বাভাবিক মানুষদের ভাবনা তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না।

দুটো ট্রেলার সাইজে সমান নয়। একটা সামান্য ছোট। তাতে একটা বেড। আরেকটাতে দুটো। সেটা নিয়েছে মুসা আর রবিন।

❈

আরও একজন লোক দুঃস্বপ্ন দেখল সেরাতে। বার্বি নুন। তবে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে তার স্বপ্নের তফাৎ আছে। সেটা হলো, ওরা দেখছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, আর সে দেখল জেগে থাকা অবস্থায়।

রাত জেগে কাজ করা বার্বির স্বভাব। গভীর রাতে কাজ করতে ভাল লাগে তার। সেরাতেও স্টুডিওতে জেগে রয়েছে। ফিয়ারহাউসের একটা আয়নায় আঁকা ছবিতে ব্রাশের শেষ পরশ বুলাল। পিছিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগল কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা। আয়নাটা এমনভাবে তৈরি, তাতে তার নিজের প্রতিবিম্বকে দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর, বিকৃত, দলামোচড়া হয়ে থাকা একটা গিরগিটির মত। তার ওপর রয়েছে কুৎসিত ছবির স্পেশাল ইফেক্ট।

'চমৎকার!' নিজেই নিজের কাজের প্রশংসা করল বার্বি। 'পয়সা উসুল করে দেবে দর্শকদের।'

হঠাৎ কুঁচকে গেল চোখের পাতা।

আয়নার মধ্যে তার প্রতিবিম্বের পাশে আরেকটা প্রতিবিম্ব।

এত রাতে অনুমতি না নিয়ে তার স্টুডিওতে ঢোকে! কার এত্তবড় সাহস!

'কে?' বলে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই স্থির হয়ে গেল বার্বি। যাকে দেখল, কল্পনাই করেনি কখনও সে চলে আসবে একা একা। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি।

বার্বির পেট সই করে লাফ দিল আগন্তুক।

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে বার্বি। এ রকম যে কিছু ঘটতে পারে, এটা ছিল তার দুঃস্বপ্নেরও অতীত। পেটে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল ওর। তীব্র ব্যথায় সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। চোখে অন্ধকার দেখছে।

আবার লাফ দিল আগন্তুক।

দ্বিতীয় আঘাতটা আর সহ্য করতে পারল না বার্বি। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল একটা আয়নার ওপর। ঝনঝন করে ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ।

❈

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। দুঃস্বপ্নের রেশ এখনও ভারী করে রেখেছে মন। দৌড়ালে হয়তো হালকা হতে পারে। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

কিন্তু বাইরে বেরিয়েই তার মনে হলো আবার দুঃস্বপ্নের জগতে ফিরে এসেছে। ধোঁয়াটে ধূসর কুয়াশায় ঢাকা ভোর। এর মধ্যে দৌড়াতে ভাল লাগবে না। কিন্তু মগজটাকে সাফ করার জন্যে ঘাম বের করা দরকার শরীর থেকে। সূর্য উঠবেই। এক না এক সময় কুয়াশা কেটে যেতে বাধ্য।

দৌড়াতে শুরু করল সে।

চার মাইল দূরের সরু একটা ব্রিজের কাছে যখন পৌঁছল সে তখনও একই রকম কুয়াশা। থামল কিশোর। আরও এগোবে? না ফিরে যাবে?

অনেক জোরে দৌড়ে এসেছে। নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে ভারী দম নিচ্ছে, এই সময় একটা দৃশ্য দম প্রায় আটকে দিল তার।

পানির ওপরে ভুশ করে ভেসে উঠেছে একটা মাথা। চকচকে টাক। একটা জ্যান্ত মাছ ছটফট করছে তার দাঁতে। বার্বি নুনের স্টুডিওতে দেখা দানবের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ছবির দানবটা প্রাণহীন, কামড়ে রেখেছে মানুষ, আর এটা প্রাণবন্ত, কামড়ে ধরেছে মাছ।

ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এল মানুষটা। কিশোরকে দেখেনি।

সারা শরীরের কোথাও একটা চুল নেই। টাকের মতই নির্লোম। সারা গায়ে লাল, নীল আর সবুজ রঙে ট্যাটু আঁকা। দানবের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লোকটাকে। দম আরও আটকে এল কিশোরের, যখন দেখল মাটিতে বসে পড়ে জ্যান্ত মাছটাকেই কচকচ করে চিবিয়ে খেতে শুরু করল লোকটা।

পা টিপে টিপে ব্রিজের ওপর উঠে পড়ল কিশোর।

বেড়ালের শ্রবণশক্তি যেন লোকটার। ঠিকই শুনে ফেলল তার পায়ের আওয়াজ। ঝট করে ফিরে তাকাল। দেখল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু আর থাকল না ওখানে। উঠে দৌড়াতে শুরু করল। খাটো, হোঁৎকা, কিন্তু দৌড়ায় হরিণের মত দ্রুত। এ রকম শরীরের একজন মানুষ এ ভাবে দৌড়াতে পারে, সেটাও আরেক আশ্চর্য।

পিছু নিল কিশোর। পেরে উঠল না লোকটার সঙ্গে। অনেকদূর দৌড়ে এসে যখন দেখল অনেক এগিয়ে গেছে লোকটা, ওকে ধরা অসম্ভব, থেমে গেল সে। হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে। কুয়াশার পাকের মাঝে হারিয়ে যেতে দেখল লোকটাকে।

*

দরজায় ঘনঘন করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। সারারাত ছটফট করে ভোরের দিকে ঘুমটা গাঢ় হয়ে এসেছিল তার। বিরক্ত লাগল। কয়েকটা গোঙানি দিয়ে পাশ ফিরে তাকাল। দেখল মুসাও জেগে গেছে।

উঠতে ইচ্ছে করছে না। ভাবল, দরজা না খুললে চলে যাবে লোকটা।

কিন্তু গেল না। আরও জোরে কিল মারতে শুরু করল।

উঠে গিয়ে খুলে দিল মুসা।

টবি দাঁড়িয়ে আছে।

'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, না?' বিনীত স্বরে বলল টবি, 'সরি! শেরিফ পাঠালেন তোমাদের নিয়ে যেতে।'

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন। তাকিয়ে আছে টবির পেটের দিকে। দুঃস্বপ্নের রেশ না কাটার কারণেই বোধহয় চোখ সরাতে পারছে না টবির পেটের ভয়াবহ বিকলাঙ্গটার দিক থেকে। তাকাতে চায় না সে। কিন্তু

চুম্বকের মত তার চোখকে যেন আকর্ষণ করছে এখন ওটা।

এই প্রথমবার কাছে থেকে উদ্ভট জিনিসটাকে ভালমত দেখার সুযোগ পেয়েছে। শরীরের ঠিক মাঝ বরাবর যেন জোঁকের মত কামড়ে রয়েছে ওটা। একেবারে মুণ্ডহীন নয় দেহটা, কাঁধের যেখানে গলাটা থাকার কথা, ওখানে বিশাল এক ফোঁড়ার মত ঠেলে বেরিয়ে আছে একটা মাংস কিংবা হাড়ের ঢিবি, চামড়ায় ঢাকা বলে বোঝা যায় না ওটা খুলি নাকি শুধুই মাংসপিণ্ড। ওই ফোঁড়ার মধ্যে আবার ফুটোমতও আছে, ওগুলো বোধহয় কান আর চোখ—অনুমান করল সে। মুখ এবং বাকি শরীরটা দেখতে পেল না। টবির জ্যাকেটের মত একই কাপড়ে তৈরি আরেকটা খুদে জ্যাকেট পরা, হাতা দুটো ঝোলা। হাত নেই বোধহয় দেহটার।

জোর করে চোখ সরাল রবিন। টবির দিকে তাকাল, 'কেন?'

টবি জানাল, 'কাল রাতে আরও একটা খুন হয়েছে।'

আট

এক ঘণ্টা পর বার্বি নুনের লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কিশোর। কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন শেরিফ। তাঁর পাশে রবিন।

মুসা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যান্ত বার্বির চেহারাই সহ্য করতে পারেনি, এখন তো রক্তাক্ত মৃতদেহ। কতটা বীভৎস লাগবে আন্দাজ করেই ঘরে ঢোকেনি সে। টবি খবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছিল দুজনে। কিশোর এলে তাকে নিয়ে একসঙ্গে এসেছে।

বার্বি নুনের পেটের জখমটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। শেরিফের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যারি নাইটের জখম আর বার্বির জখমটা হুবহু এক। তারমানে দুটো খুন একই খুনীর কাজ।'

'এটা আর নতুন কি,' রবিন বলল।

'নতুনই।'

'মানে?'

'রক্ত।'

'এই তো শুরু করলে নাটকীয় কথাবার্তা! খুন যখন হয়েছে, রক্ত তো থাকবেই।'

'তোমাদের নিয়ে এটাই সমস্যা। তলিয়ে দেখো না কোন কিছু। গভীর ভাবে চিন্তা করো না...'

'দোহাই তোমার, কিশোর! এখন আর লেকচার দিয়ো না! সহ্য করতে পারছি না। সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি...'

'দুঃস্বপ্ন আমিও প্রচুর দেখেছি। এই খানিক আগে একটা বাস্তব দুঃস্বপ্নও দেখে এলাম।...এদিকে এসো, দেখাচ্ছি।'

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল রবিন। শেরিফও এগোলেন এক পা।

কি দেখেছে, দেখাল কিশোর। শুকনো রক্তের একটা রেখা চলে গেছে বার্বির কাছ থেকে ওঅর্কশপের পেছনের জানালা পর্যন্ত। 'গিয়ে ওই জানালাটায় দেখে এসো।'

এগিয়ে গেল রবিন। জানালার কাঁচে ভেতরের দিকে শুকনো রক্ত লেগে থাকতে দেখল।

'হুঁ, রক্তমাখা হাত দিয়ে ঠেলে জানালা খুলে বেরিয়ে গেছে খুনী। তাতেই বা কি পেলাম? বার্বি নুনের আরও কিছু রক্ত ছাড়া?'

'আমি এই জানালাটার কথাও বলছি না। এর ওপরেরটা দেখো। ছোটটা। আমার বিশ্বাস, ওদিক দিয়ে ঢুকেছিল খুনী।'

জুতোর ডগায় ভর দিয়ে শরীরটা উঁচু করল রবিন। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। তারপর দেখল, এটার জানালার কাঁচেও রক্ত। তবে এটাতে লেগে আছে বাইরের দিকে।

'ওই রক্তের দাগ না দেখলে সত্যি অবাক হতাম,' কিশোর বলল। 'কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কোনপথে ঢুকেছে খুনী।'

'কিন্তু খুন করার আগেই রক্ত লাগল কি করে খুনীর গায়ে? বাইরে থেকে খোলার সময়...' থেমে গেল রবিন। 'ওহ্হো, বুঝেছি! ওই রক্তটা বার্বির নয়, খুনীর নিজের। এই বলতে চাও তো?'

হাসল কিশোর। 'ওখান থেকে রক্তের নমুনা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করাতে হবে।'

'এখানকার লোকাল হাসপাতালে পরীক্ষা করালে ব্লাড গ্রুপ জানা যাবে শুধু। তাতে অবশ্য আমাদের সন্দেহভাজনদের তালিকা ছোট হবে। কিন্তু ডি এন এ টেস্টই কেবল চিহ্নিত করতে পারে খুনীকে। সেটা করাব কোথায়? এখানে হবে বলে মনে হয় না। আটলান্টায় পাঠাতে হবে। অনেক সময় লাগে এই পরীক্ষায়। রিপোর্ট আসতে আসতে কয়েক হপ্তা লেগে যাবে।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমার মনে হয় না অতদিন অপেক্ষা করবে খুনী। রিপোর্ট আসার আগেই আবার আঘাত হানবে। আগের চেয়ে দ্রুত করছে এখন খুনগুলো। একটা খুন করে আরেকটা করার আগে বিরতি দিচ্ছে অনেক কম। সময় কমিয়ে আনছে। কোন কিছু খেপিয়ে তুলেছে ওকে। কিংবা মরিয়া করে তুলেছে।'

'আমাদের আসাটাকে হুমকি হিসেবে নিতে পারে।'

'পারে, আবার নাও পারে; তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই তার। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। সে যা-ই হোক, মোটিভ না জানলে খুনীকে ধরা বড় কঠিন।'

দুজনের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ শেরিফ। মুখ খুললেন, 'এটাই হলো সমস্যা, মোটিভ জানা যাচ্ছে না কিছুতে। আরেকটা প্রশ্ন জাগেনি তোমার মাথায়? সামনের দরজা খোলা থাকতে এদিক দিয়ে ঢুকল

কেন খুনী? এত ছোট একটা জানালা দিয়ে কোন বড় মানুষ ঢুকতে পারবে না। বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যাপারটাও রয়েছে। এতে করে ধরে নেয়া যায়—খুনী একজন ওস্তাদ দড়াবাজিকর। সরু জায়গা দিয়ে ঠেলেঠুলে শরীর পার করে নেয়ার কাজেও তার তুলনা হয় না। বেড়াল আর ইঁদুর জাতীয় প্রাণীরাই কেবল যেটা পারে।'

'রাইট!' তর্জনী নাচাল কিশোর। 'ঠিকই অনুমান করেছেন আপনি। তারমানে আপনিও আমার মত ভাবছেন, খুনী সার্কাসের লোক।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন শেরিফ।

'এখন আমাদের দেখতে হবে,' রবিন বলল, 'এই দুটো কাজে এখানে কে বেশি ওস্তাদ। খুঁজে বের করতে হবে তাকে।'

'শেরিফ,' কিশোর বলল, 'ল্যাবরেটরিতে রক্তের নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন? আমাদের জরুরী কাজ আছে। একটা লোককে খুঁজে বের করতে হবে।'

❀

'পাগল নাকি লোকটা?' হাত তুলে দেখাল রবিন।

'এ কোথায় এসে পড়লাম!' লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'তো পাগলের এলাকা!'

'পাগলের শহর,' শুধরে দিল রবিন।

কিশোর চুপ। তাকিয়ে দেখছে লোকটার কাণ্ড। লম্বা থামের মাথায় দড়ি ঝুলিয়ে তাতে পা বেঁধে মাথা নিচু করে ঝুলে রয়েছে। বড়শিতে আটকানো মাছের মত শরীর মোচড়াচ্ছে। যেন মুক্ত করার চেষ্টা করছে নিজেকে।

নিচে মাটিতে ইট দিয়ে চুলা বানিয়ে, আগুন জ্বেলে তার ওপর চৌবাচ্চার মত বিশাল এক পাত্র চাপানো হয়েছে। তাতে টগবগ করে পানি ফুটছে। ধীরে ধীরে ওটার দিকে নেমে আসছে পুলিতে লাগানো দড়ি। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না নেমে আসতে। ফুটন্ত পানিতে ফেলে দেয়া চিংড়ির মত সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন লোকটা।

পানির চার-পাঁচ ফুট ওপরে থাকতে ঝুলন্ত অবস্থায়ই গায়ের জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল লোকটা। শরীরটাকে বাঁকা করে মাথা ওপরে তুলে ফেলল। এক হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে রেখে আরেক হাতে খুলে ফেলল গোড়ালিতে বাঁধা দড়ির গিঁট। দড়িতে দোলা দিয়ে হাত ছেড়ে দিল। লাফিয়ে পড়ল মাটিতে, পাত্র থেকে দূরে। পকেট থেকে স্টপওয়াচ বের করে দেখল। নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে মনে হচ্ছে। এতক্ষণে চোখে পড়ল তিন গোয়েন্দাকে।

'হাততালি দিলে না?' ভুরু নাচিয়ে বলল ডক্টর রোজালি। 'এত তাড়াতাড়ি এত কঠিন একটা কাজ আর কে করতে পেরেছে?'

রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে রোজালি, সুতরাং জবাবটা রবিনই দিল, 'আমার জানা নেই।'

'তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। আর কেউ প্যারেনি।...এ ধরনের খেলাধুলায় তেমন আগ্রহ নেই তোমাদের, বোঝা যাচ্ছে।'

'না, নেই,' জবাবটা কিশোর দিল, 'এ সব ধাপ্পাবাজির খেলা ভাল লাগে না আমাদের। কাল গোরস্থানে তো আপনার ফাঁকিবাজি দেখলাম। একজন মৃত মানুষের সৎকার অনুষ্ঠানেও চালাকি করা লাগল। খারাপ লাগেনি আপনার?'

'কে বলল চালাকি? সত্যি সত্যি বুকে হেনি ঢোকাতে চেয়েছিলাম আমি। শেরিফ বাধা না দিলে...'

'থাক, আর মিথ্যে বলার দরকার নেই। আর যাকেই দেন না কেন, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল রোজালি। মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'তাই নাকি? হয়ে যাক পরীক্ষা।' লম্বা একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। তাতে রাখা নানা রকম যন্ত্রপাতি। বেশির ভাগই চোখা আর বেশ ধারাল মনে হচ্ছে।

'অনেক খেলা জানা আছে ডক্টর রোজালির,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে, সার্কাসের মঞ্চে যে ভাবে কথা বলে। 'মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয় দর্শকের, আতঙ্কিত করে ফেলে। যে কাজ করলে ব্যথায় পাগল হয়ে যাবে সাধারণ লোক, মূর্ছা যাবে, ডক্টরের তাতে কিছুই হয় না।'

মানুষের খুলির মত দেখতে একটা ধাতব খুলির দুই চোখের ফুটোয় ঢুকিয়ে রাখা দুটো রূপার হ্যাট-পিন তুলে নিল রোজালি। পিন দুটোর অস্বাভাবিক বড় মাথাও খুলির মত করে তৈরি। চোখের সামনে এনে দেখতে দেখতে আপনমনে মাথা নেড়ে বলল, 'না, এতে হবে না। সন্দেহ বাতিকঅলা গোয়েন্দাদের কাবু করতে হলে আরও খারাপ জিনিস দরকার।'

পিন দুটো রেখে দিয়ে লম্বা একটা পেরেক আর একটা হাতুড়ি তুলে নিল সে।

'হ্যাঁ,' উজ্জ্বল হলো তার চোখ, 'এখন হবে। ভাল করে দেখো। চোখ মিটমিট কোরো না, ঘুরে যেও না। নাস্তা করে এসেছ নাকি? পেট ভরা? বমি করে ফেলবে না তো?'

লম্বা পেরেকটা ধীরে ধীরে ডান নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দিল সে। যখন ঠেলে আর তুলতে পারল না, কোথাও ঠেকে আটকে গেল, তখন হাতুড়ি ঠুকতে শুরু করল পেরেকের মাথায়।

দাঁতে দাঁত চেপে রইল রবিন। চেহারাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালাল প্রাণপণে। খারাপ যে লাগছে, এটা বুঝিয়ে খুশি হতে দিল না রোজালিকে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে ব্যথা পান না? দুর্লভ কিছু লোক আছে পৃথিবীতে, যাদের স্নায়ুর মাথায় ব্যথার অনুভূতি নেই। আপনিও তাদের একজন।'

হাতুড়ি ঠোকা বন্ধ করে দিল ডক্টর রোজালি। 'তাহলে স্বীকার করছ

ফাঁকিবাজি নেই এতে?' ন্যাকের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে পেরেকের মাথাটা।

জবাব দিল না রবিন।

হেসে হাতুড়ি রেখে একটা প্লায়ার্স তুলে নিল ডক্টর। পেরেকের মাথাটা প্লায়ার্স দিয়ে চেপে ধরে খুলে আনার জন্যে হেঁচকা টান মারতে আরম্ভ করল।

'মঞ্চে কখনও এ ফাঁকি...মানে খেলাটা দেখিয়েছেন?' জানতে চাইল কিশোর।

নাক থেকে পেরেকটা অর্ধেক বের করেছে রোজালি, সেই অবস্থায় থেমে গেল। 'এটা দেখানোর সময় দর্শকদের বলি, যদি আর কেউ এ কাজ করার চেষ্টা করে, নির্ঘাত মগজে পেরেক ঢুকে মরবে। তবে তোমরা চালাক ছেলে। ফাঁকিবাজি ধরে ফেলার ক্ষমতা আছে। চেষ্টা করে দেখতে পারো। বাধা দেব না।' মুসার দিকে তাকাল সে।

হাত নাড়ল মুসা, 'থাক, আমার দরকার নেই।'

'তারমানে বুদ্ধি আছে তোমার। যার কাজ তারই সাজে। পেশাদারদের কাজ তাদের ওপরই ছেড়ে দেয়া ভাল।' আবার প্লায়ার্স দিয়ে পেরেকের মাথা চেপে ধরল ডক্টর।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'আমাকে দেবেন?'

'নিশ্চয়ই,' হেসে প্লায়ার্সটা কিশোরের বাড়ানো হাতের তালুতে ফেলে দিল ডক্টর।

ওটার দিকে এক নজর তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কাজে পেশাদার হওয়া যায় কিভাবে?'

'একেকজন একেকভাবে হয়। আমি বড় হয়েছি ইয়েমেনে। ওখানেই গুরুর কাছে শিক্ষা নেয়া শুরু। তারপর দুনিয়ার বহুদেশ ঘুরেছি আমি, বড় বড় ওস্তাদের কাছে শিক্ষা নিয়েছি যারা বডি কন্ট্রোল করতে জানে। যোগী, ফকির, স্বামী, মোটকথা দেশেবিদেশে এই প্রাচীন আর্টের যত গুরু পেয়েছি, সবারই পা টিপেছি আমি। ওদের জানা সমস্ত বিদ্যা আদায় করে ছেড়েছি।'

'তারমানে তো বহুত কঠিন কাজ,' হালকা স্বরে বলল কিশোর। 'আপনাকে গুরু মেনে আপাতত এই পেরেকটা দিয়েই শুরু করি, কি বলেন?'

প্লায়ার্স দিয়ে পেরেকের মাথা চেপে ধরে হেঁচকা টান মারল সে।

উহ্ করে উঠল রোজালি। নাক চেপে ধরল।

'কি হলো, লাগিয়ে দিলাম নাকি!' ঘাবড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। প্লায়ার্সের মাথায় ধরা পেরেকটার দিকে তাকাল সে। চোখা ডগায় রক্ত লেগে আছে।

'তা একটু লাগিয়েছ। প্রথমবার তো, খোলার কায়দাটা জানো না,' হাসার চেষ্টা করল রোজালি। চোখে পানি এসে গেছে। তারমানে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। 'গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে কখনও এ লাইনে আসার ইচ্ছে যদি

হয় তো চলে এসো, সাগরেদ করে নেব।' রবিনের দিকে ফিরল সে। 'তুমি কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।'

'প্রথমে একটু খারাপ লেগেছিল, অস্বীকার করছি না,' নরম হলো না রবিন। 'তবে আর ভয় দেখাতে পারবেন না।'

'তাই নাকি? বেশ, দেখা যাক।'

নয়

তুমি যাই করো গুরু, আর ভয় পাচ্ছি না!—মনে মনে নিজেকে বোঝাল রবিন। কিন্তু কল্পনাই করতে পারেনি কি করতে যাচ্ছে রোজালি। চৌবাচ্চাটার কাছে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ওটার গায়ে এক বাড়ি মারল সে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না রবিন।

একটা লোকের মাথা বেরিয়ে এল ফুটন্ত পানির ভেতর থেকে। পুরোপুরি টাক। একটা লোমও নেই। চৌবাচ্চার ভেতর উঠে দাঁড়াল লোকটা। সারা গায়ে নানা রঙের উল্কি আঁকা।

চৌবাচ্চা থেকে নেমে তিন গোয়েন্দার মুখোমুখি দাঁড়াল। গা থেকে পানি ঝরে পড়ছে। গায়ে কোন কাপড় নেই। কোমরে একটা নেংটি জড়ানো।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান,' বলতে গিয়ে থেমে গেল ডক্টর, 'থুক্কু, এখানে তো লেডিজ নেই...ঠিক আছে, জেন্টেলম্যান মিস্টার তিন গোয়েন্দারা, জনাব হুকুবামফট্টার সঙ্গে পরিচিত হোন।'

রবিন আর মুসা দুজনেই দেখল নিচের চোয়াল ঝুলে পড়েছে কিশোরের। হাঁ করে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। যেন দুঃস্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠেছে ওর চোখের সামনে।

কিশোরকে চমকে দিতে পেরে খুশি হয়েছে ডক্টর রোজালি। মুখে বিমল হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে সার্কাসের তাঁবু ভর্তি দর্শক হাততালি দিলেও এত খুশি হত না। 'কি ব্যাপার, শার্লক হোমস? পানি থেকে নেমে আসতে আর কখনও দেখোনি কাউকে?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'দেখেছি বলেই তো অবাক লাগছে। ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে এই লোককে নদী থেকে উঠে আসতে দেখেছি আমি। দাঁতে চেপে ধরা জ্যান্ত মাছ। নদীর পাড়ে বসেই খেয়ে ফেলছিল।'

এবার চমকানোর পালা ডক্টর রোজালির। ভুরু কুঁচকে তাকাল হুকুবামফট্টার দিকে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কত আর মানা করব! যতই বলি শো-এর আগে নাস্তা করতে গেলে খিদে মরে যাবে। খেলাটাই মাটি হবে শেষে। কিছুতেই শোনে না।'

'কি জানি, আমার ভুলও হতে পারে,' কিশোর বলল। 'এই লোক নাও

হতে পারে। টাট্টু আঁকা টাকমাথা অন্য কোন লোককে দেখেছি হয়তো।'

'আরে নাহ, ওকেই দেখেছ। সারাক্ষণ খিদে লেগে আছে ওর পেটে, সারাক্ষণই খাই খাই। কিছুতেই আর শোধরাতে পারলাম না।'

ডক্টরের দিকে তাকাল রবিন। 'কি যেন নাম বললেন ওর? হকু...হকু...'

'হকুবামফট্টা। নাম উচ্চারণে কষ্ট হলে শুধু হকু বলে ডাকলেই চলবে।'

'হ্যাঁ, আপনার এই মিস্টার হকুবামও কি বডি কন্ট্রোল প্র্যাকটিস করেছেন?'

'না, তা করেনি। কয়েকটা সহজ বিদ্যা শুধু ওকে শিখিয়ে দিয়েছি আমি। তার মধ্যে একটা, ফুটন্ত পানির চৌবাচ্চায় ডুবে থাকতে হয় কিভাবে।'

'এত খিদে কেন ওর? কাঁচা মাছ জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলে!'

'এটা একধরনের রোগ। জোর করে কাউকে এ রকম খাদক বানানো যায় না। সার্কাসের ভাষায় এদের বলে গীক।'

'কি বলে?' জিজ্ঞেস করতে গিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ফেলল মুসা।

'গীক। সর্বভুক।'

'জ্যান্ত মাছ খায়!'

'শুধু মাছ না, সবই খায়। জ্যান্ত প্রাণী, মরা প্রাণী, পোকামাকড়...সব।'

ভয়ে ভয়ে হকুর দিকে তাকাল মুসা। কিন্তু গোবেচারা মুখটা দেখে মোটেও রাক্ষস মনে হলো না লোকটাকে। বরং কেমন নিরীহ, বোকা বোকা একটা ভাব। অনেকটা প্রতিবন্ধীদের মত।

'মানুষের মাংস খায় না?' মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলল রবিন। হকুর দিকে তাকাল।

জবাবে ঠোঁট দুটো সামান্য বাঁকা হলো লোকটার। কথা বলার চেষ্টা করল। পারল না। কেঁপে কেঁপে থেমে গেল ঠোঁটজোড়া।

রহস্যময় কণ্ঠে রোজালি বলল, 'কারও প্রশ্নের জবাব দেয় না হকুবামফট্টা। নিজেই একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। চলন্ত এক ধাঁধা, মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয়া রহস্য, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। দর্শকদের সামনে যখন হিউম্যান পিরানহার খেলা দেখায় ও, কত লোক যে তাঁবু ছেড়ে পালিয়ে যায়। সবারই প্রশ্ন, এ রকম অমানবিক কাণ্ড পারে কিভাবে ও?'

'হবেই,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, প্রশ্নটা তো আমারও,' ওর সঙ্গে সুর মেলাল কিশোর। 'এই খাওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে কোন ফাঁকিবাজি নেই। সকাল বেলা নিজের চোখেই তো দেখলাম।'

আবার হাসি ছড়িয়ে পড়ল ডক্টরের সারা মুখে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওহ্হো, কি ভুলো মন আমার! মেহমানদের খাতির করার কথাও মনে থাকে না। একটু নাস্তার ব্যবস্থা অন্তত করা দরকার।'

টেবিলের ওপর থেকে একটা কাঁচের বয়াম তুলে নিয়ে এল সে।

বাড়িয়ে ধরল গোয়েন্দাদের দিকে।

'কি আছে এটাতে?' সন্দেহভরা চোখে বয়ামটার দিকে তাকাল রবিন।

'খুব ভাল জিনিস,' হেসে বলল ডক্টর। 'অনেক দামী খাবার।'

'কিন্তু আছে কি ওতে?'

'ঝিঁঝি পোকা। গতকাল ধরা হয়েছে বন থেকে। ধরার পর পরই নিয়ে আসা হয়েছে আমার কাছে। অনেক দাম দিয়ে কিনেছি। হকুর জন্যে রাখতে হয়। সার্কাসে কুড়মুড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে দেখায় দর্শকদের।'

ধাক্কা খেয়ে যেন পিছিয়ে গেল রবিন। ওয়াক ওয়াক করা বাকি রাখল।

কিন্তু নির্বিকার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল মুসা, 'দিন। দেখেই চনমনিয়ে উঠেছে পেট। এত খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারিনি।'

ডক্টরের হাত থেকে বয়ামটা নিয়ে ঢাকনা খুলল। একটা পোকা বের করে ছুঁড়ে ফেলল মুখে। চিবিয়ে গিলে ফেলল। মুখ ল্যাগিয়ে বয়ামটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'খুব স্বাদ। ইচ্ছে করছে সব খেয়ে ফেলি। কিন্তু হকু বেচারা আবার খাবে কি তাহলে...'

ঝকঝকে সাদা দাঁতের একটা ঝলমলে হাসি ডক্টরকে উপহার দিয়ে, তার মুখের আত্মতৃপ্তির হাসি পুরোপুরি মুছিয়ে দিয়ে, হাঁটতে শুরু করল সে।

মুসার কাণ্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে কিশোর আর রবিন। খাওয়ার ব্যাপারে ওর কোন বাছবিচার নেই, জানা আছে ওদের। কিন্তু তাই বলে জ্যান্ত ঝিঁঝি পোকা!

'অ্যাই, মুসা, দাঁড়াও!' হাত তুলে ডাকল কিশোর। ডক্টরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল।

থামল না মুসা। এগিয়ে চলেছে। দ্রুত তার পাশে চলে এল কিশোর। রবিন এখনও অনেক পেছনে।

'ঝিঁঝি পোকাও খেতে পারলে!' ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর।

'প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে আটকা পড়ে কাঁচা শুঁয়াপোকাও তো খেয়েছি। ঝিঁঝি সেই তুলনায় রসগোল্লা। শিক্ষা দিয়ে এলাম একটা ডক্টরকে। আমাদের চমকে দিয়ে মজা পাওয়া ওর বের করে দিয়েছি।'

কিছুদূর এসে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। ফিরে তাকাল। ডক্টর আর দেখতে পাবে না বুঝে দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, একটা জাদু দেখুন।' পকেট থেকে বের করে আনল ঝিঁঝি পোকাটা। জ্যান্ত। হাসল বিমূঢ় হয়ে যাওয়া রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে। 'পেট থেকে পকেটে চালান করে দিয়েছি। দেখলেন তো, মরা জিনিস বাঁচানোর কি অসাধারণ ক্ষমতা আমার?'

'এই হাতসাফাইটা শিখলে কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমার এক চাচার কাছে। অ্যামেচার ম্যাজিশিয়ান। সে শিখে এসেছিল আফ্রিকান এক ওঝার কাছে। দারুণ দারুণ সব ম্যাজিক জানে।

খুব সহজটা কেবল শিখতে পেরেছি আমি।'

'সহজটা দিয়েই তো চিত করে দিয়েছ ডক্টর রোজালির মত ত্যাঁদড়কেও। কঠিনগুলো দেখাতে পারলে তো খাবি খেত এতক্ষণে।'

'তার কোন কিছুই ম্যাজিক কিংবা বডি কন্ট্রোল নয় বলতে চাও?'

'ম্যাজিক নয়, এটা ঠিক। বডি আর মাইন্ড কন্ট্রোল করে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। তবে ডক্টরের বেশির ভাগই ভাঁওতাবাজি।'

'ফুটন্ত পানি থেকে বেরিয়ে আসাটাও? টগবগ করে পানি ফুটছিল, পরিষ্কার দেখলাম। পানিতেই বা এতক্ষণ ডুবে থাকল কি করে হুকু?'

'যত কারসাজি ওই চৌবাচ্চার মধ্যে। পানির মধ্যে কোন মেশিন ফিট করা আছে, যেটার সাহায্যে পানিকে এমনভাবে আলোড়িত করা যায় যে মনে হয় ফুটছে। চৌবাচ্চার মধ্যে পানিতে শ্বাস নেয়ার যন্ত্রও আছে, গিয়ে দেখোগে। তলাটা দুটো স্তরে তৈরি করে ফাঁপা জায়গায় কম্বল বা ওরকম কিছু ঠেসে পুরে দিয়েছে, যাতে সহজে গরম না হয়। পানি বেশি গরম হওয়ার আগেই হুকুকে বের করে এনে দর্শকদের চমকে দেয়। খেলা তো আর কম জানে না। চমকের পর চমক। সেই সঙ্গে কথার ফুলঝুরি। চমৎকার অভিনয়। কাউকে চিন্তা করারই সুযোগ দেয় না।'

'হুঁ,' রবিন বলল, 'ম্যাজিক জিনিসটাই হচ্ছে লোকের চোখে ধাঁধা লাগানোর খেলা।'

'এখানে তো দেখছি সবই ফিজি মারমেড!' মুসা বলল, 'বার্বি নুনের খুনটাও কোন ধাপ্পাবাজি নয় তো? আসলে হয়তো মরেইনি সে।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'ওটা পুরোপুরি বাস্তব, কোন সন্দেহ নেই তাতে। ঘরের রক্ত, জানালার রক্ত, আর এই...' পকেট থেকে একটা পেরেক বের করল সে, 'এই পেরেকের রক্ত যে আসল রক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাতে ডক্টর রোজালির রক্ত লেগে আছে...'

'তবে না বললে ফাঁকিবাজি?'

'ও ফাঁকিবাজিই করছিল। খুলে আনার ছুতোয় আমি ইচ্ছে করেই খোঁচা মেরে দিয়েছি। যাতে রক্ত বেরোয়।'

'তারপর এটা মেরে দিয়েছ,' হাসতে হাসতে রবিন বলল। 'রোজালির রক্ত পরীক্ষার জন্যে। বাপরে, কেউ দেখি কম যায় না! সবার চাচাই অ্যামেচার ম্যাজিশিয়ান!'

দশ

'এই পেরেকটা দিয়েই হয়তো গেঁথে ফেলা যাবে ডক্টর রোজালিকে,' কিশোর বলল। 'পরীক্ষা করে দেখতে হবে জানালার রক্ত আর এই রক্ত এক কিনা। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাব।' সাবধানে পেরেকটা পরিষ্কার একটা রুমালে জড়িয়ে পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'আমার সঙ্গে যাবে তোমরা?'

'তুমি যাও,' রবিন বলল। 'এই সার্কাসের জগৎটা অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। আরেকটু ভালমত দেখতে চাই।'

'কোথায় গিয়ে দেখবে?'

'মেইন স্ট্রীটে একটা সার্কাস মিউজিয়াম দেখেছি, ওখান থেকে শুরু করব।'

'ভাল বুদ্ধি। তথ্য জোগাড় করা দরকার। কোনখান থেকে যে খুনীকে ধরার সূত্র বেরিয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না। মুসা, তুমি কি করবে?'

'তোমার সঙ্গে যাব। এই সার্কাসের জগৎ ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে আমার। সব পাগল!'

'খবরদার, এ সব কথা কারও সামনে বোলো না। খুন হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি যাই,' রবিন বলল। 'রাতে ট্রেলারে দেখা হবে।'

হাঁটতে শুরু করল সে। বিগ টপ মোটর ইনের ট্রেলার পার্কের দিকে এগোল।

পথে নানা রকম লোকের সঙ্গে দেখা। একজায়গায় একদল লোক একজনের ওপর আরেকজন উঠে একটা পিরামিড তৈরি করেছে। খানিক দূরে একজন লোক আরেকজনকে বোর্ড ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দূর থেকে তার চারপাশে ছুরি ছুঁড়ে মারছে। খুদে বামন মানুষদের একটা দল ছোট একটা গাড়িতে ঢোকা আর বেরোনো প্র্যাকটিস করছে। রবিনকে দেখে থেমে যাচ্ছে সবাই। অবাক চোখে দেখছে ওকে। যেন অদ্ভুত কোন প্রাণী হেঁটে যাচ্ছে ওদের পাশ দিয়ে।

মেইন স্ট্রীটে এসেও একই অবস্থা। সার্কাসে স্টংম্যানের কাজ করে, দৈত্যাকার এ রকম একজন লোক দুহাতে মুদির জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবিনকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তার পেছনে একজন মহিলা, তিনটে হাত তার, প্রতিটি হাতে একটা করে বাজারের ব্যাগ ঝোলানো। সে-ও অবাক চোখে রবিনকে দেখল। একই কাণ্ড করল পেট থেকে বেরিয়ে আসা এক পাওয়ালা আরেকজন লোক।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। এই শহরে বিকৃত মানুষেরা স্বাভাবিক, খুঁতহীন মানুষ ওদের কাছে অস্বাভাবিক। সবাই এক রকম আর নিজে অন্য রকম হলে মানসিক যন্ত্রণাটা কেমন হয় বুঝতে পারছে এখানে এসে।

দ্রুত রাস্তা পার হয়ে মিউজিয়ামের সামনে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেতরে, লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে চায়।

বাইরে থেকে মিউজিয়ামটাকে মনে হলো বহু পুরানো, জীর্ণ-মলিন, গাঁয়ের একটা মুদিখানা। সদর দরজার ওপরে ঝোলানো বড় সাইনবোর্ডে লেখা: দি অডিটরিয়াম।

কয়েকটা বাক্স ঝোলানো রয়েছে দরজার পাশে। ওগুলোর গায়ে বড় করে লেখা: চাঁদার বাক্স। তার নিচে আরেকটু ছোট করে লেখা: ফ্রিকসদের ঢুকতে পয়সা লাগবে না। বাকি সবাই চাঁদা দিয়ে ঢুকুন।

গিবসনটনে আমি কি ফ্রিকস, না স্বাভাবিক মানুষ?—ভাবল রবিন। রাস্তায় লোকেরা যেভাবে তাকিয়েছে, নিশ্চয় ওকে এখানে ফ্রিকস ধরা হবে। তারমানে ঢোকার জন্যে পয়সা দিতে হবে না। কিন্তু ঝুঁকি নিল না সে। দুটো ডলার বের করে ফেলে দিল একটা বাক্সে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই কোথায় যেন একটা বেল বেজে উঠল। কালো স্যুট পরা একজন বুড়ো মানুষ এগিয়ে এল তার দিকে।

'আমার মিউজিয়ামে স্বাগতম,' সেই একই রকম নাটকীয় ভঙ্গি, নাটকীয় ভাষা। এখানে সবাই যেমন করে কথা বলে এ লোকটাও তার ব্যতিক্রম নয়। 'কোন প্রশ্ন আছে তোমার? জবাব শোনা দরকার?'

প্রথমেই যে প্রশ্নটা রবিনের মনে এল তা হলো—আপনার মুখের এই অবস্থা কেন? যেন গরমে গলে যাওয়া মোম শুকানোর পর এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। জন্মগত ভাবেই ওরকম বিকৃত, নাকি কোন ভয়ানক দুর্ঘটনার ফল? গায়ের রঙই বা এমন মোমের মত কেন? কোন ধরনের আজব রোগ?

এ ব্যাপারে একটা প্রশ্নও করল না সে। ম্যাডের সঙ্গে কথা বলেই শিক্ষা হয়ে গেছে, গিবসনটনে এ ধরনের প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' নাটকীয় করেই বলার চেষ্টা করল রবিন, 'প্রশ্ন আমার অনেক আছে। তবে সবার আগে দেখতে চাই আপনার মিউজিয়াম।'

'ঠিক আছে, মেহমান হয়ে যাও আমার, এবং আমি তোমার গাইড।'

প্রথমে একটা দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল ওকে বুড়ো। বড় বড় সাদা-কালো ছবি সাঁটানো রয়েছে। সব এই শতকের গোড়ার দিককার।

ছবিগুলো কোনটা কার যেন মুখস্থ বলে যেতে শুরু করল বুড়ো, 'এ হলো প্রিন্স র‍্যানডিয়ান, দা হিউম্যান টরসো। এর নাম ফ্র্যাঙ্ক লেনটিনি, তিন পাওয়ালা মানব। এই ছবিটা টক্কি ভাইদের। দুজন লোকের জোড়া লাগানো শরীর, মাত্র একজোড়া পা। আর এই যে, এরা হলো চ্যাং আর এং, একমাত্র খাঁটি সিয়ামিজ টুইন।'

চ্যাং আর এং-এর লাইফ-সাইজ ছবির সামনে রাখা একটা টেবিলে একগাদা পুস্তিকা।

একটা তুলে নিয়ে রবিনের হাতে দিল বুড়ো। অনুরোধ জানিয়ে রাখল, 'সময় করে পড়ে দেখো। আমার লেখা।'

বইটার নাম: দি ফ্যাসিনেটিং ট্রু লাইফ স্টোরি অভ দা অরিজিনাল সিয়ামিজ টুইনস।

'আপনার বইয়ের নাম দেখেই বুঝতে পারছি চমৎকার জীবন ছিল ওদের,' রবিন বলল।

খুশি হলো বুড়ো। 'কিন্তু মৃত্যুটা ছিল ভারী মর্মান্তিক। বিশেষ করে এঙের। আঠারোশো চুয়াত্তরে জানুয়ারির এক শীতের সকালে এং ঘুম থেকে উঠে দেখে রাতের বেলা মারা গেছে তার ভাই। কয়েক ঘণ্টা পর সে-ও পৃথিবীর মায়া কাটাল।'

'তাই নাকি!' কণ্ঠের বিস্ময় পুরোপুরি চাপা দিতে পারল না রবিন। 'মর্মান্তিক কোথায়? এ তো বরং বেঁচে গেল এং!' বলেই বুঝল ভুল কথা বলে ফেলেছে।

মুহূর্তে বদলে গেল বুড়োর চেহারা। শক্ত থাবা দিয়ে রবিনের কাঁধ চেপে ধরল, 'মর্মান্তিক নয়!' রুক্ষ হয়ে গেছে কণ্ঠ, 'তুমি যদি জেনে যাও তোমার শরীরের অর্ধেকটা মরে গেছে, বাকি অর্ধেকটা নিয়ে তুমি নড়তে পারবে না, খেতে পারবে না, কিছুই করতে পারবে না, কেমন লাগবে তখন?'

'খুব খারাপ,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল রবিন।

কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল বুড়ো। 'হ্যাঁ, খুব খারাপ।'

'চ্যাঙের মৃত্যুর কারণটা কি ছিল?' সাবধানে আবার প্রশ্ন করল রবিন।

'মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ।'

'আর এঙের?'

'আতঙ্ক।'

নিজের অজান্তেই গায়ে কাঁটা দিল রবিনের। প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বুকহেড আর গীকদের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?'

'বুকহেডরা হলো সার্কাসের ওস্তাদ খেলোয়াড়। নানা রকম অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে।'

'আর গীক?'

'ওরা? নামকা ওয়াস্তে থাকে। সার্কাসে ওদের নাম তালিকার সবচেয়ে নিচে। পেশায় গ্যাফদের কাছাকাছিও যেতে পারে না।'

'গ্যাফ কারা?'

আরেকটা ছবির দিকে আঙুল তুলল বুড়ো। কোমরের কাছে জোড়া লাগানো দুটো মানুষ, এক জোড়া পা।

'সিয়ামিজ টুইনদের মতই তো,' রবিন বলল।

হাসিমুখে বুড়ো বলল, 'দেখো ভালমত। একেকজনের একেক রকম। সিয়ামিজ টুইনদের চেহারা হয় দুই ভাইয়ের প্রায় একরকম। এই দুজন সিয়ামিজ টুইন নয়, টুইন সেজেছে। ভালমত দেখলেই বুঝতে পারবে। এদের বলে গ্যাফ।'

আরও কাছে থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিটা দেখে মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ, এবার বুঝেছি। একজন তার পা দিয়ে আরেকজনের কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঢোলা প্যান্ট পরেছে, যাতে কোমরের কাছে ফুলে থাকাটা তেমন বোঝা না যায়। সার্কাসে কি এ ধরনের ধাপ্পাবাজি সব সময়ই চলে?'

'সব সময় চলে কিনা জানি না, তবে বিখ্যাত কিছু ধাপ্পাবাজির ঘটনা ঘটেছে।'

'যেমন ফিজি মারমেড।'

জবাবে শব্দ করে হাসল কেবল বুড়ো।

'আচ্ছা,' অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করে বসল রবিন, 'হ্যারি নাইটের

খুনের ব্যাপারে কিছু জানেন?'

ভুরু কুঁচকে ফেলল বুড়ো। 'মানে?'

'আমার পরিচয়টা দিয়েই নিই, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আমি গোয়েন্দা, ওই খুনের তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে। কাল রাতে আরও একজন খুন হয়েছে, বার্বি নুন, শুনেছেন বোধহয়। ওদের খুনের ব্যাপারে কোন তথ্য পেলে তদন্ত করতে সুবিধে হত আমার।'

'তোমার কি ধারণা আমি খুন করে এসেছি?'

'না না, ছি ছি, কি যে বলেন! আপনি জ্ঞানী মানুষ, সার্কাসের অনেক কথা জানেন, সেজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না। জবাব দেবার ইচ্ছে না থাকলে দেয়ার দরকার নেই।'

কি ভাবল বুড়ো কে জানে। তবে হাসিটা আর ফিরে এল না মুখে। আরেকটা পুস্তিকা রবিনের হাতে তুলে দিল। এটার নাম: দি এগজটিক লাইফ অভ কুকি-টুকি, দা ডগ-ফেসড বয়।' বইতে ছেলেটার একটা ছবিও দেয়া হয়েছে। মুখটা লম্বা লোমে ঢাকা।

'হ্যারি নাইটের খুনের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' বুঝতে পারল না রবিন।

মুখ টিপে ব্যঙ্গ মেশানো হাসি হাসল বুড়ো। 'পড়েটড়ে তুমি নিজেই বের করে নাওগে। সূত্র তো দিয়েই দিলাম।'

'থ্যাংকস,' বলে আগের পুস্তিকাটা সহ দুটোই পকেটে ঢোকাল রবিন। 'আপনার যে কোন সাহায্য আমি খুশি হয়ে গ্রহণ করব।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো। নিচের ঠোঁট কামড়াল। কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মোম-গলা চেহারাটা নিয়ে এল রবিনের মুখের সামনে। 'ওই খুন কি করে হয়েছে জানতে হলে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে তোমাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল রবিন, 'কি?'

'এসো আমার সঙ্গে।'

আগে আগে পথ দেখিয়ে মিউজিয়ামের পেছনের একটা দরজার কাছে রবিনকে নিয়ে এল বুড়ো। বলল, 'কয়েক দিন আগে পি. টি. বারনুমের ব্যবহার করা কতগুলো জিনিস আমার হাতে এসেছে। সবাইকে সেটা দেখাই না। শুধু তাদেরকেই, যাদের খুব বেশি আগ্রহ। দেখার সাহসও আছে। বারনুম এর নাম দিয়েছিল গ্রেট আননোন। তোমার কি দেখার আগ্রহ এবং সাহস দুটোই আছে?'

'রহস্যের সমাধানে এটা সাহায্য করবে?'

'করবে।'

'তাহলে খুলুন আপনার দরজা।'

'তার আগে দুটো কাজ করতে অনুরোধ করব তোমাকে।'

'বলে ফেলুন। সব করতে রাজি আছি আমি।'

'এখানে যা দেখবে সেটা কাউকে বলতে পারবে না।'

'আমার সহকর্মীদেরও না?'

'তোমার আবার সহকর্মীও আছে নাকি?'

'আছে, দুজন। আমরা তিন বন্ধু মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম দিয়েছি তিন গোয়েন্দা। তিনজনে একসঙ্গেই এসেছি এ শহরে। ওরা দুজন আরেকটা জরুরী কাজে বেরিয়েছে।'

আবার ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবতে লাগল বুড়ো। চিন্তা-ভাবনা করে মাথা ঝাঁকাল, 'বেশ, তাহলে শুধু তোমার বন্ধুদের। আর কাউকে না।'

'যান, কথা দিলাম। বাইরের কাউকে বলব না। আর দ্বিতীয় কাজটা কি?'

'আরও বিশ ডলার চাঁদা দিতে হবে। জিনিসগুলো জোগাড় করতে অনেক খরচ হয়েছে আমার। এর কম দিলে পোষাবে না।'

পকেট থেকে টাকা বের করে বুড়োর হাতে গুঁজে দিল রবিন।

বিশটা ডলার পকেটে ভরল বুড়ো। তারপর দরজার ছিটকানি খুলে দিল।

কি আছে দেখার জন্যে প্রায় ছুটে গিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।

যেই সে ঢুকল, অমনি পেছনে দরজা লাগিয়ে দিল বুড়ো।

ছিটকানি লাগানোর শব্দ কানে এল রবিনের। বন্ধ ঘরে একাকী আটকা পড়ল গ্রেট আননোনের সঙ্গে।

এগারো

চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। ছোট একটা জানালাবিহীন ঘরে আটকা পড়েছে। মাথার ওপর ঝুলছে অতি অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব। অসংখ্য মাকড়সার জাল। কংক্রীটের দেয়াল ঘেমে যাওয়া শরীরের মত ভেজা, স্যাঁতসেঁতে। ভাপসা গন্ধ।

কবর মনে হচ্ছে ঘরটাকে। শিউরে উঠল রবিন।

ঘরে একটামাত্র জিনিস, অনেক পুরানো কাঠের বাক্স। ভেতরে বাতাস চলাচলের জন্যে গায়ে ফুটো করা। কঠিন মেঝেতে গাঁথা আঙটার সঙ্গে লোহার মোটা শেকল দিয়ে বাঁধা।

যাক, কফিন অন্তত নয় ওটা—ভেবে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করল রবিন। তাহলে ফুটো থাকত না। নিশ্চয় সার্কাসের স্ট্রংবক্স। দর্শকদের সামনে কোন মানুষকে ওর মধ্যে পুরে তালা লাগিয়ে দেয়া হত, কৌশলে বেরিয়ে আসার জন্যে। কাকে পোরা হত? বারনুম?

তালার দিকে তাকাল সে। ঝোলানো আছে জায়গামতই, তবে খোলা। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কাঁপা হাতে খুলে আনল তালাটা। হুড়কো সরিয়ে ডালা তোলার আগে দ্বিধা করল। ভেতরে কি দেখতে পাবে? কঙ্কাল-টঙ্কাল নেই তো?

কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো দ্বিধা আর ভয়। হাতের পেশী শক্ত

হয়ে উঠল তার। ধীরে ধীরে তুলতে শুরু করল ডালাটা। ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাতে লাগল বহুদিনের পুরানো মরচে পড়া কব্জা। কানে লাগছে বড় বেশি।

কোন কিছুই ডালা তোলা ঠেকাতে পারল না ওর।

ভেতরে উঁকি দিল।

কিছুই তো নেই! খালি বাক্স!

ঠিক এই সময় দেয়ালে জ্বলে উঠল লাল রঙের একটা নিয়ন লাইট। EXIT লেখা রয়েছে। ওটার আবছা আলোয় অস্পষ্টভাবে একটা দরজার চিহ্ন চোখে পড়ল ওর।

এতক্ষণে বুঝতে পারল রবিন, ঠকানো হয়েছে ওকে। ওর ওপর ফিজি মারমেডগিরি চালিয়ে দিয়েছে বুড়ো।

*

শব্দটা প্রথম কানে এল মুসার। থমকে দাঁড়াল। রবিনের ট্রেলারের নিচে খুটুর-খাটুর শব্দ হচ্ছে। ট্রেলারে আলো জ্বলছে। তারমানে ভেতরেই আছে রবিন। কিছু বলছে না কেন? ঘুমিয়ে আছে নাকি?

মুসাকে দাঁড়াতে দেখে কিশোরও দাঁড়িয়ে গেল। মস্ত চাঁদ উঠেছে পুবের আকাশে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোয় পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। দুজনের মনেই একটা কথা খেলে গেল—ট্রেলারের নিচে কেউ আছে।

কিশোর ভাবল—খুনীটা না তো? আগ্নেয়াস্ত্র পছন্দ করে না সে, কিন্তু এ মুহূর্তে একটা পিস্তল হাতে পাওয়ার বড় ইচ্ছে হলো। এগোতে ইশারা করল মুসাকে।

পা টিপে টিপে এগোল দুজনে।

ট্রেলারের কাছে পৌঁছে মাথা নিচু করে উঁকি দিতে যাবে, এই সময় নিচ থেকে বেরিয়ে এল ডাবসন ম্যাড। সামনে পড়ে গেল মুসা আর কিশোরের।

'ওখানে ঢুকেছিলেন কেন?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'রবিন জানে?'

তার কথার জবাব না দিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ম্যাড, 'দেখো তো ঠিক হয়েছে নাকি?'

কয়েক সেকেন্ড পর দরজায় বেরিয়ে এল রবিন। 'হ্যাঁ, এখন ঠিকমতই কাজ করছে সিংক। থ্যাংক ইউ।'

মাথা উঁচু করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে—বুঝলে তো কেন ঢুকেছিলাম?—এ রকম একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গটমট করে হেঁটে চলে গেল ম্যাড।

'কখন এলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এই তো,' জবাব দিল কিশোর, 'এইমাত্র। কি হয়েছিল?'

'পানি সরছিল না ঠিকমত,' দরজা থেকে সরে গিয়ে ওদের ঢোকার জায়গা করে দিল রবিন। মুসা আর কিশোর ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল,

'কি জেনে এলে?'

মুসা গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। বিছানার পাশে বসল কিশোর। বলল, 'জানালার রক্ত আর পেরেকের রক্ত একই গ্রুপের। ও পজটিভ। খুব সাধারণ গ্রুপ, সচরাচর দেখা যায়। তবে জানালার রক্তের ব্যাপারে একটা অদ্ভুত কথা বলেছে ল্যাবরেটরি অ্যাসিসট্যান্ট—রক্তের মধ্যে সাধারণত যে সব উপাদান থাকার কথা, তার অনেক কিছুই নাকি নেই ওতে। শুকিয়ে যাওয়ায় কিংবা নমুনা সংগ্রহে গোলমাল থাকার কারণে রক্তের উপাদান নষ্ট হতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করেছি। সন্দেহ প্রকাশ করল অ্যাসিসট্যান্ট।

'রোজালির ব্যাপারেও খোঁজখবর নিয়েছি। ওর আসল নাম প্রিক হেনরি। ইয়েমেনে বড় হয়নি, মিলওয়াওকিতে মানুষ। কোন ধরনের ডক্টরেট নেই তার, নিজেই নিজের বানানো নামের আগে শব্দটা বসিয়ে নিয়েছে। আর ওর সহকারী হকুবামফট্টার নামের সঙ্গেও ফট্টা শব্দটা যোগ করে দিয়েছে ভারী আর অন্যরকম করে তোলার জন্যে। টেকো দানবটার আসল নাম হকু বাম।'

'ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে?'

'না। তবে ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গের অপরাধে রোজালিকে জরিমানা দিতে হয়েছে বার দশেক। ওর খোঁজখবর নেয়া শেষ করে এখানকার অন্যান্য খেলোয়াড়দের দিকে নজর দিলাম। এ কাজে শেরিফ রিওমার আমাদের সহায়তা করেছেন। কারও বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। সবাই পরিষ্কার।'

কথা শেষ করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার কি খবর?'

'আর কি! ধাপ্পাবাজির শিকার হলাম। এখানকার যা রীতি।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'তবে পুরোপুরি ঠকায়নি মিউজিয়ামের বুড়ো। একটা ইনটারেস্টিং বই দিয়েছে।'

কাত হয়ে শুলো মুসা। 'কি লেখা?'

'আলবেনিয়ার বনাঞ্চলে উনিশশো তেত্রিশ সালে একা একা একটা ছেলেকে ঘুরতে দেখে তুলে নিয়ে আসে এক শিকারী। বনে খাবার জোগাড় করতে কোন অসুবিধে হত না ছেলেটার, কিন্তু কথা বলতে পারত না। কোন ভাষা জানত না...'

'দারুণ তো!' কনুইয়ে ভর দিকে মাথা উঁচু করল মুসা। 'তুলে না আনলে এতদিনে টারজান হয়ে যেত ছেলেটা। অবশ্য বুড়ো টারজান...'

'ছেলেটাকে নিয়ে আসা হলো এই এলাকায়। আধাজন্তু আধামানুষের মত ছিল তখন দেখতে। একটা খাঁচায় ভরে তালা দিয়ে রাখা হলো ওকে। তাল তাল কাঁচা মাংস ছিঁড়ে খেয়ে সার্কাসের দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিত। একদিন পালিয়ে গেল সে। বহুদিন আর কোন হদিস নেই। তারপর আবার ফিরে এল গিবসনটনে। মজার ব্যাপার হলো, গিয়েছিল কুকি-টুকি হয়ে, ফিরে এসে হলো আইনের রক্ষক। পর পর চারবার শেরিফ হয়েছে নিজের

যোগ্যতা প্রমাণ করে।'

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা, 'শেরিফ রিওমার নাকি!'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'শেরিফ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল কুকি-টুকি ওরফে কুকুরমুখো বালক।'

মিউজিয়াম থেকে নিয়ে আসা পুস্তিকাটা বের করে কিশোরের হাতে দিল রবিন।

সরে এসে মুসাও তাকাল কভারে আঁকা কুকুরমুখো বালকের ছবিটার দিকে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'আশ্চর্য! বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়!'

'করো আর না-ই করো, শেরিফ রিওমারই সেই কুকুরমুখো বালক,' রবিন বলল। 'বুড়োর কাছে জানতে চাইলাম, হ্যারি নাইটের খুনের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা। তখন এই বইটা দিয়ে বলল, এর মধ্যে সূত্র আছে, বের করে নিতে।'

ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলল কিশোর। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তারমানে আমাদের সন্দেহের তালিকায় আরও একটা নাম যোগ করে দিল?'

'খাইছে!' সরে বসল আবার মুসা। 'শেরিফকেও সন্দেহ?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না! বইটা দেয়ার মানে শেরিফকে ইঙ্গিত করা। কোন কারণ না থাকলে কেন এ কাজ করতে যাবে বুড়ো?' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো, এখনই দেখা করব শেরিফের সঙ্গে।'

'এখন? এই রাতের বেলা?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'অসুবিধে কি? শেরিফ তো আর ভূত নন যে রাতে গেলে বিপদে ফেলে দেবেন।'

'এখানকার মানুষগুলো সব ভূতেরও বাড়া! চেহারা যেমন উদ্ভট, স্বভাব-চরিত্রও...'

'চুপ! আস্তে!' তাড়াতাড়ি বাধা দিল রবিন। 'কে কোনখান থেকে শুনে ফেলবে, শেষে পড়ব আরেক বিপদে!'

❋

ঘণ্টাখানেক পর শেরিফের বাড়ির পেছনে ঝোপের আড়ালে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

চাঁদের আলোয় অদ্ভুত লাগছে শেরিফকে। বিশালদেহী রোমশ এক গরিলা যেন। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন। অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল মুসার। মনে হলো, কারও জন্যে কবর খুঁড়ছেন তিনি।

খোঁড়া শেষ করে কোদালটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। নিচু হলেন মাটি থেকে কিছু তুলে নেয়ার জন্যে।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। কি করছেন শেরিফ, কিছু বুঝতে পারছে না সে-

ও।

ঘাসের মধ্যে থেকে বড় একটা ছুরি তুলে নিয়েছেন তিনি। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল ওটার ধারাল ফলা। ছুরি দিয়ে কি যেন কেটে হাতে ডললেন। তারপর কাটা জিনিসটা গর্তে ফেলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিলেন আবার গর্তটা।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে তাকালেন চাঁদের দিকে। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে বেলচাটা তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন ঘরের দিকে।

'কি বুঝলে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'যা বুঝলাম সেটা বলতে চাই না,' রহস্যময় কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'শেরিফ যা করলেন, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু ইনডিয়ানদের শত শত বছরের বিশ্বাস, এতে নাকি কাজ হয়।'

'কি করে বুঝলে এ জন্যেই করেছেন?'

'চাঁদনি রাত। পূর্ণিমা। এ ছাড়া আর কোন কারণই থাকতে পারে না। অত কথা না বলে গিয়ে দেখলেই তো প্রমাণ হয়ে যায়।'

হাঁ করে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিন আর কিশোর যে কি নিয়ে আলোচনা করছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'গ্রীক ভাষা বলছ নাকি?'

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘরের দিকে তাকাল কিশোর। ভেতরে ঢুকে গেছেন শেরিফ। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটার দিকে এগোল সে। অন্য দুজন অনুসরণ করল তাকে।

গর্তের মাটি আলগা হয়ে আছে। আঙুল দিয়েই খুঁড়ে ফেলল সে। কয়েক মিনিট পর বলল, 'পেয়েছি জিনিসটা। এই যে দেখো, যা সন্দেহ করেছিলাম...'

কথা শেষ হলো না তার। শক্তিশালী টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে। চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

চোখে আলো সয়ে এলে ওরা দেখল, শেরিফ দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে একটা ভয়ঙ্কর দর্শন .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল। গর্জে উঠলেন তিনি, 'কি করছ?'

গর্ত থেকে বের করা জিনিসটা তুলে দেখাল কিশোর। কাটা একটা কাঁচা আলু।

প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন শেরিফ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

প্রশ্নটা সহজ। কিন্তু জবাব দেয়া কঠিন মনে হলো কিশোরের কাছে।

রবিন বলল, 'শেরিফ, আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখতে এসেছিলাম আমরা।'

'কেন?' আবার একই প্রশ্ন।

'খুনী বেপরোয়া হয়ে পড়লে অনেক সময় আইনের লোকের দিকে নজর দেয়। ভাবে, বিশেষ কোন লোককে সরিয়ে দিতে পারলে পথের কাঁটা

দূর হবে। আমাদের মনে হয়েছিল, আপনার ওপর চোখ পড়তে পারে খুনীর। তাই আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখতে এসেছিলাম...'

রবিনের বানিয়ে বলা গল্প শুনে চমৎকৃত হলো কিশোর। কিন্তু মনে মনে হাসার সুযোগটাও তাকে দিলেন না শেরিফ। ধমকের সুরে বললেন, 'নজর রাখতে এসে গর্ত খুঁড়ছিলে কেন?'

কিশোর বুঝল, মিথ্যে বলে শেরিফকে ধোঁকা দেয়া সহজ হবে না। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আপনিই যে কুকুরমুখো বালক ছিলেন, আমরা জেনে গেছি, শেরিফ।'

পকেট থেকে পুস্তিকাটা বের করে দেখাল সে। ভেবেছিল, তার কথা শুনে একটা ধাক্কা খাবেন শেরিফ। সেরকম কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না তাঁর। বরং কভারে আঁকা ছবিটার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হাসলেন। 'দেখো, কি রকম রোগা ছিলাম তখন।'

'তারমানে আপনার ছবিই ঐটা,' এতক্ষণে উঠে দাঁড়ানোর সাহস করল কিশোর।

তার দেখাদেখি রবিন আর মুসাও উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, আমারই ছবি,' হাসতে হাসতে বললেন শেরিফ। 'জীবনের প্রথম অর্ধেকটা সময় আমি কুকি-টুকি হয়ে কাটিয়েছি। তারপর এক সকালে দেখি আমার মাথায় একটা গোল ছোট টাক। দিন কয়েক পর আরেকটা টাক দেখলাম। মুখের লোমও ঝরে যেতে লাগল। বুঝলাম, আমার সার্কাসের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে আসছে। চুল না থাকলে দর্শকদের আকৃষ্ট করব কি দিয়ে? চিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষে একদিন পালিয়ে গেলাম সার্কাসের জগৎ থেকে। ফিরে এলাম পুলিশ হয়ে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'মজাটা কি জানো? মুখের আর মাথার লোম সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় হলো, কিন্তু শরীরের লোম ঠিকই আছে। কাপড় খুললে মনে হয় শিম্পাঞ্জী। ভালই হয়েছে তাতে। মুখের চুল চলে না গেলে হয়তো কোন-দিনই সার্কাস ছাড়তাম না, শেরিফও হতে পারতাম না।'

রবিন বুঝল, পুস্তিকাটা দিয়ে তার সঙ্গে আরেকটা ফিজি মারমেডগিরি করল মিউজিয়ামের বুড়ো। যে-ই জানিয়েছে সে গোয়েন্দা, অমনি রসিকতা করার লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বুড়োর। কায়দা করে শেরিফের অতীতটা জানিয়ে দিল তাকে যাতে তাঁর ওপর ওর সন্দেহ হয়। পিছু নিতে গিয়ে বোকা বনে। ব্যাপারটা ভেবে নিশ্চয় মনে মনে খুব একচোট হেসেছে তখন বুড়ো। তেতো হয়ে গেল ওর মন। নাহ্, এখানকার কাউকেই আর ভাল ভাবতে পারছে না। সব ধাপ্পাবাজ। ধোঁকাবাজি ওদের পেশা, ধোঁকাবাজি ওদের নেশা...

মুসার কথায় ফিরে এল ভাবনার জগৎ থেকে।

'গর্তে কাটা আলু পুঁতে রাখার কারণটা কিন্তু জানতে পারলাম না এখনও,' শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'বলব?' দ্বিধা করলেন শেরিফ। 'ঠিক আছে, জেনে যখন গেছ, বলেই

ফেলি। হাতে আঁচিল হয়েছে আমার।'

'তার সঙ্গে আলুর সম্পর্ক কি?'

'ও, তুমি জানো না মনে হচ্ছে?' মুসার অজ্ঞতায় যেন অবাকই হলেন শেরিফ। 'আঁচিল দূর করতে হলে তোমাকে আলু কেটে তার রস ডলতে হবে ওখানে। তারপর কাটা আলুটা গর্তে পুঁতে রাখতে হবে পূর্ণিমার রাতে।'

'আপনি এ সব বিশ্বাস করেন!'

জবাব দিলেন না শেরিফ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের তদন্ত কতদূর এগোল?'

জবাব দিতে কিছুটা দেরি করল কিশোর। 'এগোয়নি। তবে আমার মন বলছে, সাংঘাতিক কোন ঘটনা ঘটবে খুব শীঘ্রি!'

বারো

চাপা, মৃদু একটা গরগর কানে এল হকু বামের।

প্রথমে ভাবল, পেটের গুড়গুড়। সব সময় পেট ডাকে তার। সারাক্ষণ খিদে, ভয়াবহ খিদে লেগেই আছে। দুনিয়ার কোন খাবারে অরুচি নেই। রসালো মোটাসোটা একটা তাজা ব্যাঙ, টিনভর্তি কিলবিলে বড় বড় কেঁচো, আর ঠোঁট, পালক, নখ সব সহ আস্ত একটা বড় মুরগী খেয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। অথচ ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে এখনই।

তবে এখনকার গরগর শব্দটা তার পেটের নয়।

এদিক ওদিক তাকাতেই চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল ডাবসন ম্যাডের খুদে কুকুরটা তার দিকে তাকিয়ে গজরাচ্ছে।

ওটার ওপর চোখ আটকে গেল তার। ঠোঁট চাটল। খিদেটা ভয়ঙ্কর ভাবে চাগিয়ে উঠতে শুরু করল পেটের মধ্যে। মনে করার চেষ্টা করল ডক্টর রোজালির উপদেশ: শো-এর আগে কিংবা পরে কখনোই কোন কিছু খাবে না! খাবে না! খাবে না!

আরও মনে পড়ল, আজ রাতে একটা জরুরী কাজ করে দেয়ার জন্যে তাকে এখানে পাঠিয়েছে ডক্টর। জরুরী! জরুরী! জরুরী!

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে মনিবের কথা সব মুহূর্তে ভুলে গেল হকু। পেটের গুড়গুড়ও শুরু হয়ে গেল। মগজে লোভের আগুন। ভাবছে কুকুরটার সুস্বাদু চামড়া, হাড়, চোখের মণি, রক্ত আর কচকচে লেজটার কথা। আহা, যদি ধরতে পারত! লালা গড়াতে শুরু করল মুখ থেকে।

গজরানো থামিয়ে দিল কুকুরটা। বদলে গেল চোখের দৃষ্টি। হকু বামের কুমতলব আঁচ করে ফেলেছে। একটা মুহূর্ত আর দাঁড়াল না ওখানে। ঘুরে লেজ গুটিয়ে দিল দৌড়।

পিছু নিল হকু বাম। কুকুরটা তার চেয়েও দ্রুত দৌড়ায়।

তাড়া করতে খারাপ লাগে না তার। বরং ভাল লাগে। এতে পেটের খিদে আর রুচি দুটোই বেড়ে যায়।

বিগ টপ মোটর ইনের দরজার নিচে ঢাকনা লাগানো একটা ফোকর। কুকুর ঢোকার পথ। এক ঠেলায় ঢাকনা সরিয়ে তীরবেগে ভেতরে ঢুকে গেল কুকুরটা।

মুহূর্ত পরে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। দরজার বাইরে ডোরম্যাটে দাঁড়িয়ে থাকা হকুর দিকে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল ডাবসন ম্যাড।

কুকুরটা এখন প্রভুর পেছনে দাঁড়িয়ে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। তবে ভীষণ সতর্ক। বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখলেই ঘুরে দেবে দৌড়।

'কতবার বলেছি তোমাকে,' ধমকে উঠল ম্যাড, 'র‍্যাট আমার পোষা কুকুর! ইঁদুর পাওনি যে ধরে খেয়ে ফেলবে। এই শেষ বলে দিলাম। আরেকবার সে চেষ্টা করেছ কি লাথি মেরে বের করে দেব ট্রেলার থেকে। মনে থাকে যেন!'

লজ্জায় বিরাট মাথাটা নুয়ে এল হকু বামের। মনে মনে ধমকাল নিজেকে—কেন সে এ সব কাণ্ড করে? কেন মনে রাখতে পারে না মহাজ্ঞানী, পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনিব ডক্টর রোজালির উপদেশ? কেন খাবার দেখলেই সব ওলট-পালট হয়ে যায় তার?

মুশকিলটা হলো, হকু বাম বোবা। কথা শোনে, বুঝতেও পারে, কিন্তু জবাব দিতে পারে না। মুখ তুলে ইশারায় ম্যাডকে কিছু বোঝাতে গিয়ে আবার চোখ পড়ল কুকুরটার দিকে। আবার ভুলে গেল সব। লোভাতুর দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল র‍্যাটের ওপর।

'এত রাতে কেন এসেছ?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল ম্যাড। 'বোকার হদ্দ রোজালিটার কি এটুকু সেন্সও নেই, যে রাতের বেলা তোমার মত একটা জানোয়ারকে ছেড়ে রাখা বিপজ্জনক?'

ডক্টরের নাম শুনেই উজ্জ্বল হয়ে গেল হকু বামের মুখ। কি জন্যে পাঠিয়েছে ওকে রোজালি মনে পড়েছে।

নেংটিতে গাঁথা এক টুকরো কাগজ খুলে নিল হকু বাম। হাতে দিলে হারিয়ে ফেলতে পারে, সেজন্যে একটা পিন দিয়ে গেঁথে দিয়েছে রোজালি। বলেছে কাগজটা ম্যাডকে দিয়ে আসার জন্যে।

পিনটা দেয়ার কথা বলেনি রোজালি। কিন্তু সেটা বুঝতে পারল না হকু বাম। যেহেতু মনিব দিয়েছে, সে ভাবল কাগজ আর পিন, দুটোই দিতে হবে।

'কি?' হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল ম্যাড। 'ও, ঠিক আছে। যাও। জলদি ট্রেলারে ফিরে যাও। আর কোন দিকে যাবে না এখন। বুঝলে?'

কথা যেন কানেই যায়নি হকুর। তাকিয়ে আছে ম্যাডের দিকে। ঠোঁট চাটল।

'আবার তাকাচ্ছ কেন ওর দিকে...' ধমকে উঠে হকুর মুখের দিকে তাকিয়েই একটা ধাক্কা খেল ম্যাড। র‍্যাটের দিকে নয়, ওর দিকে তাকিয়ে

আছে। মুখ থেকে লালা গড়াচ্ছে। ধক করে উঠল ম্যাডের বুক। তাড়াতাড়ি দরজাটা লাগিয়ে দিল সে। হাতের চেকটার দিকে তাকাল ভুরু কুঁচকে। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে কুকুরটাকে উদ্দেশ্য করে নিজেকেই বলল, 'বল্ তো; র‍্যাট, এত রাতে ট্রেলারের ভাড়া দিয়ে পাঠানোর মানেটা কি?...হুঁম, বুঝেছি...আমাকে আর তোকে খেয়ে ফেলার জন্যে...যাতে আর কোন দিন ভাড়া দিতে না হয়, বিনে পয়সায় থাকতে পারে...'

যেন মনিবের কথায় একমত হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আবার গজরাতে শুরু করল কুকুরটা।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাড। 'নাহ্, লোভ এখনও ছাড়তে পারেনি দেখছি রাক্ষসটা! ঘোরাফেরা করছে। ভাগানো দরকার।'

দরজার কাছে এগিয়ে এল সে। পাল্লা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাবির ফুটোর কাছে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'খবরদার, আমার কাছে পিস্তল আছে! আর দশ সেকেন্ড দেখব। এরপরও যদি থাকো, গুলি খেয়ে মরবে।'

তারস্বরে চিৎকার শুরু করল র‍্যাট।

'আরে থাম না! যা বলার আমিই তো বলছি!' কুকুরটাকে ধমক দিয়ে দরজার ফুটোর ঢাকনা সরিয়ে তাতে চোখ রাখল ম্যাড। বাইরে তাকাল। হুকুকে দেখতে পেল না।

ঠিক এই সময় তার গোড়ালি চেপে ধরল একটা হাত।

ঝট করে ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিচে তাকাল ম্যাড। কুকুর ঢোকার ফোকর দিয়ে হাতটা ঢুকে পা চেপে ধরেছে তার। টানতে শুরু করল।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ম্যাড। দুই হাত দরজায় ঠেকিয়ে গায়ের জোরে ঠেলতে লাগল। ছুটে গেল গোড়ালি চেপে ধরা হাতটা। ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

একটা মুহূর্ত নিথর হয়ে পড়ে থেকে মাথা তুলল। ফোকরটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারপর করতেই থাকল।

একসময় থেমে গেল চিৎকার।

নীরব রাতে থেকে থেকে ভেসে আসতে লাগল শুধু আতঙ্কিত র‍্যাটের চাপা কান্নার শব্দ।

❋

ট্রেলারের দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের।

সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। চোখ মেলতে ইচ্ছে করল না। ভাবল, শব্দটা দূরে চলে যাক। ওঠার চেয়ে ঘুমানো এখন অনেক আরামের।

কিন্তু গেল না শব্দটা। চিৎকার করে উঠল একটা কণ্ঠ, 'ওঠো! জলদি ওঠো! প্লীজ!'

টোবারন ড্যামের চিৎকার কানে ঢুকতে পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল কিশোর। আবার কোন খুনের খবর নিয়ে আসেনি তো? তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। সাড়া দিল, 'দাঁড়ান। খুলছি।'

সুইচ টিপে বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালল সে। চোখ ডলতে ডলতে বিছানা

থেকে নেমে স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে টবি। ঘর থেকে আলো এসে মুখে পড়েছে ওর। ফ্যাকাসে লাগছে চেহারাটা।

'কি হয়েছে? সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?' হাই তুলল কিশোর।

'না যেত না!' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে টবির। 'শেরিফকে খবর দিয়েই চলে এসেছি এখানে। মারা গেছে সে! আহারে! সব শেষ হয়ে গেল!'

এ রকম কোন খবরই আশা করছিল কিশোর, তাই বিশেষ চমকাল না। 'কে মারা গেছেন? শান্ত হোন। খুলে বলুন সব।'

রবিনদের ট্রেলারের দরজা খোলার শব্দ কানে এল।

'আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুটিই খুন হয়ে গেল! মিস্টার ম্যাড। আমি...আমি তাকে...' গলা ধরে এল টবির। আর বলতে পারল না। মাথা নাড়তে থাকল শুধু।

'দাঁড়ান! কাপড়টা বদলে আসি।'

দুই মিনিটে কাপড় পরে বেরিয়ে এল কিশোর। রবিন আর মুসারও বেরোতে দেরি হলো না।

টবিকে বলল কিশোর, 'চলুন। দেখান, কোথায় পড়ে আছে আপনার বন্ধু।'

'উফ, কেন যে দেখলাম!' ককিয়ে উঠল টবি। 'আমার না দেখাই ভাল ছিল। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না। ভয়ঙ্কর!'

'ঠিক আছে, আপনার সামনে যাওয়ার আর দরকার নেই। দূর থেকে আমাদের দেখিয়ে দিলেই চলবে।'

'এ রকম দৃশ্য তোমরাও আর দেখোনি! একবার দেখলে আর কোনদিন কোন লাশের দিকে তাকানোর ইচ্ছে হবে না...'

তেরো

অফিসের দরজার কাছে পড়ে আছে ম্যাড। সূত্র আছে কিনা দেখার জন্যে কাছাকাছি যেতেই হলো কিশোরকে।

শেরিফ বললেন, 'টবি বলেছে, ও যখন এল, দরজাটা বন্ধ ছিল। ওর কাছে বাড়তি চাবি আছে। সেটা দিয়ে তালা খুলে ঢুকেছে। প্রতিটি জানালা ভেতর থেকে ছিটকানি লাগিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। খোলা ছিল শুধু ওই কুকুর ঢোকার ফোকরটা।'

তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। মুসা ম্যাডকে একবার দেখেই আরেক দিকে মুখ ফেরাল।

ফোকরটার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল কিশোর। তারপর গিয়ে বসল লাশের পাশে। একবার দেখেই ডাক দিল, 'রবিন, দেখে যাও।'

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। 'কি?'

'এই দেখো। রক্তের দাগ। চেনা লাগছে না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বার্বি নুনের ঘরের মত।'

'আমি বুঝতে পারছি না, কোন ধরনের জীব সে, এ রকম একটা ছোট ফোকর দিয়ে ঢুকতে পারে?' ম্যাডের মুঠো হয়ে থাকা আঙুলগুলো চাপ দিয়ে সোজা করল কিশোর। হাতের তালুতে একটা হ্যাট-পিন। রক্ত লাগা একটা চেক পড়ে আছে বাহুর নিচে। বের করল সেটা। ডক্টর রোজালির নাম সই করা। পিনটা দেখিয়ে রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'এই জিনিসটা কোথায় দেখেছিলাম, মনে আছে?'

'থাকবে না মানে! তারমানে ওই ভণ্ডটাই খুনী! এত ছোট ফোকর দিয়ে ঢুকল কিভাবে? এসকেপ আর্টিস্টের পক্ষে কি এটাও সম্ভব?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, দর্শকের চোখে ধুলো দেয়া আর সত্যি সত্যি করে ফেলা এক জিনিস নয়। যত বিদ্যেই শিখে আসুক, এত ছোট ফোকর দিয়ে ওর সাইজের একজন মানুষ কিছুতেই ঢুকতে পারবে না...'

চিৎকার করে উঠল টবি। ফিরে তাকাল দুজনেই।

এককোণে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে একটানা মদ গিলে যাচ্ছিল টবি। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে দেখছিল গোয়েন্দারা কি করছে। হঠাৎ করেই যেন খেপে উঠল সে। দেয়ালে কিল মারতে মারতে প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বিলাপ করে কাঁদতে লাগল, 'ও ছিল আমার একমাত্র বন্ধু! আমার ভাই! ও যে মরে গেল, আমি এখন কি করব...হায় হায়রে!'

শান্ত করার জন্যে এগিয়ে গেল মুসা। কিন্তু তার আগেই টবির কাছে পৌঁছে গেলেন শেরিফ। বব্বিকে বাঁচিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরলেন ওকে। 'আরে থামো, থামো, করছ কি! ব্যথা পাবে তো!'

'পেলে পাব! আমার মরে যাওয়াই উচিত!'

'কিন্তু আমাদের তো কাজ করতে দিচ্ছ না। থামো। ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে রাখব কিন্তু।' ফিরে তাকিয়ে গোয়েন্দাদের বললেন, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মাঝেমধ্যেই এ রকম শুরু করে। নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে রাখি। মদ না পেলেই মাতলামি কমে যায়, সেরে ওঠে।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'আপনি ওকে নিয়ে যান। আমরা ডক্টর রোজালির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'যাবে? ও খুনী হয়ে থাকলে মস্ত বিপদে পড়ে যাবে কিন্তু।'

'বিপদকে ভয় পাই না। এ সব কাজে যে ঝুঁকি থাকে, জানি আমরা। বিপদে বহুবার পড়েছি, বেরিয়েও এসেছি।'

কিশোরের কথা বিশ্বাস করলেন শেরিফ। টবি যে রকম শুরু করে দিয়েছে, মাতাল অবস্থায় নিজের শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে বসতে পারে। তাকে আগে সামলানো দরকার। এক মুহূর্ত ভাবলেন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিস্তল চালাতে পারো?'

'শুধু পিস্তল না, আরও অনেক অস্ত্রই চালাতে পারি।'

'বেশ,' একহাতে টবিকে আঁকড়ে ধরে রেখে আরেক হাতে পকেট

থেকে একটা পিস্তল বের করে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন তিনি, 'এটা নিয়ে যাও। কাজে লাগতে পারে। আরেকটা কথা, কোন রকম ঝুঁকি নিয়ো না। নিজের ওপর আঘাত আসছে বুঝলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে। বাকিটা আমি সামলাব পরে।'

রবিন দেখল ম্যাডের লাশের দিকে তাকিয়ে আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কি ব্যাপার? নতুন কিছু দেখলে নাকি?'

'না। কাল রাতে অদ্ভুত কতগুলো স্বপ্ন দেখেছি, তার কথাই ভাবছি।'

'দুঃস্বপ্নের সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক?'

'খুনের নয়, খুনীর।' রবিনকে একটা ধাঁধার মধ্যে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো। রোজালিকে পাকড়াও করা যাক।'

*

'কাজ সেরে গিয়ে এখন বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে রোজালি,' ট্রেলারের কাছে দাঁড়িয়ে বলল রবিন। 'দেখছ না আলো নেই, কোন শব্দ নেই...'

দরজায় টোকা দিয়ে কিশোর ডাকল, 'ডক্টর রোজালি, দরজা খুলুন। আমি কিশোর।'

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল ভেতর থেকে, 'দরজা খোলা। ঢুকে পড়ো।'

'ও, তারমানে জেগেই আছে,' ফিসফিস করে রবিন বলল।

'চুপ!'

একটা ট্রেলারে একসঙ্গে এত লোকের জায়গা হবে না। রবিনকে বাইরে থাকতে বলে মুসাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। প্রয়োজনে মুসা পিস্তলটা ব্যবহার করতে পারবে।

বিছানায় শুয়ে আছে ডক্টর রোজালি। পেরেকের বিছানা। অনেকগুলো চোখা পেরেক উল্টো করে তক্তায় বসানো। সেগুলোর ওপর পিঠ দিয়ে দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছে।

ঢোক গিলল একবার কিশোর। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল অহেতুক। তারপর বলল, 'ডক্টর রোজালি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে শেরিফের অফিসে যেতে হবে। তিনি আপনাকে নিতে আমাদের পাঠিয়েছেন।'

'কেন?'

'জরুরী কথা আছে।'

'কিন্তু এখন তো যেতে পারব না। দেখছ না শেরিফের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ করছি আমি। পেরেকের বিছানায় শোয়া প্র্যাকটিস করছি। সব সময় এই প্র্যাকটিস হয় না।'

'কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে!'

হাত তুলে দেখাল রোজালি। দুই হাতে দুটো মাছ ধরার সুতো। দুমাথায় বাঁধা বড়শি তার বুকে গাঁথা। সুতোয় টান দিয়ে বলল সে, 'বুঝতে পারছি ছিপে আটকা পড়লে কতটা ব্যথা পায় ট্রাউট।'

'আপনি ব্যথা পাচ্ছেন না?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ইনডিয়ানদের সান ড্যান্স ধর্মোৎসবের বিকল্প বের করেছি আমি,' রোজালি বলল। 'বড়শিতে গেঁথে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিই। ব্যথা এতটাই অসহ্য হয়ে ওঠে, শরীর ছেড়ে তখন বেরিয়ে যাই আমি।'

'শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যান?' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'কোথায় যান?'

'ও তুমি বুঝবে না। মনকে সাফ করার এটা এক মস্ত উপায়। কিংবা বলা যায় আত্মাকে স্বাধীন করে দেয়ার।'

'আপনার স্বাধীনতায় বাধা দেয়ার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, ডক্টর রোজালি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর, 'কিন্তু হাজতে আপনাকে যেতেই হবে। গত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া খুনগুলোর ব্যাপারে আপনাকে কিছু প্রশ্ন আছে।'

'তুমি প্রশ্ন করার কে?'

'আপাতত আমি একজন আইনের লোক,' কোমরে ঝোলানো শেরিফের হাতকড়াটা দেখাল কিশোর। 'কিছুক্ষণের জন্যে শেরিফ আমাকে তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট করে নিয়েছেন। অপরাধীদের ধরার ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে।'

হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল রোজালির মুখ থেকে। 'কিন্তু আমার উকিলকে ছাড়া আমি কোন প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'কে আপনার উকিল?'

'আমি নিজেই।'

অতিরিক্ত বারনুমগিরি দেখানোর চেষ্টা করছে রোজালি। খালি কথার মারপ্যাঁচ। রেগে গেল কিশোর। কোমর থেকে হাতকড়াটা খুলে নিল। রোজালির একটা হাত চেপে ধরে টান মারল পেরেকের বিছানা থেকে তুলে আনার জন্যে।

'আমাকে হ্যান্ডকাফ লাগানোর অধিকার তোমাকে কে দিল?' গর্জে উঠল রোজালি।

'বললাম না, শেরিফ। আমি এখন গিবসনটনের অ্যাসিসট্যান্ট শেরিফ।'

কোনদিক দিয়ে যে কি ঘটে গেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিশোর দেখল হাতকড়ায় আটকা পড়েছে তার নিজের দুটো হাত। খিকখিক করে হেসে বলল রোজালি, 'আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল তোমার, খোকা। ভুলে গিয়েছিলে আমি একজন এসকেপ আর্টিস্ট। এখন বসে বসে আঙুল চোষো, আমি যাচ্ছি।'

কিশোরের বুকে জোরে এক ধাক্কা মেরে দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

ধাক্কা খেয়ে মুসার গায়ে গিয়ে পড়ল কিশোর। সে নিজে সামলে নিল বটে, কিন্তু মুসা চিত হয়ে পড়ে গেল পেরেকের বিছানাটায়।

আঁতকে উঠল কিশোর। পেরেকে গেঁথে গেল না তো মুসা! 'মুসা, ঠিক

'আছ তো তুমি? মুসা?'

হাতকড়া পরা অবস্থাতেই দুহাত বাড়িয়ে মুসাকে টেনে তুলতে গেল কিশোর। কিন্তু সে ধরার আগেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। চড়চড় করে গায়ের জ্যাকেটটা ছিঁড়ে আটকে রইল পেরেকের মাথায়।

'আইরিশ আগাছার তুলনা হয় না!' বিমূঢ়ের মত বলল মুসা। 'ভেতরে আগাছা ভরা শুনে কিনতে চাইনি। দোকানদার বলল, দেখতে ফোলা হলে কি হবে, অনেক কাজের। নিয়ে যাও। শীত তো ঠেকাবেই, বৃষ্টিতেও গা বাঁচাতে পারবে। পেরেকের মাথা থেকেও যে বাঁচতে পারব, এ কথা অবশ্য বলেনি।'

'কোথাও লাগেনি তোমার, সত্যি?'

'না, লাগেনি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খোলো।'

কিশোরের পকেট থেকে চাবি বের করে হাতকড়ার তালা খুলে দিল মুসা।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল দুজনে।

ডক্টর রোজালিকে দেখা গেল না কোথাও।

তিক্ত কণ্ঠে কিশোর বলল, 'আর পারা যাবে না। ট্রেলারের ভেতরেই আটকাতে পারলাম না ওকে, খোলা জায়গায় তো ধরার প্রশ্নই ওঠে না। সাংঘাতিক পিছলা!'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

মুসা বলল, 'ওর কথা বিশ্বাস করেছ, আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার কথা?'

'না...'

ছায়ার মধ্যে শব্দ শোনা গেল। কতগুলো গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল তিনটে ছায়ামূর্তি। কাছে এসে দাঁড়াল। ডক্টর রোজালিকে ধরে নিয়ে এসেছে রবিন আর শেরিফ। দুজন দুপাশে, রোজালি মাঝখানে।

কিশোরদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন, 'ট্রেলারের মধ্যে ওর বাগাড়ম্বর সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। বেরিয়ে দৌড় মারতে দেখে পিছু নিলাম। এই সময় দেখি শেরিফ আসছেন। রোজালি পালাচ্ছে তাঁকে বলতেই পিস্তল হাতে ছুটলেন তার পেছনে। বাপরে বাপ, দৌড়াতেও পারেন বটে শেরিফ!'

'হাতে কি তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

দুহাত তুলে দেখাল রবিন। দুটো মাছ ধরার সুতো ধরে রেখেছে। হ্যাঁচকা এক টান মারল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রোজালি। হেসে বলল রবিন, 'এগুলো ধরেই আটকে রেখেছি। একটু তেড়িবেড়ি করলেই ট্রাউট কি রকম ব্যথা পায়, মনে করিয়ে দেব।'

চোদ্দ

'এই জেল আমাকে আটকে রাখতে পারবে না!' রাগত স্বরে বলল রোজালি।

'সে দেখা যাবে,' শেরিফ বললেন। 'গিবসনটন জেলে তুমিই প্রথম এসকেপ আর্টিস্ট নও। তোমার চেয়ে বড় ওস্তাদকে ঢোকানো হয়েছে, পালাতে পারেনি।'

হাতকড়ার একটা রিঙ তাঁর কব্জিতে লাগানো, আরেকটা রোজালির কব্জিতে। রবিনের হাতে সুতো দুটো। পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে মুসা। একপাশে কিশোর। চারদিক থেকে ঘিরে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে রোজালিকে।

ঘরটা বেশি বড় না। শেরিফের অফিসে তাঁর ডেস্কের ঠিক পেছনেই মোটা শিক লাগানো হাজত। সেখানে ঢোকানোর আগে প্রশ্ন করার জন্যে একটা চেয়ারে বসতে দেয়া হলো রোজালিকে।

'হাজত থেকে পালানোর কথা বলিনি আমি,' সুর পাল্টাল রোজালি। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। বারনুমের পরে এতবড় ধাপ্পাবাজ আর গিবসনটনে এসেছে কিনা সন্দেহ। 'আমি বলতে চাইছি আমি নিরপরাধ। ঘটনাটা কাকতালীয়। ঠকানো হয়েছে আপনাদের।'

'তাই, না?' মুচকি হাসল কিশোর। 'ও ব্যাপারেও তো আপনিই ওস্তাদ।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রোজালি। 'তবে যাই হোক, আমাকে ধরে আনার জন্যে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়ে গেলে তোমরা। বেশিক্ষণ তো আটকে রাখতে পারবে না। সকালের কাগজেই দেখতে পাবে হেডিং—ভুল করে খুনের দায়ে এসকেপ আর্টিস্ট গ্রেপ্তার। এতে বরং পাবলিসিটিই হবে আমার।'

'ভুল, না? যদি প্রমাণ দেখাই?' পকেট থেকে ছোট একটা পলিথিনের ব্যাগ বের করল কিশোর। সেটা থেকে বের করল পিন আর চেকটা। 'এগুলো আপনার নয়, অস্বীকার করতে পারেন?'

'এগুলো!' হো হো করে হেসে উঠল রোজালি। 'অস্বীকার করতে যাব কোন দুঃখে? আমিই পাঠিয়েছিলাম, হুকুবামফট্টাকে দিয়ে।'

'এই ফট্টাফুট্টার স্টান্টবাজিগুলো ছাড়ুন। ওর নাম ফট্টা নয়, শুধু হুকু বাম। কেন পাঠিয়েছিলেন?'

'ট্রেলারের ভাড়া দিতে।'

'এত রাতে?'

'দেখো, আমি গরিব মানুষ। হাতে পয়সা পেলেই খালি খরচ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। তাই টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগে ভাড়া মিটিয়ে

দিতে চেয়েছিলাম। থাকার জায়গাটাই হলো আসল। আমাকে আর হুকু বামকে দেখতে পারত না ম্যাড। বের করে দেয়ার একটা ছুতোনাতা খুঁজছিল...'

রোজালি কথা শেষ করার আগেই হাজতের ভেতর থেকে একটা জোরাল গোঙানি শোনা গেল।

'কি ব্যাপার?' সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'এখানে কয়েদীকে টর্চার করা হচ্ছে নাকি? সাংঘাতিক বেআইনী। দাঁড়ান, বেরিয়েই আমি চিঠি লিখব আমার কংগ্রেসম্যানকে...'

'ফালতু কথা বাদ দাও তো!' ধমকে উঠলেন শেরিফ। 'কাউকে টর্চার করা হচ্ছে না। ও টবি। মদ খেয়ে বেহুঁশ। ধরে এনে ড্রাংক সেলে আটকে রেখেছি। চোখের সামনে নিশ্চয় এখন অসংখ্য সাপ আর হাতি দেখছে। মাতলামি কাটলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আগের চেয়ে জোরে আবার গুঙিয়ে উঠল টবি।

কি হয়েছে ওর দেখার জন্যে গিয়ে ইস্পাতের পাল্লার শিক লাগানো খুদে জানালা দিয়ে অন্যপাশে তাকাল কিশোর।

'ঘুম নেই ওর,' চিৎকার করে শেরিফকে জানাল সে। 'হার্ট অ্যাটাক হয়নি তো? ছটফট করছে খুব।'

'খুব ভাল,' বলে উঠল রোজালি, 'মরুক আগে! তারপর বোঝাব কত ধানে কত চাল। আদালতে ওর পক্ষে কেস লড়ব আমি নিজে...'

'থামো!' ধমকে উঠলেন শেরিফ। রোজালিকে হাজতে ঢুকিয়ে তালা দিলেন।

মুসা আর রবিন ততক্ষণে গিয়ে ফুটোয় চোখ রেখে টবিকে দেখছে।

ওদের দিকে পেছন করে বাংকে পড়ে গোঙাচ্ছে টবি। সরু একটা রক্তের ধারা বাংক থেকে নেমে মেঝে পার হয়ে অন্যপাশের দেয়াল বেয়ে উঠে ওপরের ছোট জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'হাজতের মধ্যেই টবিকে খুন করতে এসেছিল নাকি!' দেখায় এত ব্যস্ত ছিল গোয়েন্দারা, কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শেরিফ টের পায়নি। চাবির গোছা খুলে নেয়ার জন্যে কোমরে হাত দিলেন তিনি।

'কেউ ঢোকেনি,' ভারী গলায় বলল কিশোর, 'আমার ধারণা, বেরিয়ে গেছে।'

'কি বলছ তুমি, কিশোর?' রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'এখনও আমি শিওর না,' উত্তেজনা বাড়ছে কিশোরের, 'শিওর হব, যদি ববিকে না দেখি।'

'ববি!'

'হ্যাঁ, টবির ভাই। সার্কাসের পুরানো একটা পোস্টার দেখেছি আজ। টবি আর ববির প্রচুর বিজ্ঞাপন করা হয়েছে তাতে। খুব সামান্য সময়ের জন্যে টবির পেট থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে ববি। দৌড়াতে পারে। স্প্রিঙের মত লাফ দিতে পারে। খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠে যেতে পারে।

অসাধারণ ক্ষমতা ওই টিউমারের মত মানুষটার।'

'বলো কি! এত কিছু!' চমকে গেল রবিন। 'হাত-পা তো কিছু দেখলাম না...

চাবি দিয়ে তালা খুলে ফেললেন শেরিফ। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। হুড়মুড় করে তাঁর পেছনে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

সবার আগে টবির কাছে পৌঁছে গেল রবিন। টান দিয়ে চিত করে শোয়াল। ঘুমের মধ্যেই গোঙাচ্ছে লোকটা। নড়াচড়াতেও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল না।

পেটের মাঝখানে বিরাট এক গর্ত, যেখানে ওর সিয়ামিজ ভাইটা ছিল।

'ওহ্ গড,' আঁতকে উঠলেন শেরিফ, 'ওর ভাইটাকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে!'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ভাইটা নিজেই কেটে পড়েছে।'

বিমূঢ়ের মত গর্তটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম টিউমারটা ওর পেট থেকে বেরিয়েছে, হাত কিংবা পায়ের মত অবিচ্ছেদ্য একটা অঙ্গ...কিন্তু এ কি দেখছি!'

'ভাল করে দেখো,' টবির পেটের দিকে আঙুল তুলল কিশোর, 'ক্ষতটা চেনা চেনা লাগছে না? ইতিমধ্যে যে সব খুন হয়েছে, তাদের পেটেও এ রকম ক্ষত ছিল, যদিও এতটা গভীর নয় কোনটাই। পেটের মধ্যে গর্ত করে মেরে ফেলেছে ওদের ববি।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন শেরিফ। 'টবির মত তুমিও মাতাল হয়ে গেছ নাকি!'

'না, আমি খুব সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছি। কথায় কথায় আপনি সেদিন ভেরি স্পেশাল পিপলদের কথা বলেছিলেন। স্পেশালদের মধ্যে টবি আর ববি হলো আরও স্পেশাল। টবির পেটে এমন কোন যন্ত্র রয়েছে, যেটাতে পরগাছার মত আঁকড়ে থেকে বেঁচে আছে ববি। টবিরও তাতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। অন্য কোন স্বাভাবিক মানুষের পেটে ও এ রকমভাবে ভর করতে যায়—আমার ধারণা, তাই করতে চেয়েছে—আর তাতেই মারা গেছে মানুষগুলো, যেহেতু টবির মত অসাধারণ যন্ত্রটা নেই ওদের। থাকার কথাও নয়। কারণ স্বাভাবিক মানুষদের তো ববির মত একটা পরগাছাকে ঠাঁই দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। জন্মের আগে দুই ভাই মায়ের পেটে থাকতেই ববিকে বাঁচিয়ে রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রকৃতি।'

'এই উদ্ভট সম্ভাবনা তোমার মাথায় এল কি করে কিশোর!' বিস্ময় কিছুতেই কাটাতে পারছে না রবিন।

'স্বপ্নের মধ্যে।'

'স্বপ্ন তো সব গাঁজাখুরি...'

'কে বলল তোমাকে? স্বপ্নের মধ্যে জটিল রহস্য সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছে অনেক বড় বড় গোয়েন্দা, পড়োনি?'

'পড়েছি,' আস্তে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'মগজে গাঁথা থাকে সূত্র। সচেতন মন যেটা বের করতে পারে না, অনেক সময় ঘুমের মধ্যে অবচেতন মন মগজ হাতড়ে সেটা উদ্ধার করে আনে। আর তাতেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান পেয়ে যায় মানুষ...'

'আমার বেলায়ও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল কাল রাতে,' কিশোর বলল। 'অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। দুঃস্বপ্নে দেখা দিল টবি। বার বার আঙুল দিয়ে নিজের পেটের দিকে দেখিয়ে কি যেন বলতে লাগল। পরিষ্কারভাবে ওর কথা বুঝতে পারলে আজ সকালেই এই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারতাম, এত দেরি লাগত না, ম্যাডও মারা পড়ত না...'

আবার গুঙিয়ে উঠল টবি। কেঁপে উঠল চোখের পাতা। ধীরে ধীরে খুলে গেল। ঘোলাটে দৃষ্টি। মনে হলো, কিশোরের অনেক কথাই শুনে ফেলেছে সে। ককিয়ে উঠল, 'আ-আমি...এখন বাঁচব কি নিয়ে...'

'আবার সেই একই কথা!' কঠিন কণ্ঠে বললেন শেরিফ। 'কি নিয়ে বাঁচবে মানে? ম্যাডের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কি বেঁচে ছিলে না?'

'আমি ম্যাডের কথা বলছি না।'

'কার কথা বলছ তাহলে?'

এগিয়ে গেল কিশোর। 'ববির কথা বলছেন?'

শুয়ে থেকেই মাথা ঝাঁকাল টবি। 'ওকে ফিরিয়ে আনা দরকার।'

'অ, ও যে খুন করে বেড়াচ্ছে আপনি জানেন এ কথা?'

'বাঁচার তাগিদে খুন করে বেড়ায় ও,' গুঙিয়ে উঠল আবার টবি। 'ও...ও আমার মত আরেকজন ভাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় পাবে? তার জন্যে শুধু আমাকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সহজ কথাটা মাথায় ঢোকে না তার।'

'তোমার ব্যথা করছে, টবি?' অনেকটা নরম হয়ে এসেছে শেরিফের কণ্ঠ।

'ব্যথাটা শরীরে নয়, শেরিফ, মনে,' টবির এক চোখের কোণ্ থেকে পানির একটা ধারা গড়িয়ে পড়ল কপালের পাশ বেয়ে। 'জন্মের পর থেকেই একসঙ্গে আছি আমরা। এখন ও আলাদা হয়ে যেতে চাইছে। ও সরে গেলে আমি যে একেবারে একা হয়ে যাব। বাঁচব কি করে?'

পকেটে হাত ঢুকে গেল টবির। আবার বেরিয়ে এলে দেখা গেল ছোট একটা ফ্লাস্ক। লুকিয়ে রেখেছিল। ঠোঁটের কাছে তুলে আনতে গেল সেটা।

কেড়ে নিলেন শেরিফ। 'অনেক খেয়েছ। আর খেলে মরে যাবে।'

'প্লীজ, দিন ওটা! মরলে কি হবে? আমি কি আর বাঁচব মনে করেছেন?' কণ্ঠস্বরের জড়তা বাড়ল টবির। আবারও জ্ঞান হারাবে মনে হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি জানতে চাইল কিশোর, 'আপনার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে কতক্ষণ বাঁচবে ববি?'

'খুব বেশিক্ষণ না···নড়েচড়ে বেড়াতে পারে ঠিকই, কিন্তু অনেক যন্ত্রপাতির অভাব আছে ওর, যার জন্যে আমার শরীরে ভর করা ছাড়া বাঁচতে পারে না···ওর নিজের পেট নেই। আমার পাকস্থলীতে হজম হওয়া খাবারের প্রোটিন নিয়ে ও বেঁচে থাকে···ও আসলে ভয়ঙ্কর অসহায় একজন মানুষ···' অস্পষ্ট হয়ে এল টবির কথা। বন্ধ হয়ে গেল আবার চোখের পাতা।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল মুসা। মনে হচ্ছে বাস্তব নয় এ সব কথা। ভয়াবহ হরর ছবির কোন দৃশ্য।

টবির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল কিশোর। 'টবি, আরেকটু···প্লীজ! ও কি নিজে নিজে ফিরে আসতে পারবে আপনার কাছে?'

'এতদিন তো এসেছে,' চোখ মেলল না টবি। 'কিন্তু আজকে আর ফিরবে বলে মনে হয় না···আমার অবস্থা খারাপ দেখে মরিয়া হয়ে বেরিয়েছে···আরেকজন ভাইয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে, চেষ্টা করবে কারও না কারও পেটে ঠাঁই নিতে। যখন পারবে না, দেখবে, যাকেই আশ্রয় করতে চায় সে-ই মারা যায়, বাঁচার জন্যে আমার কাছে ফিরে আসার জন্যে উতলা হয়ে যাবে···কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না···' কেঁদে উঠল সে। 'আমিই শুধু ওর আশ্রয়দাতা··· একমাত্র ভাই···আমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই ওর···আমার কিছু হলে ও-ও শেষ···' কথা বন্ধ হয়ে গেল টবির। নিথর হয়ে গেল দেহটা।

তাড়াতাড়ি নাড়ি দেখল কিশোর। 'বড়ই দুর্বল! শেরিফ, ওকে হাসপাতালে নেয়া দরকার!'

'অ্যামবুলেন্স লাগবে তো!' রবিন বলল। 'নাম্বার কত, শেরিফ? ফোন করি!'

নম্বর বললেন শেরিফ। ফোন করতে ছুটল রবিন।

শেরিফও বেরিয়ে গেলেন।

একটা চেয়ার টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেল কিশোর। ওটাতে উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখল শিকগুলো আর মাঝখানের ফাঁক। একটা শিক আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। চটচটে আঠাল রক্ত লেগে আছে। তাজা রক্ত। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকল। ঠিক রক্তের মত লাগল না গন্ধটা, কেমন আঁশটে। আরও একটা রহস্যের জবাব পেয়ে গেল। এটা রক্ত নয়, সেজন্যেই ল্যাবরেটরি টেস্টে এতে রক্তের সব উপাদান পাওয়া যায়নি। টবি আর ববির দেহনিঃসৃত কোন ধরনের আজব তরল পদার্থ, রক্তের মতই অনেকটা। ববি আলাদা হয়ে গেলেও রক্ত বেরোয় না টবির পেটের গর্ত থেকে, যেখানে জোড়া লেগে থাকে সে। ওটা কোন ক্ষত নয়। এই লাল রসের জন্যে তাজা ক্ষতের মত দেখায় গর্তটা। ক্ষত নয়, রক্তও বেরোয় না, তাই ববি আলাদা হয়ে গেলেও ব্যথা করে না টবির পেটে।

কিশোর চেয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হাজত থেকে ডক্টর রোজালিকে বের করে নিয়ে এলেন শেরিফ।

'কি মিয়া গোয়েন্দা, কি করছ?' পেছন থেকে হাসিমুখে ডেকে জিজ্ঞেস করল রোজালি। 'আটকে তো রাখতে পারলে না। বলেছিলাম না, ধন্যবাদ একটা পাওনাই হয়ে গেল তোমাদের, পাবলিসিটিটা করে দেয়ার জন্যে।'

ওর এই হালকা রসিকতার জবাব দেয়ার মত পরিস্থিতি এখন নেই। ফিরে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'সরি, ডক্টর রোজালি, ভুল করেই ধরে আনা হয়েছে আপনাকে।'

'তারমানে আসল খুনীকে চিনতে পেরেছ? কে সে?'

'ববি।'

ঝট করে টবির পেটের দিকে চোখ চলে গেল রোজালির। ধীরে ধীরে ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। চমকটা হজম করতে সময় লাগল না তার। বিড়বিড় করে বলল, 'মাই গড! আমার অ্যাসিসট্যান্ট বানানো দরকার ওটাকে! অনেক বড় বড় খেলা দেখাতে পারব! গেছে কোথায়?'

প্রশ্নটা যেন মোচড় দিয়ে কিশোরের ঘাড়টা আবার ঘুরিয়ে দিল জানালার দিকে। বাইরে রাতের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন যেন চাবুক হেনে গেল ওর মনে: কোথায় গেছে ববি? কতদূরে? এবার কে ওর শিকার?

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে নেমে উত্তেজিত কণ্ঠে মুসাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'পিস্তলটা আছে?'

'আছে,' পকেট থেকে বের করে দেখাল মুসা।

'এসো আমার সঙ্গে!' ঝড়ের গতিতে ড্রাংক সেল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর।

ফোন সেরে ফিরছে রবিন। কিশোরকে দেখে বলে উঠল, 'অ্যামবুলেন্স আসছে।'

'তুমি এখানেই থাকো। শেরিফকে সাহায্য করো।'

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' অবাক চোখে মুসা আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল রবিন।

'আরেকটা খুন বন্ধ করতে!'

•

পনেরো

বাইরে বেরিয়ে জেলহাউসটাকে একপাক ঘুরে টবির সেলটার কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। হাতে একটা ছোট টর্চ। আলো ফেলে ইটের দেয়াল দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখো!'

'রক্ত!'

'রক্ত নয়, রক্তের মত জিনিস। রস।'

'আশ্চর্য! দেয়াল বেয়ে নামল কিভাবে?'

'নিশ্চয় ছোট ছোট হাত আছে ববির, তালুতে সাকশন কাপ—

টিকটিকির খাবার মত। সেগুলোর সাহায্যে সহজেই দেয়াল বেয়ে উঠে যেতে পারে। খুদে খুদে পা-ও আছে। দৌড়াতে পারে। প্রকৃতি ওর অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, আবার টিকে থাকার জন্যে অনেক কিছু দিয়েছেও, আমাদের যা নেই।'

'আরও একটা জিনিস দিয়েছে ওকে প্রকৃতি,' মুসা বলল, 'ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত।'

'হ্যাঁ। কাঁধের ওপর ঠেলে থাকা ফোঁড়াটা ওর মাথা, তাতে মুখও আছে।'

'উফ, কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মুখ আছে, দাঁত আছে, অথচ পাকস্থলী নেই। অন্যের দেহ থেকে প্রোটিন নিয়ে বেঁচে থাকা লাগে। প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল! তা কাকে খুন করতে গেল এখন?'

'গেলেই বোঝা যাবে।'

ভেজা চিহ্ন ধরে ধরে এগোল ওরা। প্রচুর রস ক্ষরণ হয় বিদঘুটে অঙ্গটা থেকে। রক্তের ফোঁটার মত পড়ে আছে। অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না।

একটা সরু গলিতে এসে উঠল। স্ট্রীট লাইটের নিচে বেশ কয়েক ফোঁটা লাল পদার্থ পড়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়েছিল ববি। বোধহয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনদিকে যাবে।

একটা ব্লক পেরিয়ে, আরেকটা সরু গলি ধরে অনেক বড় একটা আধখোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে।

'এমন কেন বাড়িটার চেহারা?' দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'কি হয় এখানে?'

দরজার নিচে লাল রস দেখতে পেল কিশোর। আস্তে করে ঠেলা দিয়ে পুরোটা খুলে ফেলল। দরজার পাশেই সুইচবক্স।

একটা সুইচ টিপে দিল কিশোর।

বাইরে দাঁড়ানো মুসার মুখ রঙিন হয়ে গেল সবুজ আলোয়। নিয়ন আলোয় বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে বাড়িটার যে নাম লেখা রয়েছে তার মানে করলে দাঁড়ায়: আতঙ্ক কুটির।

আরেকটা সুইচ টিপল কিশোর। আরও কিছু আলো জ্বলে উঠল। ফুটে উঠল চারটে মুখ, আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকা মানুষের বিকৃত চেহারার আদলে তৈরি। একজন পুরুষ, একজন নারী আর দুটো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের।

দরজায় মুখ বাড়িয়ে মুসা বলল, 'বার্বি নুনের ফানহাউস।'

'বার্বি বেঁচে থাকলে এখনই ধমকে উঠত।'

'কেন?'

'ফিয়ারহাউসকে ফানহাউস বললে খেপে যেত সে,' হাত নেড়ে বলল কিশোর, 'ভেতরে এসো। পিস্তলটা আছে না সঙ্গে? বের করো।' লম্বা করিডরটা দেখিয়ে বলল, 'তুমি ওদিকে যাও, আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি।

ঘুরে গিয়ে একজায়গায় মিলিত হব। তাতে আমাদের চোখ এড়িয়ে পালানোর সুযোগ পাবে না ববি।'

'তোমার কাছে তো পিস্তল নেই।'

'লাগবে না। সাবধান থাকব। ও আমাকে দেখে ফেলার আগেই যদি ওকে দেখে ফেলি, আর কিছু করতে পারবে না।'

কতবড় ভুল কথা বলেছে, জানে না কিশোর। ও যদি জানত, খুন হওয়ার আগে বার্বিও ওকে দেখেছিল, কিচ্ছু করতে পারেনি, তাহলে এত বড় ঝুঁকি নিত না। পা বাড়ানোর আগে মুসাকে বলল, 'ধরার সুযোগ পেলে গুলি কোরো না।'

রওনা হয়ে গেল দুজন দুদিকে।

লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চলল কিশোর। শেষ মাথায় গিয়ে ওটা থেকে আরেকটা করিডর বেরিয়ে দুদিকে চলে গেছে। কোনটা দিয়ে যাবে? ডানেরটা ধরল প্রথমে। খুব সতর্ক। খালি হাতে এসে ভুল করল না তো? একটা লাঠি অন্তত হাতে থাকলেও সুবিধে হত।

দ্বিতীয় করিডরের শেষ মাথায় বাঁক। ওটা ঘুরেই থমকে দাঁড়াল। শক্ত হয়ে গেল দেহ। আবছা আলোয় মনে হলো হালকা একটা সাদাটে ছায়া ছায়ার মতই নিঃশব্দে সরে গেল সামনে থেকে। ওর উপস্থিতি কি টের পেয়ে গেছে ববি? টর্চ জ্বালতে সাহস করল না। খালি হাতে এ ভাবে চলে আসাটা একেবারেই উচিত হয়নি। মুসার কাছে যেহেতু পিস্তল আছে, দুজনের একসঙ্গে থাকাটাই ঠিক ছিল।

বোকামি যা করার করে ফেলেছে। এখন ফিরে যাওয়াটাও নিরাপদ নয়। বরং ঘুরতে গেলে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি। ভয়টা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল কিশোর।

মোড় ঘুরে আবার দেখল ছায়াটাকে। হারিয়ে গেল বাঁকের আড়ালে। ধরার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল সে। আরেকটা বাঁক ঘুরল। পলকের জন্যে দেখল সামনের বাঁকটার অন্যপাশে চলে যাচ্ছে ছায়াটা।

কি সাংঘাতিক! খুদে খুদে ওই পায়েরই এই গতি!

দৌড়ানো শুরু করল কিশোর। তারপর আরেকটা বাঁক ঘুরে অন্যপাশে আসতেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল। পরমুহূর্তে দেখল মাটিতে পড়ে গেছে। মাথা ঝাড়ছে মগজটা পরিষ্কার করার জন্যে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে সে। দর্শককে ফাঁকি দেয়ার জন্যে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে ওটা, আগে থেকে সহজে বোঝা যায় না। দেয়াল ঘেঁষে একপাশ দিয়ে চলে গেছে সরু করিডর।

যে জগতেই থাকুক বার্বি, যদি চোখ রেখে থাকে এদিকে, তাহলে কিশোরের দুরবস্থা দেখে হয়তো এখন হেসে কুটি কুটি হচ্ছে সে।

*

অন্যপাশ দিয়ে ফানহাউসে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে মুসা। হাতে উদ্যত পিস্তল।

একটা মোড় ঘুরে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। বাল্ব হয়তো ছিল আগে, জ্বলে গেছে। নতুন আরেকটা লাগানোর জন্যে বার্বি বেঁচে নেই। তার মত করে আর কেউ চালাতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে এই ফানহাউস।

অন্ধকার থেকে একটা চাপা গর্জন ভেসে এল।

খাইছে! খুদে বার্বির তাহলে কণ্ঠও আছে! ভয়াবহ শব্দটা সই করে পিস্তল তুলল সে।

বাড়ছে শব্দটা।

ট্রিগারে চেপে বসতে লাগল মুসার আঙুল।

হঠাৎ আলো যেন বিস্ফোরিত হয়ে ফেটে পড়ল ঘরটায়।

বিশাল একটা মাথা লাফ দিয়ে এসে পড়ল ওর সামনে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওটার গোল গোল চোখ। দাঁত বের করা বিকট মুখ। হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠল। ঘরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল সে-শব্দ।

বার্বি নুনের চেহারা চিনতে পারল মুসা। 'ভূ-ভূ-ভূ-ত!' বলে চিৎকার করে দৌড় দিতে গিয়েও দিল না।

মুসাকে চমকে দিয়ে ফিরে গেল প্লাস্টিকে তৈরি মুখটা। মেঝের একটা ট্র্যাপডোর দিয়ে নেমে গেল নিচে। থেমে গেল রেকর্ড করা যান্ত্রিক হাসি। গর্জনও নেই আর। চমৎকার মেকানিজম। বুদ্ধি ছিল লোকটার—মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না মুসা।

আলো আর নিভল না। করিডর দেখে সেটা ধরে এগিয়ে চলল আবার সে। শেষ মাথায় দরজা। পিস্তল উদ্যত রেখে আরেক হাতে দরজাটা খুলল। মোটা পাইপ দিয়ে বানানো সুড়ঙ্গ, ভেতরটা আয়নার মত চকচকে। কি লাগিয়েছে কে জানে! ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই অন্য মাথায় একটা খসখস শব্দ হলো। মনে হলো হুটোপুটি করে সরে যাচ্ছে কোন প্রাণী।

'ববি! দাঁড়াও!' বলে চিৎকার করে ডাক দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল সে। পরক্ষণে পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে।

ওয়াশিং মেশিনের স্পিনারের মত ঘুরতে শুরু করল পাইপটা। সামনে, পেছনে, একপাশে বাড়ি খেতে লাগল ওর শরীর। পিস্তলটা শক্ত করে ধরে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। বসতেই পারল না উঠে, দাঁড়ানো তো দূরের কথা।

অবশেষে অনেক কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল ঘুরতে থাকা সুড়ঙ্গের অন্য মাথার দিকে। পিস্তলটা হাতে না থাকলে এগোতে আরেকটু সুবিধে হত।

পৌঁছে গেল পাইপের শেষ মাথায়। বাইরে বেরোতেই থেমে গেল ঘোরা। পরের শিকারের জন্যে ওত পেতে রইল আবার বার্বির পাইপ-সুড়ঙ্গ।

আবার কানে এল খসখস শব্দ, ফিয়ারহাউসের আরও ভেতরের কোন

ঘর থেকে। একটা গলি চলে গেছে সামনে দিয়ে। শেষ মাথার দিকে তাকাল সে। শব্দ আসছে ওদিকে কোনখান থেকে। উঠে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি ছুটল সেদিকে। করল আরেকটা ভুল।

তিন-চার কদমও এগোতে পারল না। একপাশ থেকে এসে বাড়ি মারল একটা দেয়াল। সরতে গিয়ে ধাক্কা খেল অন্য পাশের দেয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটাও নিচে নেমে যেতে শুরু করল। কিছুদূর নেমে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে এল আবার। ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল ওকে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। বুঝে গেছে ব্যাপারটা। করিডরটাও ফিয়ারহাউসের আরেকটা ফাঁদ। চাকা, পুলি, চেন, বড় বড় পিনিয়ান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দর্শককে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়ার জন্যে। বাহ্, বার্বি, বাহ! দারুণ জিনিস বানিয়েছিলে হে!

আনন্দটা নিখাদ মজা নয়। ব্যথাও লাগে। কাঁধ ডলতে শুরু করল মুসা। সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিল। ফুলে উঠছে ওটা।

ঠিক এই সময় আবার খসখস শোনা গেল। এবার আর তাড়াহুড়া করল না সে। এই খসখস শব্দটাও বার্বির তৈরি করা যান্ত্রিক শব্দ হতে পারে। কিংবা ববির। দুটোই বিপজ্জনক। আর অসাবধান হলো না। তাড়াহুড়ো করে কিছু করল না। দেখেশুনে, খুব সতর্কভাবে একটা একটা করে পা ফেলে এগোতে লাগল। দম আটকে রেখেছে।

আর কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদে চলে এল করিডরের অন্য মাথায়।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। মোড় ঘুরেই আবার আটকে ফেলল দম। মেঝেতে নড়ছে একটা সাদা ছায়া। অবিশ্বাস্য গতিতে ওর দিকে ছুটে এল ওটা।

চিন্তা করার সময় নেই। পলকের জন্যে মনের পর্দায় খেলে গেল ম্যাডের রক্তাক্ত ভয়াবহ লাশটার চেহারা। পেটের মারাত্মক ক্ষতটা চোখে ভেসে উঠতেই আর দ্বিধা করল না সে। টিপে দিল ট্রিগার।

একবার! দুবার! তিনবার!

এত কাছ থেকে মিস করার কথা নয়। করলও না। প্রতিটি গুলিই আঘাত হানল লক্ষ্যবস্তুতে, ঝনঝন শব্দ হলো। এগোনো বন্ধ হলো না ছায়াটার। চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে শুরু করল একসঙ্গে। একের পর এক কাঁচ ভেঙে পড়তে লাগল।

ফিয়ারহাউসের আরেক বিস্ময়। নিশ্চয় এটা হল অভ মিরর। আয়নার কারসাজি করে রেখেছে বার্বি। সেজন্যে একটা ছায়াকেই মনে হচ্ছে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে। আসল ছায়া কোনটা তা-ও বোঝা কঠিন। আরও মুশকিল, আকৃতিগুলো সব এক রকম নয়। আয়নার তারতম্যভেদে কোনটা গোল, কোনটা লম্বাটে, কোনটা চ্যাপ্টা।

আন্দাজে গুলি করতে লাগল মুসা।

ভেঙে পড়তে লাগল কাঁচ।

থেমে গেল নড়াচড়া। বিচিত্র একটা ছায়া লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল। যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

ছায়াটাকে আর এগোতে না দেখে আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তার মনে। তবে কি ববি নয়? এটাও বার্বির আরেক খেলা? বিচিত্র কায়দায় আয়না সাজিয়ে তার মধ্যে কোন উপায়ে একটু সচল ছায়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে হয়তো. দর্শক ঢুকলেই যেটা চালু হয়ে যায়, চারপাশে রাখা আয়নায় দেখা যেতে থাকে ওটার প্রতিবিম্ব। কিছুক্ষণ ভয় দেখিয়ে আপনাআপনি থেমে যায়।

নাকি ববিই? তাহলে থেমে গেল কেন? ক্লান্ত হয়ে গেছে? গুলিতে আহত হয়েছে? গুলির শব্দে ভয় পেয়েছে?

ঝুঁকি নিল না মুসা। ট্রিগার টিপল আবার। খট করে খালি চেম্বারে পড়ল হ্যামার। গুলি শেষ।

ভয় পেলেও দমল না মুসা। পিস্তলের নল ধরে বাঁট দিয়ে ছায়াটার মাথায় বাড়ি মারার জন্যে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল। উদ্দেশ্য, বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ধরে নিয়ে যাবে।

কাছে এসে পিস্তলধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে তীব্র গতিতে নামিয়ে আনল ছায়াটাকে লক্ষ্য করে।

বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে ভাঙল আরেকটা আয়না।

ঠিক এই সময় তার কাঁধ খামচে ধরল কে যেন!

ষোলো

'কি হয়েছে মুসা?' কানের কাছে কথা বলল কিশোর। 'কাকে গুলি করছিলে?'

গলার কাছে যেন হৃৎপিণ্ডটা উঠে চলে এসেছে মুসার। সেটাকে নামানোর চেষ্টা করল জোরে জোরে দম নিয়ে। 'কিশোর, এ রকম পেছন থেকে এসে চমকে দিলে হার্টফেল করে মারা যায় মানুষ, এ কথাটা কেউ তোমাকে বলেনি কখনও?'

'অনেকেই বলেছে। কিন্তু হয়েছেটা কি?'

ফিয়ারহাউসের প্রবেশমুখের কাছে একটা শব্দ হলো।

'ওই যে, পালিয়ে যাচ্ছে!' বলেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল কিশোর। মুসা ছুটল তার পেছনে।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চন্দ্রালোকিত রাতের নীরবতা ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ কান খাড়া করল মুসা। আস্তে করে ঘাড় ঘোরাল একটা ঝোপের দিকে। বুড়ো আঙুল তুলে ইঙ্গিত করে কিশোরকে দেখাল সেদিকে। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ঝোপের ভেতরের খসখস শব্দটা এখন সে-ও শুনতে পেয়েছে। মুসার পিস্তলের গুলি শেষ। খালি পিস্তলটা পকেটে রেখে দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা লাঠি খুঁজল সে। ফিয়ারহাউসের একধারে কতগুলো তক্তা পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে এল একটা ছোট তক্তা, লাঠির কাজ চলবে এতে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট ছায়া ছুটে এল ওদের দিকে।

বাড়ি মারার জন্যে তক্তা তুলল মুসা।

হাতটা স্থির হয়ে গেল ওই ভঙ্গিতেই।

ছুটে আসা ছায়াটা টিউমারের মত দেখতে বিচিত্র মানুষ নয়। কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

'ম্যাডের কুত্তাটা!' ঢিল হয়ে গেল মুসার পেশী। 'এখানে এল কিভাবে?'

'আমাদের বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছে।'

'কি বলবে?'

'র‍্যাট, কি হয়েছে? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

ওদের সামনে বসে চেঁচাতেই থাকল খুদে কুকুরটা। মুখ তুলে তাকাচ্ছে দুজনের দিকে। যখন ওরা কেউ নড়ল না, লাফ দিয়ে উঠে ছুটল যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। কয়েক ফুট গিয়ে থেমে আবার ফিরে তাকাল।

'অ্যাই, কি বলছিস?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চিৎকার আরও বাড়িয়ে দিয়ে ওদের কাছে ফিরে এল র‍্যাট। মুখ তুলে তাকাল। চাঁদের আলোয় চকচক করছে চোখ দুটো। ঘুরল, কয়েক পা এগোল, দাঁড়াল, ওদের দিকে ফিরল, আবার ঘুরে এগোল, আবার দাঁড়াল···

'ও, বুঝেছি,' বলল কিশোর, 'ও আমাদেরকে সঙ্গে যেতে বলছে। চলো তো দেখি?'

যেই ওর পেছনে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা, গতি বাড়িয়ে দিল কুকুরটা। একদৌড়ে গিয়ে রাস্তায় উঠল। ছুটতে শুরু করল কিশোর আর মুসা।

র‍্যাট ছুটছে। গোয়েন্দারা বেশি পেছনে পড়ে গেলে থেমে অপেক্ষা করছে। যেই ওরা কাছাকাছি হচ্ছে, আবার দিচ্ছে দৌড়।

কিছুদূর এগোনোর পর মুসা বলল, 'ট্রেলার পার্কের দিকে যাচ্ছে ও।'

'ও জানে কে ওর মনিবকে খুন করেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় দেখেছে একটু আগে। ধরার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। দারুণ শিকারি! পয়েন্টারের রক্ত আছে শরীরে।'

'মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু।'

'ববির মারাত্মক শত্রু।'

'কিন্তু এদিকে এসেছিল কেন?'

'মনিব নেই, ঘরে থাকতে মন চায়নি। বাইরে বেরিয়েই হয়তো খুনীর পরিচিত গন্ধ পেয়েছিল। পিছু নিয়েছে।'

ট্রেলার পার্কে পৌঁছেও থামল না র‍্যাট। একদৌড়ে ঢুকে গেল একটা

ট্রেলারের নিচে। ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল।

আচমকা থেমে গেল ওর চিৎকার। কুঁই কুঁই করে দুতিনটে গোঙানি দিয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল।

'খাইছে! ববিকে শেষ করে দিল নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার মনে হয় উল্টোটা ঘটেছে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'দেখা দরকার।'

'আমি পারব না!'

'দাঁড়াও, দেখে আসি।' টর্চ বের করে গিয়ে ট্রেলারের নিচে উঁকি দিল কিশোর। আধ মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, 'ম্যাডের কাছে চলে গেছে ওর কুকুরটাও। মরিয়া হয়ে গেছে ববি। ওকে এখনই থামাতে না পারলে সর্বনাশ করে ফেলবে।'

'কি করে থামাব? গুলিগুলো অযথা নষ্ট করলাম...'

'কথা বলার সময় নেই। এসো,' হাত তুলে ট্রেলারের অন্যপাশটা দেখাল কিশোর, 'মনে হয় ওদিকে চলে গেছে।'

'ধূর!' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'চাঁদটাকেও মেঘে ঢাকার আর সময় পেল না! আলোর যখন বেশি দরকার, তখনই অন্ধকার!'

'টর্চ তো আছেই।'

'ব্যাটারি শেষ।'

তবে মেঘ বেশিক্ষণ থাকল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। যেই ওরা পা বাড়াতে যাবে, আবার আরেক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদ। আধ মিনিট পর সরল। খানিক পর আবার এল আরেক টুকরো মেঘ। চলল এ ভাবেই মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি। নিচের ধরণীতে কখনও আলো কখনও অন্ধকার। ট্রেলারগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র আলো-আঁধারির খেলা।

জ্যোৎস্নার আশায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। পকেটে ছুরি আছে। ছোট হলেও যথেষ্ট কাজের। একটা গাছের ডাল কেটে লাঠি বানিয়ে নিয়ে ট্রেলারগুলোর ফাঁক দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

একজায়গায় পাশাপাশি রাখা দুটো ট্রেলারের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মাঝখানের ফাঁকে নড়ছে কি যেন। লাঠিটা বাগিয়ে ধরে পা টিপে টিপে সামনে এগোল। ওকে দেখে ট্রেলারের একপাশ থেকে ধুপ করে লাফিয়ে পড়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে পালাল একটা ছায়া। তিন-চার ফুটের বেশি উঁচু হবে না ছায়াটা।

'কে? কে?' বলে চিৎকার করে উঠল ট্রেলারের ভেতর থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল তিন ফুট উঁচু একজন মহিলা। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, এত রাতে এখানে কি করছ তোমরা?'

'কে? মারিয়া?'

'দেখো না, দুটো বিরাট ছেলে লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মত!'

কয়েক সেকেন্ড পরেই মহিলার পাশে এসে দাঁড়াল একই উচ্চতার একজন পুরুষ। হাতে তার দেহের চেয়ে লম্বা একটা শটগান। ধাক্কা দিয়ে মহিলাকে সরিয়ে দিল দরজা থেকে। শটগানটা তুলে ধরল দুই গোয়েন্দার দিকে। শাসিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে এখানে! চোর? চুরি করতে এসেছ? আজ ছেড়ে দিলাম! আর যদি কোনদিন দেখি এ দিকে, দ্বিতীয়বার আর আসার সুযোগ পাবে না! যাও!'

পিছিয়ে এল কিশোর।

দরজা থেকে সরে গিয়ে দড়াম করে পাল্লা লাগিয়ে দিল লোকটা।

বিড়বিড় করে মুসা বলল, 'কিশোর, এরচেয়ে মঙ্গলগ্রহের সবুজ মানুষদের সামলানো বোধহয় অনেক সহজ।'

'মঙ্গলগ্রহে আছি বলেই মনে হচ্ছে এখন আমার!'

'তোমার এখন মনে হচ্ছে, আমার সেটা মনে হচ্ছিল গিবসনটনে ঢোকার পর থেকেই। একজন মানুষও স্বাভাবিক নয় এখানকার। কাউকে, কোন কিছুকে বিশ্বাস করার উপায় নেই। ভরা বাক্স ভেবে ডালা ওল্টাতে গেলে দেখা যায় খালি, দরজা ভেবে ঢুকতে গেলে দেয়ালে ধাক্কা খেতে হয়; সব যেন নকল, সব ভুয়া, ফিজি মারমেড!'

'কেবল মৃত্যুটা বাদে! ফিয়ারহাউসে ঢুকে মাথাটা আরও গুলিয়ে গেছে।'

'আমারও।'

শটগানঅলা বামনটার ভয়ে ট্রেলার দুটোর কাছ থেকে সরে গিয়ে বেশ কিছুদূর ঘুরে অন্যপাশে চলে এল ওরা।

হালকা মেঘে ঢাকা পড়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চাঁদের আলো। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা।

মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। আবার উজ্জ্বল হলো আলো। কোথাও চোখে পড়ল না ববিকে। গেল কোনদিকে?

কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল কিশোর। হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'মাটিতে পড়ে আছে ওটা কিসের ছায়া?'

কয়েক পা এগোতে বোঝা গেল ট্রেলারের পাশে ঘাসের ওপর নিথর হয়ে পড়ে থাকা ছায়াটা একজন মানুষ। দুহাতে পেট চেপে ধরা। মরে গেল নাকি?

'ট্রেলারটা ডক্টর রোজালিন!' বলে উঠল কিশোর। 'পড়ে থাকা লোকটা কে?'

'ঠগটাই হবে, আর কে! পেরেকের চেয়ে শক্ত কিছুর খোঁচা খেয়েছে এবার! আত্মা বোধহয় সত্যি সত্যি দেহ ছেড়ে গেল এদ্দিনে!'

লাঠিহাতে দৌড় দিল কিশোর।

সতেরো

দেহটার কাছে ওরা পৌঁছার আগেই খুলে গেল ট্রেলারের দরজা। টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের গায়ে। গোয়েন্দাদের দেখেই চিৎকার করে উঠল রোজালি, 'লাঠি নিয়ে এসেছ কেন? মারবে নাকি? নাহ্, তোমাদের সঙ্গে দেখছি আদালতেই দেখা করতে হবে!'

জবাব দিল না কিশোর। দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকাল। দেখতে পেল লোমহীন গায়ে আঁকা টাট্টু।

এতক্ষণে গুঙিয়ে উঠল হুকু বাম।

'ও বেঁচে আছে!' চিৎকার করে বলল মুসা।

ডক্টর রোজালিও অবাক। লাফ দিয়ে নেমে এল দরজা থেকে। 'কি হয়েছে ওর?'

হাঁটু গেড়ে খাদকটার পাশে বসে পড়ল কিশোর। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'এই, ওঠো! কি হয়েছে?'

হুকু বামের গায়ে সরাসরি আলো ফেলল রোজালি।

আরেকবার গোঙাল লোকটা। নড়ে উঠল। হাত সরাল পেট থেকে।

নাভির ওপরে গোল একটা ক্ষত আশা করেছিল কিশোর। নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবে একেবারে অক্ষত নয় হুকু বামের পেট। চামড়ায় কালচে-বেগুনি একটা দাগ। ফুলে উঠেছে। হাতুড়ির বাড়ি খেয়েছে যেন।

মুসার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'শেষমেষ খাদকটাকেই ভাই বানাতে চেয়েছিল ববি। আমাদের সাড়া পেয়ে ভয়ে পালিয়েছে। হুকুর ভাগ্য ভাল, ওর পেটে ক্ষত করার সময় পায়নি। ববির আক্রমণের পদ্ধতি এখন পরিষ্কার। প্রথমে মাথা দিয়ে পেটে গুঁতো মেরে বেহুঁশ করে ফেলে মানুষকে। তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে গর্ত করে নিজের বিশেষ অঙ্গটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। যখন বোঝে, টবির দেহের মত এই দেহ থেকে প্রোটিন জোগাড় সম্ভব হচ্ছে না, কিংবা তার হামলায় মরে গেছে মানুষটা, তখন নিরাশ হয়ে আবার ফিরে যায় ভাইয়ের কাছে। টবি ছাড়া আর কোন মানুষ যে ওকে আশ্রয় দিতে পারবে না, এটা বোঝার বুদ্ধি নেই।'

'ওই ফোঁড়ার মত মাথায় যে এতখানি বুদ্ধি আছে, সেটাই তো আশ্চর্য! আর কত!' ট্রেলারের নিচের অন্ধকারের দিকে তাকাল মুসা, 'কিন্তু এখন গেল কোথায়?'

বোবা হয়ে গেছে যেন রোজালি। হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার সহকারীর পেটের দিকে।

'দেখি, হুকু বাম কিছু বোঝাতে পারে কিনা?' বলে ওর দিকে ফিরল

কিশোর। 'হুকু, যে জীবটা তোমাকে মেরেছে, ওটা কোন দিকে গেছে বলতে পারো? আঙুল তুলে দেখাও তো?'

জবাবে গোঙানি বেড়ে গেল হুকুর। পেট ডলতে লাগল।

'জোরেই মেরেছে বেচারাকে!' মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'ও আর কিছু বলতে পারবে না এখন। বেঁচে যে গেল এই বেশি।'

এতক্ষণে যেন হুঁশ হলো রোজালির। তাড়াতাড়ি এসে নিচু হয়ে হুকু বামের একটা হাত ধরে টান দিল, 'ওঠো, ট্রেলারে এসো। পেটে বরফ ঘষে দিই।'

ওকে তুলে নিয়ে টানতে টানতে ট্রেলারে ঢুকে গেল রোজালি। দরজা লাগিয়ে দিল।

আবার কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে চাঁদ। টর্চের আলো সরে যাওয়ায় আগের চেয়ে অন্ধকার লাগল জায়গাটা।

'এই অন্ধকারে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন ববিকে,' হতাশ হয়ে বলল কিশোর।

'ফিরে যাব?'

'না, এ ভাবে ওকে ছেড়ে রেখে যাওয়াও ঠিক হবে না। আবার কাউকে ধরার চেষ্টা করবে। সেই লোকটার ভাগ্য হুকু বামের মত ভাল না-ও হতে পারে।'

'কি করব? কোনদিকে গেল বুঝব কিভাবে?'

গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এল। এগিয়ে আসতে দেখা গেল। গায়ে এসে পড়ল হেডলাইটের আলো। থামল গাড়িটা। লাফিয়ে নেমে দৌড়ে এল রবিন। শেরিফ এলেন তার পেছনে।

'ওদিকে এক ট্রেলারের একজনকে জিজ্ঞেস করেছি, [illegible] না,' হাত তুলে পেছন দিক দেখাল রবিন, 'সে বলল, এদিকে এসেছে। তোমরা? কি অবস্থা? ববিকে পেলে?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'টবির কি অবস্থা?'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

মাথা নেড়ে শেরিফ জানালেন, 'মারা গেছে।'

'কি হয়েছিল? হার্টফেল?'

'না। লিভারটা একেবারে শেষ। কিছুদিন থেকে অতিরিক্ত মদ গিলছিল। পচিয়ে ফেলেছে।'

'হুঁ, এটাই তাহলে কারণ!'

'কিসের কারণ?'

'ববির এতটা মরিয়া হয়ে ওঠার। প্রথমদিকে ধীরে-সুস্থে খুঁজেছে, সেজন্যে খুনগুলোও করেছে দেরিতে। এখানে আসার পর যখন বুঝল ওর ভাই আর বেশিদিন বাঁচবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরেকজন নতুন ভাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। বুঝে গিয়েছিল, প্রোটিন নেয়ার জন্যে খুব শীঘ্রি আরেকটা দেহ জোগাড় করতে না পারলে তাকেও মরতে হবে।'

রবিনের মনে পড়ল মিউজিয়ামের বুড়োর কথা, চ্যাং আর এং-এর গল্প। সিয়ামিজ টুইন হওয়াতে মৃত্যু আসার আগেই এং-কেও বাধ্য হয়ে মরতে হয়েছিল। ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক। টবি আর ববির ব্যাপারটাও আলাদা কিছু নয়। ওরাও একধরনের সিয়ামিজ। বেশি বুদ্ধি থাকাটাই যন্ত্রণার। নইলে ববি বুঝতেও পারত না কিছু, কষ্টও পেত না, এ ভাবে খুনও করে বেড়াত না। মরার সময় হলে জন্তু-জানোয়ারের মত টুপ করে মরে যেত।

'বাঁচুক আর মরুক,' কিশোর বলল, 'এখনই ওকে আটকানো দরকার। নইলে আরও কত খুন যে করবে, কোন ঠিকঠিকানা নেই।' শেরিফের দিকে তাকাল সে। 'খোঁজার জন্যে লোকের ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'তারমানে তুমি সত্যি ভাবছ ববিই খুনী? প্রথম যখন বললে, আমি ভেবেছি বারনুমের পথ ধরেছ তুমি, আরেক ফিজি মারমেড দেখাচ্ছ আমাদের।'

'না, শেরিফ, রসিকতা নয় এটা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর। 'সত্যি বলছি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন শেরিফ। 'বিশ্বাস করলাম তোমার কথা, কারণ তুমি গোয়েন্দা, সার্কাসের লোক নও। লোক জোগাড় করতে অসুবিধে হবে না। এখনই ব্যবস্থা করছি।'

*

ভোরের আলো [illegible] ফেল[illegible]তে শেষ হয়ে গেল খোঁজার কাজ।

গি[illegible]সনট[illegible]-বে[illegible] সবাই মিলে খুঁজল। দৈত্যাকার লোক, বামন, স্ট্রংম্যান, মোটা মহিলা, [illegible]-ভদ্রলোক, তিন পেয়ে ভদ্রলোক, মানব-অক্টোপাস, পিরামিড-দল[illegible]দের গোষ্ঠী, সবাই আঁতিপাতি করে খুঁজল সমস্ত জায়গায়।

কোথাও পাওয়া গেল না ববিকে।

পুবের আকাশে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এ সময় গোয়েন্দাদের সামনে এসে শেরিফ বললেন, 'পাওয়া তো গেল না।'

নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'গেল কোথায়? হুট করে এ ভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারে না...'

'নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি তো?'

জবাব দিল না কিশোর। চুপ করে ভাবতে লাগল।

খানিক দূরে ডক্টর রোজালির ট্রেলারের কাছে একটা আদিম ফোক্স ওয়াগেন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেলার থেকে মালপত্র বের করে তাতে তুলছে সে।

'ও আবার কোথায় যাচ্ছে?' বলে সেদিকে রওনা হলেন শেরিফ। পেছনে চলল তিন গোয়েন্দা।

ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল রোজালি। গাড়ির সামনের সীটে বসে আছে হুকু বাম।

'চলে যাচ্ছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এখানে থেকে মরব নাকি? ইবলিসটা তো এখনও ছাড়াই রয়েছে। বরং সময় থাকতে থাকতে পালাই।' গাড়ির ট্রাংকে আর জায়গা নেই। তার মধ্যেই ঠেসেঠুসে শেষ পোঁটলাটা ভরল রোজালি।

'ছাড়া থাকলেও আর ভয় নেই,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমার মনে হয় এতক্ষণে মরে গেছে ববি। না মরলেও ধুঁকছে। টবি মৃত। কার গায়ে গিয়ে আর ঠাঁই নেবে সে?'

'যার গায়ে খুশি নিক, আমার কি? আমি চলে যাচ্ছি।'

'টবি আর ববির জন্যে কি আপনার একটুও খারাপ লাগছে না?' রবিন বলল।

'না, লাগছে না। লেগে কি হবে? আমার হাতে তো কোন ক্ষমতা নেই। প্রকৃতি ওদের সৃষ্টি করেছে, আবার প্রকৃতিই ওদের ফিরিয়ে নিয়েছে। সময় হলে আমাকেও নেবে। কেউ থাকতে পারবে না। অহেতুক খারাপ লাগাতে যাব কেন?' হাসল রোজালি। 'আমাকে হয়তো নিষ্ঠুর ভাবছ, তাই না? ভাবো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। যা সত্যি, বললাম।'

'যেতে ইচ্ছে করছে, যান,' কিশোর বলল। 'তবে একটা কথা শুনে যান, ববিকে আমরা খুঁজে বের করবই। বেঁচে থাকলে ওকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব...'

'সেটা হবে আরেক ভুল! আসলে কখনোই প্রকৃতির বিরোধিতা করা উচিত নয় মানুষের। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের ক্ষতিই করছে। আমার বিশ্বাস, একুশ শতকের মধ্যেই বিস্ময়কর সব খেল দেখিয়ে দেবে মেডিক্যাল সাইন্স। হয়তো কোন সিয়ামিজ টুইন, কোন কুমির-মানব, কোন টবি আর ববিকে বিকৃত জীবন যাপন করতে পারবে না; মায়ের পেটে থাকতেই স্বাভাবিক আর নিখুঁত মানুষে পরিণত করবে সবাইকে জিনেটিক এঞ্জিনিয়ারিঙের জাদু। কিন্তু ওই নিখুঁত পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই না আমি। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয় আমার!'

পিস্তল দিয়ে নিশানা করার মত একটা আঙুল কিশোরের দিকে তুলল রোজালি, 'ভেবে দেখো, সারাজীবন ঠিক এ রকমই রয়ে যাবে তুমি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না তোমার বাইরের খাঁচাটার। ভেতরের যন্ত্রপাতি সব জরাজীর্ণ হতে থাকবে। বাইরের খাঁচার সঙ্গে ভেতরের জিনিসের কোন মিল থাকবে না। শক্তিশালী পেশীগুলোকে চালানোর ক্ষমতা হবে না ওগুলোর। তরুণ দেহের জেলখানায় আটকা পড়ে অসহায় হয়ে ধুঁকতে থাকবে বুড়ো মগজ। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই তার। কি? ভাবলে নিজেকে ববির চেয়ে অসহায় মনে হয় না?'

'যদি ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোকেও খাঁচাটার মতই শক্তিশালী করে দেয়া যায়?'

'তাহলে অন্য কোথাও গড়বড় হয়ে যাবে। মানুষ নিজেকে যত শক্তিশালী আর বুদ্ধিমানই ভাবুক, যে তাকে সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে

ক্ষমতাবান কখনোই হতে পারবে না। অহেতুক তার বিরোধিতা করে নিজেকে কষ্ট দেবে, ধ্বংসের পথ ত্বরান্বিত করবে আরও।'

ধাপ্পাবাজ ডক্টর রোজালির দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোর।

'সেজন্যেই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে,' বলে চলেছে রোজালি। 'ববি চোখ খুলে দিয়েছে আমার। ছেড়ে দেব এই পেশা। ফিজি মারমেডগিরি আর নয়। এখন থেকে একটাই লক্ষ্য হবে আমার, মানুষকে বোঝানো।'

'কি বোঝাবেন?' রোজালির সঙ্গে আগের মত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আর কথা বলতে পারল না কিশোর।

'বোঝাব, প্রকৃতির কোন অস্বাভাবিকতা নিয়ে মানুষের মাথা ঘামানো উচিত নয়। প্রকৃতি যদি চাইত, তাহলে সবাইকেই স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করতে পারত। সুতরাং তার কাজে বাগড়া না দিয়ে সেটাকে মেনে নেয়াই সবার জন্যে মঙ্গল।'

'তাই বলে ববি আর টবি, সিয়ামিজ টুইন, পেট থেকে বেরিয়ে আসা একটি মাত্র পা, মাছের মত আঁশওয়ালা মানুষের চামড়া, এ সবও মেনে নিতে হবে?'

'হবে। কারণ প্রকৃতি সেটাই চায়।'

'কেন?'

হাসল রোজালি। 'বড় নগণ্য একজন মানুষকে আকাশের চেয়েও বিরাট এক প্রশ্ন করে বসলে, কিশোর পাশা। এর জবাব আমি কোথায় পাব? এটা এমন এক জটিল রহস্য যার জবাব কোনদিন দিতে পারবে না কোন মানুষ। সেই ক্ষমতাই প্রকৃতি তাকে দেয়নি।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রোজালির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এখন কোথায় যাবেন?'

'বাল্টিমোর।'

গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল রোজালি।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'হুকু বামের কি হয়েছে, বলুন তো? ও এমন করছে কেন?'

'জানি না কি হয়েছে ওর। সারারাত ছটফট করেছে। মাঝে মাঝে পেট চেপে ধরেছে। মুহূর্তের জন্যেও দুচোখের পাতা এক করেনি। ফ্লোরিডার গরম বোধহয় সহ্য হয়নি ওর।'

ঘুরে গাড়ির আরেক পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। আচমকা প্রশ্ন করে বসল, 'ববি আপনার গাড়িতে নেই তো?' বলেই জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল মুসা।

হেসে উঠল রোজালি। 'নিজের চোখেই দেখো। ভালমত।'

কিশোর তাকিয়ে আছে হুকু বামের দিকে। ঘুড্ডুৎ করে ঢেকুর তুলল খাদকটা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ হাঁ করে মুখে আঙুল পুরে ইশারা করল। তারপর পেট দেখাল। কিছু একটা বোঝাতে চাইছে

বোবাদের ভাষায়, যেটা বুঝতে পারল না কিশোর।

আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না রোজালি। সবাইকে গুড-বাই জানিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দিল।

রাস্তায় উঠে গেল ফোক্স ওয়াগেন। তাকিয়েই আছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে। রোজালির এই তাড়াহুড়ো সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছে ওর। পথের বাঁকে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল। কি ভেবে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। দৌড় দিল ট্রেলারটার দিকে, যেটার কাছে রাতের বেলা মাটিতে পড়েছিল হকু বাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগল ঘাসের ওপর। দাঁড়িয়ে গেল একজায়গায় এসে। কুঁচকে ফেলছে চোখমুখ।

'কি হলো?' পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আজ আর নাস্তা খেতে পারব না আমি! খাবার নামবে না গলা দিয়ে!'

'কি বলছ?'

নীরবে হাত তুলে মাটির দিকে দেখাল কিশোর।

রবিনও দেখল, লাল রঙের রস পড়ে আছে। 'তাতে কি? ববি যে এখানে এসেছিল সে তো আমরা জানিই।'

'এসেছিল, কিন্তু ফিরে যেতে পারেনি আর। দেখো, যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই। এতবড় রাক্ষস আর দেখিনি!'

চমকে গেল রবিন। বুঝে ফেলেছে। চোখ বড় বড় করে তাকাল কিশোরের দিকে। 'তুমি...তুমি বলতে চাইছ হকু বাম ববিকে...'

নীরবে আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ওয়াক ওয়াক করে বমি করতে ছুটল রবিন।

গোপন ফর্মূলা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

'আমাকে দেখা করতে বলছেন, স্যার?'

মুখ তুলে তাকালেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ-চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। 'এসেছ। বসো।'

'বাড়ি ফিরতেই চাচী বলল, আপনি জরুরী খবর দিয়েছেন,' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল কিশোর। 'দেরি করিনি আর।'

সামনের ফাইলগুলো দুহাতে ঠেলে সরিয়ে ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন ক্যাপ্টেন। 'খবরটা শুনলে চমকে যাবে।'

সামনে ঝুঁকে বসল কিশোর। অপেক্ষা করছে।

'খাবে কিছু?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। খেয়েই দৌড় দিয়েছি।'

একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালেন ক্যাপ্টেন। খস করে কাঠি জ্বেলে আগুন ধরালেন। 'তোমাদের বন্ধু জেনারেল উইলার্ড ব্রন ডুগান এখন জ্যামাইকায়,' কথাটা যেন ছুঁড়ে দিলেন ধোঁয়ার সঙ্গে।

ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'খোঁজ তাহলে পাওয়া গেল!'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন।

'ডুগান ওখানে কি করছে জানেন কিছু?'

'কি করছে জানি না। তবে কেন গেছে অনুমান করতে পারছি।'

কয়েকবার জোরে জোরে টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা রেখে দিলেন ক্যাপ্টেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই হাতের আঙুলের মাথা সব এক করে দেখলেন একবার। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। 'অদ্ভুত এক গল্প। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁক আছে, অনুমানে ভরাট করতে হয়েছে সেগুলো। যাই হোক, হেস হফনার নামে কারও কথা কখনও বলেছে ডুগান?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

'বলার কথাও নয়। নামটা গোপনই রেখেছে। তা ছাড়া ডুগানের সোনা লুটের কেসের সঙ্গে হেসের কোন সম্পর্ক ছিল না। লোকটা জার্মান। ডুগানের তরুণ বয়েসে ওর সঙ্গে পরিচয়। ধান্দাবাজ লোক। যুদ্ধের সময় জার্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে ছিল। হিটলার যখন ক্ষমতায়, তখন বড় বড় অস্ত্র তৈরির কোম্পানি আর নেভির সঙ্গে লিয়াজোঁ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিল সে। যুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ধরা পড়ল না, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল। হিটলার যে হারতে যাচ্ছে, বোধহয় আগে থেকেই আঁচ করে ফেলেছিল। পালানোর পথ

আগেভাগেই তৈরি করে রেখেছিল, যাতে হিটলারের পতনের . পরে গায়েব হয়ে যেতে পারে। মজাটা হলো, পালিয়ে শত্রুর রাজ্য আমেরিকাতেই চলে এসেছিল সে। ডুগান তাকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল।'

'তারমানে এখন আপনারা জেনে ফেলেছেন, ও কোথায় আছে?'

শুকনো-হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ। যুদ্ধ কি আজকে শেষ হয়েছে! এতটা কাল জনৈক নরউইজন নাগরিক গানো ক্রাগেনের ছদ্মবেশে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিল জ্যামাইকার কিংসটনে, অথচ কেউ কিছু বুঝতে পারল না। ব্রিটিশ, আমেরিকান, এমনকি তার নিজের দেশের সিক্রেট সার্ভিসও আন্দাজ করতে পারেনি সে কোথায় লুকিয়ে আছে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'দারুণ লোক তো! পারল কি করে?'

'ভীষণ চালাক, সে তো বুঝতেই পারছ। "রোগ" নামে এক এঞ্জিনের ছোট একটা ইয়টে করে একা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে চলে গেছে কিংসটনে।'

'অ্যাডভেঞ্চারের লোভে ওসব আজকাল হরদম করে লোকে। এঞ্জিন ছাড়া শুধু পালের নৌকাতে করেও মহাসাগর পাড়ি দেয়। শুনতে আর অবাক লাগে না এখন।'

'দেয়, তবে হেসের ব্যাপারটা অন্য রকম। নিঃসঙ্গ নাবিকের ভান করে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছে সে। যাই হোক, কাগজপত্র সব ঠিক ছিল বলে ওকে সন্দেহ করেনি কেউ। নির্বিবাদে বাস করতে লাগল হেস। তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি আর কর্তৃপক্ষ। ঘামানোর কি দরকার? চাকরির জন্যে ধরনা দেয়নি কারও কাছে, নিজের টাকায় চলছিল। বেআইনী কিছু করেনি। সরকারও তাকে অহেতুক খোঁচাখুঁচি করেনি। টিউ'স অ্যাঙ্কারেজ নামে পুরানো একটা বাড়ি কিনে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে নাম দিল ক্রাগেন'স নেস্ট। শোনা যায়, কুখ্যাত জলদস্যু টিউর বাড়ি ছিল টিউ'স অ্যাঙ্কারেজ।'

'বাহ, চমৎকার! জলদস্যুর বাড়িতে ঠাঁই নিল এক স্থলদস্যু। ওঅর ক্রিমিন্যাল, তারমানে বহু মানুষের খুনের জন্যে দায়ী। বাড়িটার নাম ক্রাগেন'স নেস্ট না দিয়ে কল্পিত জলদানব ক্রাকেনের নামে ক্রাকেন'স নেস্ট দিলে আরও ভাল করত, মানাত ঠিকমত।...কিন্তু কথা হলো, যুদ্ধের পর পর তো জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে কড়া নজর ছিল মিত্রবাহিনীর। কিংসটনে কেউ ওকে চিনতে পারল না কেন?'

'বললাম না, খুব সতর্ক ছিল হেস। সাগর পাড়ি দেয়ার সময় বড় বড় দাড়িগোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল ওর, কাটেনি আর সেগুলো। তার ওপর ইয়াবড় এক সানগ্লাস পরেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুটো-রোদ থেকে চোখ বাঁচানো, চেহারাটাও যতটা সম্ভব ঢেকে রাখা। নরউইজন নাবিকের পোশাক পরা, রোদে পোড়া তামাটে চামড়া দেখে নিঃসঙ্গ নাবিকটি যে হিটলারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল, কল্পনাই করতে পারেনি কেউ। মোট কথা, একা ওই সাগর পাড়ি দেয়ার বুদ্ধিটাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওকে।'

'ওর জাহাজ সার্চ করেনি বন্দর কর্তৃপক্ষ?'

'করেছে।'

'নিশ্চয় টাকাপয়সা, সোনাদানা অনেক নিয়ে গিয়েছিল সে। নইলে বাড়ি কিনল কি দিয়ে? ওর ইয়ট সার্চ করে সেগুলো পায়নি ওরা?'

শ্রাগ করলেন ক্যাপ্টেন। 'ছিল না ওর সঙ্গে। বন্দরে নামার আগে নিশ্চয় অন্য কোনখানে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। কোথাও না থেমে সরাসরি জ্যামাইকাতেই গিয়েছিল, এরকম কোন প্রমাণ নেই।'

'ওর জ্যামাইকাবাসের খবরটা জানা গেল কি করে শেষ পর্যন্ত?'

'হেস হফনার, ওরফে গানো ক্রাগেন মারা যাওয়াতে। স্বাভাবিক মৃত্যু। বুড়ো হয়ে মারা গেছে।'

'পরিচয় ফাঁস হলো কি করে?'

'যত চালাকই হোক, কিছু না কিছু দুর্বলতা সব মানুষেরই থাকে। গানো ক্রাগেনের আলমারিতে হিটলারের সুপারিশ করা একটা চিঠি পাওয়া গেছে, আর হিটলারের সই করা হেস হফনারের একটা ছবি। জিনিসগুলোর প্রতি নিশ্চয় খুব দুর্বলতা ছিল হেসের, হিটলারের হাতের লেখা আর সই বলে মূল্য দিত, হাতে ধরে তাই নষ্ট করতে পারেনি। ওগুলো বাদে, অতীত প্রকাশ করে দিতে পারে এমন কোন জিনিসই রাখেনি সে, সব নষ্ট করে ফেলেছিল।'

'কদ্দিন আগের কথা?'

'পনেরো দিন।'

'ব্রন ডুগান এর মধ্যে ঢুকল কি করে?'

'পত্রিকায় ক্রাগেনের মৃত্যু-সংবাদ দেখেছে হয়তো। কিংবা এখান থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জ্যামাইকায়, পুরানো বন্ধু হেসের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার জন্যে। এমন হতে পারে, সে গিয়ে পৌঁছার আগেই মরে গেছে হেস, কবরও দেয়া হয়ে গেছে। যে কারণেই গিয়ে থাকুক ডুগান, সে যে এখন জ্যামাইকায় এ ব্যাপারে আমরা শিওর।'

'মারা গেছে এ খবর জানলে বোধহয় যেত না।'

'মজাটা ওখানেই। মারা গেছে জানলেই আরও বেশি করে যাবে। বিশেষ করে ডুগানের বর্তমান অবস্থায়। পুলিশ পিছে লেগে আছে। পকেটে পয়সা নেই। দুটো কারণে হেসের বাড়িতে যাবে সে-টাকা এবং সেইসঙ্গে লুকিয়ে থাকার সুবিধা। হেসের প্রচুর সম্পদ আছে, সেটা টাকার নোটেই হোক, কিংবা সোনায়ই হোক। সোনা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেগুলো কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে সে। নগদ টাকাও ছিল ওর। প্রচুর আমেরিকান ডলার পাওয়া গেছে ওর বাড়িতে।'

'সোনা বেচে পেয়েছে, এ তো বোঝাই যায়। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, এতদিনে নিশ্চয় আর ফেলে রাখেনি। তুলে এনে এনে বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। অতএব সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ডুগানের।'

'ডুগান শুধু সোনার পেছনে লাগলে দুশ্চিন্তা করতাম না। আরও জিনিস ছিল হেসের কাছে, যেগুলো আমাদের প্রয়োজন-যুদ্ধের সময়কার জরুরী দলিলপত্র। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর একটা জিনিস…ভি এইটিনের নাম শুনেছ?'

এতক্ষণে উত্তেজনা দেখা দিল কিশোরের চেহারায়। 'ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র!

যুদ্ধের শেষ দিকে এর ফর্মূলা তৈরি করেছিল জার্মান বিজ্ঞানীরা। কাজে লাগাতে পারেনি। পারলে মিত্রবাহিনীকে কাবু করতে সাতদিনও লাগত না হিটলারের। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আর কি বোমা ফেলেছে। ভি এইটিনকে উন্নত করতে পারলে মুহূর্তে পৃথিবীটাকেই উড়িয়ে দেয়া যায়…'

'তাহলে বুঝতেই পারছ এই জিনিস খারাপ লোকের হাতে পড়লে কি মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। যুদ্ধের পর পর ওই গবেষণাগারের একজন এঞ্জিনিয়ার ধরা পড়েছিল আমেরিকানদের হাতে। সে বলে দেয়, ফর্মূলাটা জার্মান নেভির কাছে হস্তান্তরের জন্যে খুব গোপনে তুলে দেয়া হয় হেসের কাছে। যুদ্ধের অবস্থা বেগতিক দেখে ওটা নিয়েই পালিয়ে যায় হেস, পরে সুযোগমত নেভিকে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় তার। কিন্তু দেয়া আর হয়নি। তার আগেই পতন ঘটল জার্মানির।'

'হেসের আলমারিতে ছিল না ওটা?'

'থাকলে তো পেয়েই যেতাম। ওর ক্র্যাকেনের বাসা–তোমার নামটাই ব্যবহার করছি,' হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফর্মূলার কোন চিহ্ন মেলেনি। সব কিছু সিল করে দিয়ে গেছে পুলিশ। বাড়ির যে দারোয়ানটা ছিল, তাকে বহাল রাখা হয়েছে। সামান্য দেরিতে খবরটা পেয়েছি আমরা, তাই খবরের কাগজে সংবাদ ছাপানো বন্ধ করতে পারিনি। তবে অন্য কিছু যেন আপাতত না ছাপে, এমব্যাসির মাধ্যমে প্রেসকে অনুরোধ করেছি। গানো ক্রাগেন নামেই কবর দেয়া হয়েছে হেসকে। ওর আসল নামটা ফাঁস হয়নি এখনও। মোটামুটি এই অবস্থায়ই আছে এখন কেসটা।'

'ডুগান যে ওখানেই আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তাহলে?'

'না। ও, আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, মৃত্যুর আগে কাকে যেন চিঠি লিখছিল হেস। জার্মান ভাষায়। শেষ করতে পারেনি। আনানোর ব্যবস্থা করেছি। ডুগানের আগের কেসটা আমিই ডিল করেছি বলে এবারেও আমাকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চিঠিটার ইংরেজি অনুবাদ করিয়েছি। তাতে কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। চিঠিটা ছাড়া আরও দুটো জিনিস পাওয়া গেছে হেসের ডেস্কে, যেগুলো আমাদের আগ্রহ জাগিয়েছে–ঠিকানা লেখা একটা খাম, আর একটা স্কেচ। নকশা-টকশা হতে পারে। সম্ভবত ওটাও অসমাপ্ত, কারণ মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যায়নি। খামে লেখা ঠিকানায় নাম রয়েছে হের উইলফোর ফন ডুগান, হোটেল প্রিনজ্ কার্ল, জিনদানপ্লাৎজি, বার্লিন। অতএব ধরে নিতে পারি চিঠিটা ডুগানকেই লিখেছিল হেস।'

'হুঁ। নিজের নামটাকে সামান্য এদিক ওদিক করে জার্মান বানিয়ে প্রিনজ্ কার্ল হোটেলে উঠেছিল ডুগান। তাই তো?'

'তাই। চিঠি শুরু করেছে "ডিয়ার উইল" দিয়ে। ডুগান যে নাম ভাঁড়িয়ে ওখানে আছে, নিশ্চয় জানত হেস। দাঁড়াও, পড়েই শোনাই।'

ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করলেন ক্যাপ্টেন। তাতে রেখেছেন অনুবাদ করা কাগজটা। খুলে পড়তে শুরু করলেন, 'ডিয়ার উইল, অনেক দিন

পর তোমাকে লিখছি। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, এখানে যদি কোন গণ্ডগোল হয়ে যায়, তোমাকে একটা বিশেষ জিনিস দেব যেটার সদ্ব্যবহার করতে পারলে লাভবান হবে তুমি। কিসের কথা বলছি আশা করি বুঝতে পারছ। সেই সময় এখন উপস্থিত। ডাক্তার রায় দিয়ে দিয়েছেন, আমার দিন শেষ, যে কোন মুহূর্তে বিদায় নিতে হতে পারে আমার। এবং সেটা ঘটবে অকস্মাৎ। হয়তো এই চিঠিও শেষ করে যেতে পারব না আমি। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে লিখতে বসেছি। যা বলি, মন দিয়ে শোনো। কাগজপত্র, ইত্যাদি সব নিরাপদ জায়গাতেই আছে; আর...'

মুখ তুললেন ক্যাপ্টেন। 'ব্যস, এই। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে লিখতে বসেছিল হেস। চিঠিটা সত্যি সত্যি শেষ করতে পারেনি।'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মানুষের মৃত্যুটা স্বাভাবিক, অথচ ভাবতে গেলে কি অদ্ভুত লাগে!...সূত্র তাহলে এইটুকুই?'

'ডুগান হয়তো আরও কিছু জানে।'

'যে জিনিসটার ইঙ্গিত দিয়েছে হেস, সেটা কি, তা তো নিশ্চয় জানে।'

'ইঙ্গিতটা আমাদের কাছেও পরিষ্কার। আমরাও অনুমান করতে পারছি।'

'স্কেচটার কথা বলুন।'

'যদ্দূর মনে হয়, চিঠিটার সঙ্গেই ওটা পাঠানোর চিন্তা করেছিল হেস। তেমন কিছুই না। একটা রেখাচিত্র, কাছাকাছি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকা।'

'আছে নাকি?'

বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। দেখে মনে হয় একটা ডিম আঁকতে চেয়েছিল হেস, কিংবা নিচের দিক সরু আপেল। একপাশে দাগ দেয়া। দাগের কাছাকাছি একটা বর্গক্ষেত্র। নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ধরে রেখে নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, সত্যি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'এত তাড়াতাড়িই নিরাশ করে দিলে? আমার কিন্তু আশা ছিল, আর কেউ না বুঝলেও তুমি এর অর্থ উদ্ধার করে ফেলতে পারবে...'

'পুলিশের বিশেষজ্ঞের চেয়েও আমাকে বুদ্ধিমান ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছি। এ ধরনের কাজে আমার জানামতে যত বিশেষজ্ঞ আছে—পুলিশেরই হোক, যারই হোক, তার মধ্যে তুমি সেরা। এজন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

'ও, শুধু নকশার মানে বের করার জন্যে,' এবার নিরাশ হবার পালা কিশোরের। 'আমি তো ভাবছিলাম, এই সুযোগে জ্যামাইকা ভ্রমণটাও হয়ে যাবে।'

জবাব না দিয়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। গোটা দুই টান দিয়ে গোড়াটা পিষে ফেললেন অ্যাশট্রেতে।

'সোনা আর ফর্মুলাটা আশেপাশের কোন দ্বীপে লুকিয়ে রাখেনি তো হেস?'

কিশোর বলল।

'রাখতে পারে। তবে আমার তা মনে হয় না। কেন হয় না, বলছি। হেসের একটা ইয়ট ছিল, ইয়টে করে বেড়াতেও বেরোত সে। দূর-দুরান্তে চলে যেত। সব সময়ই একা। প্রথমে আমরা ভেবেছি, দ্বীপের স্কেচই এঁকেছে সে। ছোটখাট কোন দ্বীপ, ক্যারিবিয়ানে তো ওগুলোর সীমা-সংখ্যা নেই। জ্যামাইকায় ঢুকেছিল সে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে। ওখানে কি পরিমাণ দ্বীপ আছে জানোই তো।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'উনত্রিশটা বড় দ্বীপ, ছোট দ্বীপ ও উপদ্বীপ মিলিয়ে ছয়শো ষাটটা, আর অতি খুদে দ্বীপ আছে দুই হাজার চারশোর বেশি। ওগুলোর কিছু কিছু আবার ঢেউ আর জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি বদলায়।'

'তাহলেই বোঝো।'

'সেজন্যেই বলছি, কোন একটা দ্বীপে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছে হেস। বাড়িতে রাখেনি, যে কারও হাত পড়ে যাওয়ার ভয়ে।' স্কেচটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এটা আসলটা?'

'হ্যাঁ।'

'ইনটারেস্টিং!'

'কেন?'

'কাগজটা দেখেছেন, টিস্যু পেপার।'

'তাতে কি?'

'এই কাগজ ব্যবহার করার নিশ্চয় কারণ আছে। লেখার টেবিলে কেউ সাধারণত টিস্যু পেপার রাখে না। কাগজের অভাব হবার কথা নয় হেসের। এই কাগজ নিল কেন?'

'কোন বিশেষ কারণ আছে ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

'একটা কারণের কথাই ভাবছি, কোন কিছুর ছাপ নিতে চেয়েছিল হেস। ম্যাপ থেকে হতে পারে। সাধারণ অস্বচ্ছ কাগজে তার কাজ চলছিল না। যেটা ব্যবহার করেছে সেটা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা স্বচ্ছ, কাজ চালিয়ে নিয়েছে। তবে এটা একটা সম্ভাবনা। ছাপ নিয়েছেই, সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এমনও হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে কাগজ পেয়েছে তাতেই ছবিটা এঁকে ফেলেছে হেস।'

'হুঁম্!' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন, 'ছাপ দেয়ার ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত।'

'আমার ধারণা সত্যি হলে,' উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল কিশোর, 'যে জিনিসের ছাপ নিতে চেয়েছিল সে, সেটা এখনও তার ঘরেই আছে। ডুগান সেটা নিয়ে যাওয়ার আগেই হস্তগত করা দরকার।...আছে কোথায় এখন সে?'

'ম্যাইসন রেসপিরো নামে এক বোর্ডিং হাউসে, জার্মান মদ বিক্রেতার ছদ্মবেশে। রাইন ওয়াইনের গুণগান করে বেড়াচ্ছে।'

'হেসের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পাবে?'
'না।'
'কিন্তু ঢোকার চেষ্টা অবশ্যই করবে।'
'তা তো করবেই। সেজন্যেই তো পাহারাদার রাখা হয়েছে।'
'হেসের মৃত্যুর সময় বাড়িতে কোন চাকর-বাকর ছিল না?'
'ছিল। রান্নাঘরে। দারোয়ান ছিল বাগানে। রাঁধুনি মারগারেট জোয়ালিন নামে এক নিগ্রো মহিলা তার অন্যান্য কাজকর্মও করে দিত, ঘরদোর দেখাশোনা করত। কিন্তু হেসের মৃত্যুর পর আর বাড়ির ধারেকাছেও আসতে চায় না,' হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তার ধারণা, হেস যেভাবে মারা গেছে, তাতে তার আত্মা অতৃপ্ত রয়ে গেছে। আর অতৃপ্ত আত্মারা বাড়ির কাছছাড়া হতে চায় না, যে আসে তারই ঘাড় মটকায়।'
কিশোরও হাসল, 'ধারণাটা একেবারে ভুল নয়। ডুগানের পথে বাধা সৃষ্টি করলে ঘাড়টা ঠিকই মটকে দেবে।...মারগারেট ছাড়া আর কেউ নেই, যে কোন তথ্য দিতে পারে? মানে, অতদিন একটা জায়গায় থাকলে তো বন্ধুবান্ধব জুটে যাওয়ার কথা।'
'মারগারেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কারও নাম বলতে পারল না সে। একা বাস করত হেস, নিজের মত থাকত, কারও সঙ্গে খাতির করতে যেত না। তবে রিচার্ড ডেভনশায়ার নামে তার এক পড়শী আছেন। অবসরপ্রাপ্ত নাবিক, যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যেতেন। তবে দশ-বারোবারের বেশি যাননি। হেস গেছে তাঁর বাড়িতে সাকুল্যে দু'তিনবার। একটা ব্যাপারে দুজনের আগ্রহ ছিল, কথাবার্তা যা হয়েছে শুধু ওটা নিয়েই–নেচারাল হিস্টরি। ওয়েস্ট ইনডিজের পাখির ওপর একটা বই লিখছেন কমান্ডার।'
'ইয়ট নিয়ে কোথায় বেড়াতে যায়, কখনও কিছু বলেনি তাঁকে হেস?'
'না। এখানেও একটা খটকা আছে। এক নাবিক আরেক নাবিককে সাগরভ্রমণে সঙ্গে নেবে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কখনও তাঁকে যেতে বলেনি হেস। এটা নাকি অবাক লেগেছে কমান্ডারের।'
'হেসের আসল নামও জানতেন না?'
'না।'
চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'হেসের সাহসের তারিফ করতে হয়। জার্মান যুদ্ধাপরাধী হয়ে গিয়ে ব্রিটিশদের মাঝে ঠাঁই।'
'লুকিয়ে থাকতে হলে শত্রুর বাড়িতেই নিরাপদ–এই প্রবাদটা সত্যি প্রমাণ করেছে আরকি হেস।'
'তো, ডুগানের ব্যাপারে কি করবেন ভাবছেন?'
'আপাতত ওকে পাকড়াও না করে ওর ওপর নজর রাখার কথা ভাবছি। ওকে বুঝতেই দেব না যে ওকে আমরা সন্দেহ করছি। তাহলে পথ দেখিয়ে ফর্মুলাটার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে পুলিশের নাকের ডগা থেকে মাল নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত পিচ্ছিল লোক।'

'উঁহুঁ, সেটি পারবে না। পুলিশের অজান্তে বেরোতেই পারবে না দ্বীপ থেকে।'

'আপনি যাই বলুন, স্যার, ডুগানের ব্যাপারে এই বাজিটা ধরতে পারছি না আমি। আমেরিকা থেকেই এত এত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গায়েব হয়ে গেল। আর এখন তো রয়েছে বহুদূরে, আমেরিকান পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে, সম্পূর্ণ আরেক দেশে।'

'জ্যামাইকাতেও পুলিশ আছে। আমরা কিছু করতে অনুরোধ করলে ফেলবে না। বিশেষ করে একজন যুদ্ধাপরাধীর যেখানে তদন্ত হচ্ছে। তা ছাড়া মারণাস্ত্রের ফর্মূলা উদ্ধারের ব্যাপারটাও ফেলনা নয়, সারা পৃথিবীর স্বার্থ এতে জড়িত।'

'তা অবশ্য ঠিক।' সামান্য উসখুস করে বলল কিশোর, 'তাহলে এখন আমি যাই। যার জন্যে ডেকে এনেছেন, নকশাটার তো কিছু করতে পারলাম না...এটুকু দেখে অবশ্য কিছু করাও যাবে না। এর মর্ম উদ্ধার করতে হলে সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার।'

হাত তুললেন ক্যাপ্টেন, 'বসো। একটু আগে বলছিলে না, জ্যামাইকা ভ্রমণটা হয়ে যাবে। সেই সুযোগটা যদি পাও?'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের, 'তারমানে আমাকে যেতে বলছেন ওখানে?'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'শুধু তুমি একা নও, মুসা আর রবিনকেও নিতে পারো ইচ্ছে করলে। বিদেশ-বিভুঁই, সহকারী এবং বন্ধু থাকলে সুবিধে। আরও একজন লোক বিশেষ উপকারে আসবে তোমাদের, সঙ্গে নিলে বিরাট সাহায্য পাবে তার কাছ থেকে–ওমর শরীফ। আমার বিশ্বাস, ফর্মূলাটা খুঁজে বের করতে হলে আশেপাশের দ্বীপগুলোতে ঘোরাফেরা করতেই হবে তোমাদের। তার জন্যে দরকার একটা ব্যক্তিগত প্লেন, সেটা নিজেদেরই হোক, কিংবা ভাড়া। আর যে কোন ধরনের প্লেন চালানোর জন্যে ওমরের চেয়ে দক্ষ পাইলট কোথায় পাবে?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'তারমানে ওখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই আমাকে খবর দিয়েছিলেন?'

মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'শুরুতেই বলেছি, জটিল নকশার মর্ম উদ্ধার করার জন্যে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর আমার জানামতে কেউ নেই। তা ছাড়া ডুগানের সঙ্গে একটা ফাইট ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছ তোমরা। আরও একটা নাহয় দিলে। আমেরিকান পুলিশের ছাপ্পর মারা কোন এজেন্টকে পাঠালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে চিনে ফেলবে ডুগান, সতর্ক হয়ে যাবে। তোমাদের ব্যাপারে সেটা হবে না। যদিও দেখলে অবাক হবে, তোমরা জ্যামাইকায় কেন? তবে ভেবে নেবে ব্যাপারটা কাকতালীয়. তোমরা স্রেফ বেড়াতে গেছ ওখানে।

অতএব বুঝতেই পারছ, আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে তোমাদের জ্যামাইকা ভ্রমণের খরচ জোগানোর যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।'

দুই

সাতদিন পর।

জ্যামাইকার কিংসটন। সকাল শেষ। দুপুর শুরু হব হব করছে।

ওমরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। অবাক হয়ে দেখছে পামগাছ, সবুজ লন, আর টকটকে লাল ডেক চেয়ারে ঘেরা সীল সুইমিং পুল। একপাশে দাঁড়িয়ে বাজনার চর্চা করছে ঝলমলে রঙের পোশাক পরা ব্যান্ডবাদকরা। গরমের ট্যুরিস্ট সীজন শুরু হতে দেরি আছে। কিন্তু এখনই পৌঁছে গেছে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট। সাগরের ধারে কেউ সূর্যস্নান করছে, কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ বা টেবিল ঘিরে বসে কফি খাচ্ছে।

মুসা আর রবিন নেই ওদের সঙ্গে। কলাম্বাস বে'তে অতি পুরানো মডেলের একটা টুইন এঞ্জিন উভচর অটার বিমান পাহারা দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে ওরা। কাছেই প্রায় চোখে পড়ে না এমন একটা হোটেলও পেয়ে গেছে। ওদের ওখানে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে ওমরের সঙ্গে কিংসটন শহরে এসেছে পুলিশ চীফের সঙ্গে দেখা করে ওদের পরিচয় জানাতে। ওরা আসছে, ফোন করে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে, চীফকে দেখানোর জন্যে, যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয় ওদের।

জানা গেল, ব্রন ডুগান ওই শহরেই আছে। সারাদিন প্রায় কিছুই করে না। কখনও গোসল করে, কখনও সুইমিং পুলের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কাছের বাগানে বসে অলস সময় কাটায়। কিশোরের মনে হলো, জেনারেলের উপস্থিতিটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না পুলিশ।

হেসের বাড়ির প্রহরা ঠিকই আছে। চাবি আছে দারোয়ানের কাছে। ঘরের কোন জিনিস নড়ানো হয়নি। বন্দরের যেখানে নোঙর করা ছিল হেসের ইয়ট 'রোগ', সেখানেই আছে।

হেসের ঘর আর আলমারির চাবিগুলো চাইল ওমর। চীফ বললেন ওগুলো দারোয়ানের কাছে আছে। তিনি খবর পাঠাচ্ছেন, ওরা গিয়ে চাইলেই যাতে দিয়ে দেয়। অন্যের কাঁধে দায়িত্বটা তুলে দিতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন চীফ। বোঝা গেল, এত 'সাধারণ' ব্যাপার নিয়ে রোজ রোজ মাথা ঘামাতে তাঁরা নারাজ। ভঙ্গিটা এমন, ডুগান যদি কিছু করে থাকে সেটা আমেরিকায় করেছে, কিংসটনে তো আর করেনি, সুতরাং জ্যামাইকান পুলিশের কি? তাতে খুশিই হলো কিশোর। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সারাক্ষণ পুলিশ কাঁধের কাছে হুমড়ি খেয়ে থাকলে অসুবিধেই হত। সব কাজের কৈফিয়ত দিতে হত। ব্যাখ্যা করতে হত।

এখন ওদের প্রথম কাজ, হেসের বাড়িতে ঢুকে ভালমত সার্চ করা।

জরুরী কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখা। কিশোরের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ম্যাপ, চার্ট, ফটোগ্রাফ কিংবা ড্রয়িং থেকে যদি স্কেচটা করা হয়ে থাকে, সেটা ওই বাড়িতেই কোথাও আছে। না পাওয়া গেলেই পড়বে বেকায়দায়। আশপাশের সাগরে ডিম্বাকৃতি কিংবা আপেলের মত দেখতে কোন দ্বীপ আছে কিনা বের করার চেষ্টা চালাতে হবে তখন বিমান নিয়ে। উড়ে উড়ে আকাশ থেকে দেখতে হবে, নইলে আকৃতি বোঝা যাবে না। সাংঘাতিক কঠিন, কিংবা বলা যায় প্রায় অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করতে হবে এড়াবে।

আপাতত, ডুগানকে দিনের এই সময়টায় যেখানে দেখা যায়, সেই জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসেছে দুজনে। এরপরে যাবে হেসের বাড়িতে।

জরুরী কাজ ফেলে বাগানে বসে বসে সময় কাটায় ডুগান, অবিশ্বাস্য মনে হলো ওদের দুজনেরই। অদ্ভুত। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ওভাবে অলস সময় কাটানোর লোকই নয় জেনারেল। উদ্দেশ্যটা কি ওর? কিসের অপেক্ষা করছে? এভাবে সময় কাটালে কোন্ সুবিধেটা হবে?

এমন হতে পারে, তাড়াহুড়ার প্রয়োজন মনে করছে না ডুগান। হেসের বাড়ি থেকে দারোয়ান বিদেয় হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারপর বাড়িটা হয় কিনে নেবে, নয়তো ভাড়া নিয়ে বাস করতে থাকবে ওখানে। কারও সন্দেহ না জাগিয়ে পুরো বাড়িটা খুঁজে দেখতে কোন অসুবিধে হবে না তখন আর তার।

কেন বসে বসে সময় কাটাচ্ছে? জবাব ওই একটাই। তবু খুঁতখুঁতে ভাবটা কিছুতেই গেল না কিশোরের। 'ওই যে, বসে আছে। পুলের কিনারে, লম্বা চেয়ারটায়, বাথরোব পরা। বড় বড় দাড়ি।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখে ফেলল ওমর। 'আলখেল্লা দিয়ে শরীর ঢেকে ওভাবে সানবাথ্ হয় নাকি? থাকুক বসে। যা ইচ্ছে করুক। চলো, আমাদের কাজ সেরে ফেলি।'

গাড়িতে ফিরে এল দুজনে। দশ মিনিট চালিয়েই পৌঁছে গেল হেসের বাড়িতে।

রাস্তার পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল ওমর। 'লুকানোর জন্যে রীতিমত একটা জঙ্গল বেছে নিয়েছিল হেস। সৈকতটা দেখো!'

'জলদস্যুর বাড়ি, সৈকত তো সুন্দর হবেই। টিউ কি আর সাধারণ দস্যু ছিল।...কিন্তু আমি দেখছি রঙের বাহার! আহ্, কি রঙ!'

আকাশ এতই নীল, দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। সেই রঙের ছায়া ফেলে সাগরটাকেও করে তুলেছে একই রকম নীল। তার কিনারে বাঁকা চাঁদের মত ঝকঝকে রূপালী সৈকত। প্রবালের একটা বেদি যেন মাথা তুলে রেখেছে পানির ওপর। তাতে আছড়ে পড়ে হীরকের ফোয়ারা ছিটাচ্ছে নীলচে-সাদা ঢেউ। হিসহিস শব্দ তুলে সরে আসছে, প্রবালের বেদি ঘিরে রেখে আসছে তুষারশুভ্র ফেনার মালা। সৈকতের কিনারে এত বেশি নারকেল গাছ জন্মেছে, গাছের জঙ্গল মনে হয়। ওগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে বাসনের মত বড় বড় পাতাওয়ালা আঙুরলতা। বাড়ির পেছনে বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে ভূমি। তাতেও বিশাল ফার্ন ঘন জঙ্গল তৈরি করে রেখেছে। তার মধ্যে আবার

বুগেনভিলা, জেসমিন আর হিবিসকাস ফুলের হুড়াহুড়ি। বাতাসে পোকামাকড় আর মৌমাছির একটানা গুঞ্জন নেশা ধরায়। কান পেতে শুনতে গেলে আপনা থেকে বুজে আসে চোখ।

'স্বপ্নের জগৎ, তাই না?' নেশাটা ধরেই গেল যেন ওমরের। বিড়বিড় করে বলল, 'বাস্তব মনে হয় না।' গাড়ি থেকে গেটের দিকে এগোল সে। গাছপালার জন্যে বাড়িটা চোখে পড়ছে না। তবে গেট যেহেতু আছে, বাড়িও আছে নিশ্চয়।

ঠিকানা দেখে বোঝা গেল ভুল বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল সে। এই এলাকায় মাত্র দুটো বাড়িই আছে। তারমানে এটা হেসের পড়শী রিচার্ড ডেভনশায়ারের।

একশো গজ দূরে রঙচটা, প্রায় ধসে পড়া একটা গেটের পাশে অস্পষ্ট হয়ে আসা অক্ষরে নেমপ্লেট দেখা গেল:

ড্রাগেন'স নেস্ট

গেটের ভেতরে ঢুকে শ্যাওলায় ঢাকা একটা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাল ওমর। আম আর কলাগাছের জঙ্গল হয়ে আছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা রাঙাআলুর গাছ যেন যুদ্ধ করছে আগাছার জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। গাছপালায় ঘেরা বাড়িটা চোখে পড়ল অবশেষে। বহু পুরানো ওটা, জানা আছে ওদের, তবে এতটা পুরানো ভাবতে পারেনি। বেশির ভাগ জানালার খড়খড়ি নামানো। পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

এত নীরবতার মাঝে মানুষ থাকে কি করে ভাবতে অবাক লাগল কিশোরের। চারপাশে তাকিয়ে দারোয়ানকে খুঁজতে শুরু করল। কোথাও দেখা গেল না ওকে।

গাড়ি থেকে নেমে এগোল দুজনে। সামনের দরজার পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে। ঠেলে সেটা খুলে ফেলল ওমর। ভেতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে গেল।

হলঘরেই আছে দারোয়ান। ওদের স্বাগত জানাতে কিংবা কেন ঢুকেছে জিজ্ঞেস করতে উঠে এল না। আর্মচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে অচেতন। স্থানীয় লোক। বাদামী চামড়া। আঙুলের ফাঁক থেকে কার্পেটে খসে পড়েছে জ্বলন্ত সিগারেট। নীল ধোঁয়ার একটা সরু রেখা পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

দারোয়ানের দায়িত্ব পালনের নমুনা দেখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওমর। মুচকি হেসে লোকটার কাঁধ ধরে ঠেলা দিল।

নড়ল না দারোয়ান।

আরও জোরে ঝাঁকি দিল ওমর।

তাতেও সাড়া দিল না লোকটা।

ওমরের মুখের হাসি হাসি ভাবটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। ভ্রুকুটি করে দারোয়ানের এক চোখের পাতা তুলে ধরে কালো মণিটা দেখল। শক্ত হয়ে গেল চোয়ালের পেশি। নিচু হয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। খোলা দরজা দিয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলে ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে সাবধান করল যাতে কথা না বলে। হল থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটার দিকে

তাকাল।

কি সন্দেহ করেছে ওমর, বুঝে ফেলল কিশোর।

তিনটে দরজা আছে ঘরে। দুটো দুই পাশে, তৃতীয়টা বেশ দূরে, পেছন দিকে। তিনটেই বন্ধ। তবে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খুট করে একটা শব্দ কানে এল, ডানের সবচেয়ে কাছের দরজাটার ওপাশ থেকে। পা টিপে টিপে সেটার দিকে এগিয়ে গেল ওমর। হাঁটু মুড়ে বসে কী-হোল দিয়ে অন্যপাশটা দেখল। ফিরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কিশোরকে বুঝিয়ে দিল কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তালার ফুটোয় চাবিটা ঢুকিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তখনও একইভাবে নাক ডাকাচ্ছে দারোয়ান।

চীনামাটির তৈরি পুরানো আমলের ডোর-নবটা চেপে ধরল ওমর। খুব সাবধানে মোচড় দিল। আস্তে করে খুলে গেল পাল্লাটা। একটু শব্দও হলো না। তবু বোধহয় চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া দেখে কিংবা বাতাস লাগাতে ঘুরে তাকাল লোকটা। ডেস্কে ঝুঁকে কি যেন দেখছিল। মুখোমুখি হলো দুজনে।

পুরো পাঁচটা সেকেন্ড একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনেরই কথা আটকে গেছে যেন।

কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে। বিশ মিনিট আগে যাকে দেখে এসেছে সুইমিং পুলের ধারে, সেই লোক আলখেল্লা ফেলে দিয়ে শার্ট-প্যান্ট পরে চলে এসেছে ওদের আগে আগে, কি করে সম্ভব হলো সেটা? সামনে দাঁড়ানো লোকটা যে জেনারেল ব্রন ডুগান তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল ধীরে ধীরে।

আগে কথা বলল ওমর, 'এভাবে চোরের মত অন্যের ঘরে ঢুকে পড়বেন, এটা আশা করিনি, জেনারেল।'

'ভুল করছেন আপনি, ওমর,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ডুগান, 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি আমি এখানে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' শীতল কণ্ঠে বলল ওমর। 'তা সেই বিশেষ কাজটা কি, জানতে পারি কি? কি খুঁজতে এসেছেন?'

'খুঁজতে এসেছি কে বলল আপনাকে? ব্যবসা করতে এসেছি। রাইন ওয়াইনের এজেন্সি নিয়েছি আমি, জানেন না বোধহয়। বিক্রি করার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরছি।' দরজার ঠিক পাশেই রাখা একটা ব্যাগ দেখাল ডুগান। 'চেখে দেখবেন নাকি? দেব বের করে?'

'লাগবে না। ওসব পচা জিনিস গিলে লিভার নষ্ট করার কোন আগ্রহ আমার নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে বাড়ির চাকর-দারোয়ানদের নেশার জিনিস দিয়ে ঘুম পাড়ানো লাগে নাকি?'

শ্রাগ করল ডুগান। 'মিস্টার হেস...মানে ক্রাগেনের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। ভদ্রতা করে দারোয়ানটাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়েছিলাম। কি করে জানব, কড়া জিনিস সইতে পারে না সে?'

'যে জিনিস দিয়েছেন সেটা আপনিও সইতে পারবেন না।'

'বাড়ির মালিককে তো পেলাম না,' ওমরের কথাকে যেন পাত্তাই দিল না ডুগান। 'থাক, পরেই আসব।' এগিয়ে এসে নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিল। 'একটা কথা বলি, আমাকে দেখে আপনি যেমন অবাক হয়েছেন, হঠাৎ করে আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখে আমিও হয়েছি। চলি।'

অবাক হয়ে দেখছে কিশোর, বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করছে না ওমর। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঘুরল ডুগান। তার স্বভাবসুলভ নির্মল হাসি হেসে বলল, 'কাকতালীয় হলেও, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো, মিস্টার ওমর। নইলে জানতেই পারতাম না আপনারাও এখানে চলে এসেছেন। রাইন ওয়াইনের ব্যাপারে আপনার ধারণার পরিবর্তন হলে দয়া করে জানাবেন আমাকে।'

'তারমানে কিছুদিন থাকছেন এখানে?'

'বলা মুশকিল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল ডুগান। 'সেটা নির্ভর করবে আমার ব্যবসা কতখানি ভাল চলে তার ওপর।... ব্যবসাটা অবশ্যই মদের, অন্য কিছু ভেবে বসবেন না আবার।'

'কেন, আরও কোন ব্যবসা করছেন নাকি?'

এবারের প্রশ্নটাও যেন শুনতে পেল না, এরকম ভঙ্গিতে ওমরের কাঁধের ওপর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ডুগান। আবার নজর ফেরাল ওমরের দিকে। 'আপনারা বোধহয় থাকছেন কিছুদিন?'

'সত্যি কথাটাই বলি, জেনারেল,' চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলল ওমর, 'থাকব তো বটেই। বলা যায় না, এ বাড়িতেও থেকে যেতে পারি।'

'এ বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আমিও এখানে থাকার কথা ভাবছিলাম। বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। যাকগে, হলেই যে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। সাবধান থাকবেন, মিস্টার ওমর, বাগানে কিন্তু সাপ আছে।'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে। 'সাপকে ভয় পাই না আমি। ওসব শয়তান প্রাণীগুলোকে কি করে সামাল দিতে হয়, জানা আছে আমার।'

'সবচেয়ে বড় সাপুড়েও অনেক সময় সাপের কামড়েই মারা যায়, মিস্টার ওমর। চলি। গুড-বাই।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল ডুগান।

'যেতে দিলেন?' ওমরের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'আর কি করতে পারতাম? এমন কোন অপরাধ করেনি যে আটকাব। খুব খারাপ হয়ে গেল।'

'কি?'

'আমাদের এ বাড়িতে ঢুকতে দেখে ফেলাটা। অন্য কোথাও দেখলে হয়তো সন্দেহ করত না, কিন্তু একেবারে হেসের বাড়িতে···ঠিকই বুঝে যাবে ও, জ্যামাইকায় কিজন্যে এসেছি আমরা। সাবধান হয়ে যাবে। পিছে লাগবে এখন জানা কথা। শান্তিতে আর কাজ করতে দেবে না।'

'বিনা অনুমতিতে বাড়িতে ঢোকার অপরাধে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া যায়।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। যে জিনিসটা নিতে এসেছিল সে, যদি নিয়ে গিয়ে থাকে, আদায় করতে পারব না।'

'আমার মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি ওটা নিতে পেরেছে সে। সময়ই পায়নি। দারোয়ানকে দেয়া সিগারেটটাও পুড়ে শেষ হয়নি। তারমানে বড়জোর এক কি দুই মিনিট ছিল হেসের ঘরে। তা ছাড়া জিনিসটা হাতে পেয়ে গেলে একটা মুহূর্তও আর এ দ্বীপে দেরি করত না সে। পালাত!'

'হ্যাঁ। পুলিশকে বলেও আসলে কোন লাভ নেই। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই ওর বিরুদ্ধে আমাদের। চুরি করে ঢোকেনি, দারোয়ানই সাক্ষি দেবে। দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে ঢুকেছে, তাকে সিগারেট অফার করেছে। দারোয়ান সেটা নিজের ইচ্ছেয় নিয়েছে–সিগারেটে কি ছিল না ছিল সেটা কোন ব্যাপার না। ওতে যে মাদকদ্রব্য ছিল স্রেফ অস্বীকার করবে ডুগান। দোষটা পড়বে গিয়ে তখন দোকানদারের ঘাড়ে, যেখান থেকে সিগারেট কিনেছে সে। তার চেয়ে ছাড়া থাকাই ভাল। আমাদের দেখে ফেলে একদিকে যেমন ভাল হয়েছে, আরেক দিকে খারাপও হয়েছে। একটা উদ্বেগের মধ্যে পড়ে যাবে। শান্তিতে কাজ উদ্ধার করার আশা তার শেষ।'

'তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি, আমাদের আগেই এসে হাজির হলো কি করে সে?'

'হতবাক তো হয়ে গিয়েছিলাম আমিও সেজন্যেই।'

'এর একটাই জবাব হতে পারে, সুইমিং পুলে যাকে দেখেছি আমরা, সে ডুগান নয়।'

'কি বলো!'

'হ্যাঁ, তাই। এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। ওই লোক ডুগান হয়ে থাকলে আমাদের আগে কোনমতেই গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।'

'কিন্তু দুজন লোকের অবিকল এক চেহারা, অতিরিক্ত কাকতালীয় হয়ে গেল না ব্যাপারটা?'

'কাকতালীয় কিছু নেই এর মধ্যে।'

'মানে?'

'কাউকে ব্রন ডুগান সাজিয়ে ডুগান নিজেই বসিয়ে দিয়ে এসেছে। ওর চালাকিটা সফল হয়েছে। পুলিশ, আমরা–যারাই চোখ রেখেছি, সবাইকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছে। রোজই এই কাজ করে সে। অতিরিক্ত সাবধানতা। সে ধরেই নিয়েছিল, কেউ নজর রাখতে পারে তার ওপর। না রাখে তো ভাল, কিন্তু যদি রাখে, তাহলে যাতে ধোঁকায় পড়ে। ফাঁকতালে সে তার নিজের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে।'

'ওর চেহারার কাউকে পেয়ে যাবে এই দ্বীপে, এটাও বিশ্বাস করা কঠিন।'

'সেটা করছিও না আমি। নিজের চেহারার সাথে মোটামুটি মেলে এমন

একজনকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আর যে পোশাকে সাজিয়েছে, তাতে অতটা মিল না থাকলেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব। দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা, বিরাট চশমা, আলখেল্লা পরা···জানা না থাকলে আলাদা করে চেনাটা কঠিনই। আর,' নাকের ডগা চুলকাল কিশোর, 'একজন যদি আনতে পারে, বেশিও আনা যায়। হয়তো দু'তিনজন সহকারী নিয়ে এসেছে সে।'

'হুঁ, তা পারে। ভয় দেখানোর সাহসটা পেল বোধহয় সেজন্যেই। সাপের ভয় দেখানোটা তো স্পষ্ট হুমকি।'

'সে তো বোঝাই গেল।'

'জ্যামাইকায় বিষাক্ত সাপ আছে নাকি?'

'কেন, ভয় পাচ্ছেন?' হাসল কিশোর। 'ঠিক জানি না। তবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ফার-ডি-ল্যান্স নামে মারাত্মক বিষাক্ত সাপ আছে।'

'বিষাক্ত সাপকে ভয় না পাওয়াটাই বোকামি। সেটা ফার-ডি-ল্যান্সই হোক, আর ডুগানই হোক। ভয় পেলে সাবধান থাকে মানুষ, আর সাবধান থাকলে বিপদ এড়ানো সহজ হয়।' ভুরু নাচাল ওমর, 'কি করবে এখন? ম্যাপ খুঁজবে?'

'সেটা পরে করলেও চলবে। আগে চলুন, সুইমিং-পুলের নকল ডুগানের সঙ্গে গিয়ে দেখাটা সেরে আসি। ডুগানের হুমকিকে কতটা কেয়ার করতে হবে, ওই লোকটার সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে।'

'তা মন্দ বলোনি। চলো।'

হলঘরে বেরিয়ে দেখল, হাই তুলছে দারোয়ান। আড়মোড়া ভাঙল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ঘোর কাটেনি এখনও। ওমর আর কিশোরকে দেখে জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনারা?'

'তোমার বস্ যাদের কাছে চাবি দিতে বলেছেন,' কিছুটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিল ওমর। 'দাও। দিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমাওগে, যাও।'

'ঘুমাতে যাব?'

'তো আর কি করবে? পাহারা দেয়ার নমুনা তো দেখলাম। দাও, চাবি দাও।'

চাবির গোছাটা দিয়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিল ওমর। কিশোরকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল। রওনা হলো সুইমিং পুলে।

রাস্তায় কড়া নজর রাখল কিশোর, ডুগানকে দেখা যায় কিনা। গেল না। সাগরতীরের পথটা ধরে গেছে হয়তো সে।

সুইমিং পুলের কাছে এসে গাড়ি পার্ক করে নামল দুজনে। সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে আছে ডুগানের নকল। গায়ে বাথরোব জড়ানো। পত্রিকা পড়ছে।

'ব্যাপারটাই তো সন্দেহ জাগানোর মত,' ওমর বলল। 'এখন লাঞ্চের সময়। এ সময় পত্রিকা পড়ে নাকি কেউ? ওই পোশাকে বসে!'

সুইমিং পুলের দিকে এগোল সে আর কিশোর।

কাছাকাছি এসে দেখা গেল, ডুগানের চেহারার সঙ্গে ভালই মিল আছে

লোকটার। উচ্চতা একই রকম। তবে ওজন কিছুটা বেশি। সেটা কাছে থেকে ভাল করে না তাকালে ধরা যায় না। যারা চেনে দূর থেকে দেখলে তাদেরও ডুগান বলে ভুল করাটা স্বাভাবিক।

নড়াচড়া লক্ষ করেই বোধহয় মুখ তুলে তাকাল লোকটা। চোখাচোখি হয়ে গেল কিশোরের সঙ্গে। একধরনের অদ্ভুত শীতল চাহনি। অক্টোপাসের চোখের মত। ভয় ধরায়।

'অন্ধকার রাতে ওর সঙ্গে কোন কানাগলিতে ঢুকতে সাহস পাব না আমি,' ওমর বলল, 'কখন পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়!'

দাঁড়াল না ওরা। এগিয়ে গেল কিছুটা সামনে। সাদা পোশাক পরা একজন বুড়ো ওয়েইটার টেবিল মুছছে। খেয়ে উঠে গেছে কয়েকজন লোক। সেটাতে বসল দুজনে। বুড়ো আঙুল কাত করে নকল ডুগানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'ওই ভদ্রলোকের নাম জানো?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ওয়েইটার, 'না, স্যার। দু'একবার ড্রিংক দিয়েছি, কথা তেমন হয়নি। বিদেশী। বিচিত্র কয়েকজন দোস্ত আছে। ওই যে, আসছে একজন।'

'বিচিত্র' দোস্তটা নকল ডুগানের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় কিছু বলল। সামান্য মাথা নোয়াল নকল ডুগান। দ্বিতীয় লোকটার গায়ের রঙ কালচে-বাদামী, নিগ্রোদের মত পুরো কালো নয়। চেহারায় আহামরি কিছু নেই। বেশ লম্বা। কিশোরের দৃষ্টি যে জিনিসটা আকর্ষণ করল, সেটা ওর পোশাক। কড়া ইস্ত্রি করা হালকা নীল রঙের ট্রাউজার–হাঁটুর কাছে প্রচুর ভাঁজ, চৌকো কাঁধওয়ালা কোমরচাপা জ্যাকেট, নিচে অনেক বড় একটা বোতাম। মাথার চওড়া কানাওয়ালা হ্যাটের কানা কপালের ওপর টেনে নামানো। লাল টাইতে ছাপ মারা বড় বড় ফুল, সোনার টাই পিন। বহু পুরানো আমলের পোশাক, পুরানো ডিজাইন। সব মিলিয়ে হাস্যকর। কেবল হাঁটার ভঙ্গি দেখে সেটা মনে হয় না, তাতে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা।

ওয়েইটারের দিকে তাকাল ওমর। 'বিচিত্র শব্দটার ব্যবহার একদম সঠিক হয়েছে। চিড়িয়াটার নাম জানো নাকি?'

'ফ্রিক সায়ানাইড।'

'বাপরে, নামটাও তো বিষাক্ত,' কিশোর বলল, 'পটাশিয়াম সায়ানাইডের জাতভাই হবে হয়তো।'

'একেবারে মিথ্যে বলোনি। ফ্রিকি সায়া বলে ডাকে সবাই,' ওয়েইটার বলল। 'এক ডাকে চেনে। গণ্ডগোল পাকানোর ওস্তাদ। ত্রিনিদাদে ছিল। স্যাগা বয়েজদের নেতা। বহুত খুনখারাবি করেছে। এখানে যে কোন্ শয়তানি করতে এসেছে, ঈশ্বরই জানেন!'

'স্যাগা বয়েজটা কি জিনিস?'

'চোর থেকে শুরু করে গলাকাটা ডাকাত পর্যন্ত যত ধরনের অপরাধী আছে, সবগুলোর মিশ্রণ।'

'ও। তা নেতাজী এখানে কোথায় থাকেন?'

'ডাঙহিলে।'

'বাহ্, জায়গার নামটাও তো বেশ,' না হেসে পারল না কিশোর। 'ডাঙ, মানে গোবর, হিল মানে পাহাড়; অর্থাৎ গোবরের পাহাড়।' কথাটা শুধু ওমর বুঝল, কারণ বাংলায় বলেছে কিশোর, ওয়েইটার বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

ভুরু নাচিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'কোন দিকে ওটা?'

'রেল স্টেশন থেকে একটু দূরে। আপনাদের মত ভাল মানুষদের ওদিকে না যাওয়াই ভাল।...কিছু খাবেন?'

'না,' মাথা নাড়ল ওমর, 'পরে।'

চলে গেল ওয়েইটার।

কয়েকটা পামের নিচে ছায়ার মধ্যে চেয়ার পাতা দেখে এগিয়ে গেল ওমর। কিশোরকে বলল, 'এখানে বসে দেখা যাক কি ঘটে। ভাল চিড়িয়াদের সঙ্গে দোস্তি করেছে দেখা যাচ্ছে ডুগান। আগেরবারও অবশ্য এরচেয়ে ভাল সঙ্গ ছিল না তার। নকলটাকে দেখো, স্লাভ মনে হচ্ছে...চ্যাপ্টা মুখ, উঁচু চিবুক, পূর্ব ইউরোপের লোক।'

একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। মিনিট পনেরো পর এসে হাজির হলো ডুগান। সোজা এগিয়ে গেল আলখেল্লা পরা লোকটার দিকে। বলল কিছু। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চলে গেল ড্রেসিং কেবিনেটের দিকে। তার জায়গায় বসে পড়ল ডুগান।

'তোমার ধারণাই ঠিক,' ওমর বলল। 'এখানে একা নয় আমাদের বন্ধু ডুগান।' মুখ ফেরাল কিশোরের দিকে। 'দেখা তো হলো। ক্রাগেন'স নেস্টে আবার যাওয়ার আগে লাঞ্চটা সেরে নিই। নাকি?'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল কিশোর।

তিন

দুই ঘণ্টা পর আবার ক্রাগেন'স নেস্টে ফিরে এল ওমর আর কিশোর। বড় যে কোনও খালি বাড়ির পরিবেশই বিষণ্ণ আর ভারিক্কি হয়, এটার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হলো না। বরং চারপাশ গাছপালায় ঘিরে থাকা নীরবতায় বিষণ্ণতাটা যেন অনেক বেশি। ঘরগুলো এতটাই নিঃশব্দ, সামান্যতম শব্দকেও বিকট মনে হয়। নিজেদের অজান্তেই কখন থেকে যে পা টিপে টিপে চলাফেরা আর নিচুস্বরে কথা বলা আরম্ভ করেছে ওরা, জানে না।

একবার ঘুরেফিরে দেখে, বাড়ির কোথায় কি আছে মোটামুটি জেনে নিয়ে যে ঘর থেকে ডুগানকে তাড়িয়েছে, সেটাতে ঢুকল ওরা। ঘরটাকে এমন করে সাজানো হয়েছে, যাতে একইসঙ্গে বসার ঘর এবং পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জার্মানি থেকে পালিয়ে আসার পর নিশ্চয় জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই এঘরে কাটিয়েছে হেস।

যা খুঁজতে এসেছে ওরা, সেটা এবাড়ির কোথাও লুকানো থাকলে বাড়ির মালিকের বিশেষ নির্দেশনা ছাড়া কোনমতেই খুঁজে বের করা যাবে না. বাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলা হলেও হয়তো গোপনই থেকে যাবে সেই জিনিসটা। কিশোরের একটাই ভরসা–পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করার সময় পায়নি হেস–যেমন অসমাপ্ত চিঠিটা, লিখে শেষ করার আগেই মৃত্যু ঘটেছে তার। তাতে ধরে নেয়া যায়, মূল্যবান সূত্রটা ঠিক জায়গায় লুকানোর সময় পায়নি সে, খোলা অবস্থায়ই পড়ে আছে কোনখানে।

লম্বা, নিচু ছাতওয়ালা কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ি। যখন যে-ই বাস করেছে এখানে, একা করেছে। সঙ্গিনী আনেনি। বেশির ভাগ ঘর খালি। আসবাবপত্রও নেই। তাতে বোঝা যায়, কাউকে এখানে আনার ইচ্ছে ছিল না হেসের, এমনকি মেহমানও নয়। তার নিজের বেডরুমটা সুন্দর করে সাজানো। আরেকটা শোবার ঘর আছে, কাজের লোকের জন্যে। নিচতলার দুটো ঘর বেছে নিয়ে একটাকে করা হয়েছে ডাইনিং রুম, অন্যটা স্টাডি। ছোটখাট একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে ওই ঘরে। দুটো ঘরই রুচিসম্মতভাবে সাজানো। আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের, খুব ভারী করে মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি। স্টাডি-কাম-সিটিং রুমটায় বিরাট একটা জানালা আছে, বাগানের অনেকখানি চোখে পড়ে সেটা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে বড় একটা লেখার টেবিল, তাতে অনেকগুলো ড্রয়ার। বসার চেয়ারটা অনেক বড়, ভীষণ ভারী। কাছাকাছি রাখা হয়েছে ছোট একটা লোহার আলমারি। দেয়ালে কয়েকটা ছবি আছে, আর দুটো বড় ম্যাপ আছে। একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, আরেকটা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের–পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোও দেখানো রয়েছে তাতে। টুকিটাকি সংগ্রহ আছে বেশ কিছু। প্রাচীন অলঙ্কার, নাবিকদের ব্যবহারের যন্ত্রপাতি, এ সব। ম্যানটলপীসে রাখা একটা পুরানো আমলের পিতলের ঘড়ি, নানা রকম সামুদ্রিক শামুকের খোলস, আর একটা বড় সাদা ডিম। ঘরের সমস্ত জিনিসের মধ্যে ডিমটাকে খাপছাড়া, বেমানান মনে হলো কিশোরের। গৃহকর্তার রুচির সঙ্গেও যেন মেলে না। সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী বড় বড় দুটো ছিপ দাঁড় করিয়ে রাখা ঘরের কোণে।

'খোঁজা শুরু করা যাক,' বলে প্রথমেই আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

একটা ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করে যা যা পাওয়া গেল, তারমধ্যে একটা জিনিসই সামান্য আগ্রহ জাগাল ওর। আলমারিতে পাওয়া গেছে হিটলারের সই করা একটা ফটোগ্রাফ, অ্যাকাউন্টিঙের ওপর কিছু বই আর কিছু নগদ টাকা। লেখার টেবিলের প্রতিটি ড্রয়ার তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। যা যা আছে, দেখার পর জিনিসগুলো যেমন ছিল আবার তেমন করে রেখে দিয়েছে। আছে খুব কম জিনিসই, একটা লেখার টেবিলে সাধারণত যা যা থাকে। কাগজ, ছুরি, পেন্সিল, রবার, আলপিন, পেপার ক্লিপ, এ সমস্ত। একটা পেট্রল লাইটার আর একটা দামী কলমও আছে। একটা ড্রয়ারে পাওয়া গেল ভাঁজ করা এক তা টিস্য

পেপার, একটা টুকরো কেটে নেয়া হয়েছে ওটা থেকে। স্কেচ আঁকা হয়েছে যে কাগজটায়, পকেট থেকে সেটা বের করে কাটা জায়গায় বসিয়ে দেখল কিশোর। খাপে খাপে মিলে যায়।

'কাগজটা কোনখান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে, সেটা জানলাম,' আপনমনে বিড়বিড় করল সে, 'তবে তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না।'

প্রচুর বই আছে। সেগুলোতে খুঁজতে যাওয়া খুব সময়সাপেক্ষ, ধৈর্যের ব্যাপার। টেবিলে রাখা একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে থাকল কিছুক্ষণ কিশোর। নাবিকেরা যে ধরনের দাগ আর চিহ্ন দিয়ে থাকে, সেসব খুঁজল। দেয়ালের ম্যাপগুলোতেও একই জিনিস খুঁজল। না পেয়ে শেষে নামিয়ে এনে টেবিলে বিছিয়ে আলোর নিচে রেখে ভালমত দেখল। কিন্তু কিছুই পেল না। কম্পাস কিংবা ডিভাইডারের পিনের অতি খুদে ছিদ্রটুকুও নেই কোথাও, নেই রুলার রেখে হালকা পেন্সিলে দাগ টানার চিহ্ন। যেখানে ঝোলানো ছিল ওগুলো, সেখানে ঝুলিয়ে দিয়ে এল আবার।

ওমরও খুঁজছে। বার বার চোখ যাচ্ছে ওর ডিমটার ওপর। শেষে গিয়ে তুলেই নিল হাতে। 'এটা এখানে কেন?'

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম। ঘরের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মেলে না।'

'ডিম তো সাধারণত খাওয়ার জন্যেই ঘরে আনে লোকে।'

'তাহলে রান্নাঘরে থাকার কথা, লাইব্রেরিতে নয়।'

'ঘরের আশেপাশে কোন মুরগীর খোঁয়াড়ও তো দেখলাম না।'

'মুরগীর ডিমের চেয়ে বড় এটা।'

'অনেক সময় এক ডিমের মধ্যে দুটো কুসুম থাকে। তাতে বড় হয়ে যায়।'

'জানি। তবু এতবড় হয় না।'

হাতের তালুতে রেখে ডিমটা দেখতে লাগল ওমর। মুরগীর ডিমের অন্তত তিনগুণ বড়। চকের মত সাদা। 'সাধারণ মুরগীর ডিম নয় এটা। কোনখান থেকে নিয়ে এসেছিল হেস। কেন?'

'সংগ্রহের বাতিক তো আছে দেখাই যাচ্ছে। ডিম সংগ্রহ শুরু করেছিল হয়তো।'

'তাহলে ফুটো করে ডিমের ভেতরের কুসুমটুসুম সব ফেলে দিয়ে শুধু খোসাটা রাখত,' হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করতে করতে বলল ওমর। 'ছোটবেলায় একবার ডিম সংগ্রহের নেশায় পেয়েছিল আমাকে। অনেক ডিম জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু এরকম ডিম কখনও দেখিনি।' ডিমটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল সে।

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর সব পাখির ডিম সংগ্রহে রাখতে হলে সারাজীবন শুধু ডিমই খুঁজে বেড়াতে হবে। তাতেও পারা যাবে কিনা সন্দেহ,' টেবিলের কাছে ফিরে গেল কিশোর।

'কি করছ?'

'ড্রয়ারের ভেতরে লুকানো গুপ্তকুঠরি আছে কিনা দেখছি। আগের দিনে তো টেবিলে ওসব রাখত লোকে।'

'এত সহজেই যদি সেটা পেয়ে যাবে, তাহলে আর "গুপ্ত" হবে কেন?'

'তা ঠিক। আর যদি থাকেও, সেটার ওপর নিশ্চয় বিশেষ ভরসা করেনি হেস। তাহলে আলমারিটা কিনত না। কাঠের বাড়িতে যারা বাস করে, তারা অবশ্য আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে লোহার আলমারি কেনে, আগুন লেগে মূল্যবান জিনিস পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে। যে জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে হেস হিটলারের সই করা চিঠি, ছবি, টাকা, সবই আলমারিতে রেখেছিল।' চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। 'সবই তো দেখলাম। বাকিটা রইল কি?'

হাত উল্টে ভুরু নাচাল ওমর, 'আমাকে জিজ্ঞেস করে কি লাভ?'

'চোখে পড়েও তো যেতে পারে কিছু। ডিমটার মত।'

'পাশের বাড়ির মিস্টার ডেভনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে কেমন হয়? তিনি হয়তো কিছু জানাতে পারবেন।'

'পুলিশ তো কিছু জানতে পারেনি।'

এক কাঁধ উঁচু করে শ্রাগ করল ওমর। 'পুলিশ পারেনি। আমরা যে পারব সেরকমও কোন সম্ভাবনা নেই।' সিগারেট ধরাল সে। 'তবে কথার মধ্যে ফাঁক থাকে অনেক সময়। কোনখান থেকে যে কি বেরিয়ে আসবে, কেউ বলতে পারে না। সেজন্যেই তো আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক প্রশ্ন হাজারবারও করা হয়।'

ওমরের যুক্তিটা মেনে নিল কিশোর। আলমারিটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট পর ডেভনের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। একজন নিগ্রো চাকর পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে এল বসার ঘরে। বয়স্ক একজন হাসিখুশি মানুষ হাসিমুখে স্বাগত জানালেন ওদের। বয়েস হলেও স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট ভাল। বয়েসের ভারে নুজ নন, কিংবা ভেঙে পড়েননি।

ওমরের দিক থেকে কিশোরের দিকে, তারপর আবার ওমরের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তাঁর, 'বলুন, কি করতে পারি?'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে গেল কিশোর, এটা বসার ঘর না ন্যাচারাল হিস্টরির মিউজিয়াম! তারপর মনে পড়ল, মিস্টার ডেভন একজন প্রকৃতিবিদ। দেয়ালের প্রতিটি ফোকর থেকে উঁকি দিয়ে আছে স্টাফ করা পাখির মুখ। ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ কাঁচের চোখ একই রকম ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে অতিথিদের দিকে।

'আমরা আমেরিকা থেকে এসেছি। গোয়েন্দা,' পরিচয় দিল ওমর। 'আপনার পড়শী মিস্টার হেস হফনারের কেসটার তদন্ত করার জন্যে। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি এখন কে পাবে, সেটা জেনে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'ও.' হাসলেন ডেভন। চোখের বিস্ময় চাপা দিতে পারলেন না. কিংবা দেয়ার

চেষ্টা করলেন না। 'আরও কত লোক লাগানো হয়েছে এই একটা সাধারণ কাজের জন্যে?'

এবার চমকানোর পালা ওমরের। 'বুঝলাম না?'

'আপনাদের আগেই এসে একজন একই কথা বলে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে। লোকটাকে পছন্দ হয়নি আমার।'

'চেহারাটা কেমন বলতে অসুবিধে আছে?'

'মোটেও না।'

ব্রন ডুগানের চেহারার বর্ণনা শুনে অবাক হলো না কিশোর।

'ওকে যা যা বলেছি, এ ছাড়া নতুন আর কিছুই বলার নেই আপনাদের,' ডেভন বললেন। 'কয়েকবার দেখা হয়েছে আমার ক্রাগেনের সঙ্গে। দীর্ঘক্ষণ কথাও হয়েছে। তারপরেও তাকে বুঝতে পারিনি। আন্তরিকতার অভাব ছিল বলব না, তবে ওই যে আছে না, ভেতরের মানুষটাকে চিনে নেয়া–সেটা কোনমতেই পারিনি। অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মনে হয়েছে আমার কাছে। কোন ডিপার্টমেন্টে ছিল, বের করতে পারিনি। খুব বেশি খাতির জমানোর চেষ্টাও অবশ্য আমি করিনি। ওসব করতে গেলে সময় দেয়া প্রয়োজন। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হত। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন পক্ষীবিদ,' দেয়ালের পাখিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'গবেষণা নিয়েই থাকতে হয়, সামাজিকতার সময় কোথায়? রক্তের সম্পর্কের কেউ তার আছে কিনা, আত্মীয়-স্বজন কোথায় কে আছে, কোনদিন বলেনি আমাকে। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। করার কোন প্রয়োজন মনে করিনি। আলোচনা যে বিষয় নিয়ে করেছি, আমার তরফ থেকে খানিকটা স্বার্থপরতাই বলতে পারেন–আমার গবেষণায় সাহায্য হয় এমন সব কথাবার্তা।'

'তারমানে পাখি?'

নিজের পছন্দের বিষয় চলে আসায় স্বস্তি বোধ করলেন ডেভন। 'হ্যাঁ। ওদের ব্যাপারে তথ্য দিত আমাকে ক্রাগেন। কোথায় থাকে, কি করে, কখন কোথায় মাইগ্রেট করে সব এসে বলত। মাঝে মাঝে আশেপাশের দ্বীপ থেকে নমুনা জোগাড় করে দিত। ছোট একটা ইয়ট আছে ওর। ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।'

'তাই?'

মাথা ঝাঁকালেন ডেভন। 'ঘন ঘন বেরোত না। তবে যখন বেরোত, অনেক দূরে চলে যেত বোধহয়, কারণ ফিরত অনেক দেরি করে।'

মাথা দোলাল ওমর।

'ক্রাগেনের মৃত্যুটা আমার অনেক ক্ষতি করে দিল,' দুঃখ করে বললেন ডেভন।

'কেন?'

হাসলেন ডেভন। বোকা বোকা দেখাল হাসিটা। 'সেটা আপনাদের বলা ঠিক হবে না। আইনবিরুদ্ধ একটা কাজ করাতে চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে। যদিও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। থাকগে, বলেই ফেলি। এক সময় পশ্চিম

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে প্রচুর ফিনোকপ্টারিবা রাবার ছিল।'

ওমরের মুখের অবস্থা যা হয়েছে দেখে হেসে ফেললেন ডেভন। 'বুঝলেন না? বৈজ্ঞানিক নাম। এক ধরনের অতি সুন্দর পাখি। সাধারণ নাম স্কারলেট ফ্ল্যামিঙ্গো।'

ওমরকে আটকে রাখা দম ছাড়তে দেখে আবারও হাসলেন তিনি। 'কিন্তু এখন আর তেমন দেখা যায় না। প্রাণীজগতের আরও নানা প্রজাতিকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ, এদেরকেও সেভাবেই করেছে। মাংস আর পালকের জন্যে পাইকারি হারে শিকার করে, ডিম খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এতই কমে গেছে, বড়জোর আর দুটো কি তিনটে ঝাঁক টিকে আছে কোনমতে। যতদূর জানি, বাহামায় আছে দুটো কলোনি। একটা ইনাগুয়া দ্বীপে, অন্যটা অ্যানড্রোজে; দুটোই এখান থেকে বহুদূর। আইন করে ওই পাখি মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সরকার। ইংল্যান্ড-আমেরিকার জীববিজ্ঞানী আর পক্ষীপ্রেমিকদের চাপে পড়ে পাখিগুলোকে পাহারা দেয়ার জন্যে লোক রাখতেও বাধ্য হয়েছে। তবে সেটা নামকা ওয়াস্তে। দুই দ্বীপের জন্যে একজন। পাখির বাসার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখার নির্দেশ আছে তার ওপর। এসব তথ্যের অনেকটাই আমি ক্রাগেনের কাছ থেকে জেনেছি।'

হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলেন ডেভন। 'পাহারাদার লোকটা কি এখন ইনাগুয়ায়, না অন্য দ্বীপটাতে, জানি না আমি। এখানকার কেউই জানে বলে মনে হয় না। শুধু পাখি দেখতে কে আর যাবে ওখানে। ট্যুরিস্টরা অবশ্য যায়, যারা পাখি পছন্দ করে। তাদের সংখ্যাও কম। ক্রাগেন ওদিকে যায় অনুমান করে ফ্ল্যামিঙ্গোর একটা ডিম এনে দিতে বলেছিলাম তাকে। আমাকে কথা দিয়েছিল, দেবে। পাখির ঝাঁক আর বাসার ছবিও এনে দেবে বলেছিল। বাসাগুলো নাকি ভারি অদ্ভুত। মাটি দিয়ে মিনারের মত উঁচু করে বানায়। প্রতিটি মিনারের চূড়ায় একটা করে ডিম পাড়ে।'

ভুরু উঁচু করে ফেলল ওমর। 'কোনখান থেকে ওই ডিম এনে দেবে আপনাকে, বলেছিল নাকি ক্রাগেন?'

'বলেছে ছোট একটা দ্বীপ। ইনাগুয়াও নয়, অ্যানড্রুজও নয়। ওই দুটো ছাড়াও নাকি আরেকটা নির্জন ছোট দ্বীপে গিয়ে কলোনি করেছে কিছু ফ্ল্যামিঙ্গো।...কিন্তু এখন আমার আশা ভরসা সব শেষ। ক্রাগেন গেল মরে। আর কিছুই পাব না। ডিম, বাসার ছবি, কোনটাই না।'

'ডিমগুলো দেখতে কেমন?'

'মুরগীর ডিমের তিনগুণ বড়। চকের মত সাদা।'

হেসের বাড়ির ম্যানটলপীসে রাখা ডিমটার কথা ভাবল ওমর। 'কোন দ্বীপে এই ছোট কলোনিটা আছে, ক্রাগেন কোন ইঙ্গিতও দেয়নি?'

'নাহ্। জিজ্ঞেস করেছি, এড়িয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল কোন কারণে নামটা গোপন রাখতে চাইছে সে। তবে আমার বিশ্বাস, ইনাগুয়ার আশেপাশেই কোথাও হবে ওটা। মূল কলোনির কাছ থেকে বেশি দূরে যেতে চায় না আজকাল ফ্ল্যামিঙ্গোরা। আর ল্যাগুনের কাছাকাছি থাকতেই পছন্দ করে।'

'কেন?'

'প্রথমত, খাবার। ল্যাগুন থেকে মাছ, শামুক আর ছোট ছোট জলজ প্রাণী শিকার করে খাওয়া ওদের জন্যে সহজ। তা ছাড়া দ্বীপের যেখানে সেখানে বাসা বানানোকে আর নিরাপদ মনে করে না ওরা। ল্যাগুনের মাঝে গজিয়ে ওঠা চড়ার দিকেই নজর বেশি। শত্রুর ভয়ে চলে যায় পানির বেষ্টনির মধ্যে। এটা যে আরও বেশি বোকামি, বোঝে না ওরা। বেশি বৃষ্টিপাতে পানি বেড়ে প্লাবন হয়ে গেলে ওসব বাসা ধসে পড়ে, ডিম হারিয়ে যায়। বাসার চারপাশে প্রচুর কাদার প্রলেপ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে অবশ্য। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষই যেখানে অসহায়, ওরা আর কি করবে।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। চোখাচোখি হলো দুজনের। আবার ডেভনের দিকে ফিরল সে। 'কয়েক দিনের মধ্যে ক্রাগেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'না। বেশ কিছুদিন যাইনি।'

'সেজন্যেই খবরটা পাননি। একটা ডিম আপনার জন্যে নিয়ে এসেছিল ক্রাগেন।'

'অনেক দিন দেখা হয় না তার সঙ্গে। মৃত্যুর খবর শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আজব লোক...' হঠাৎ যেন ওমরের কথাটা মাথায় ঢুকল ডেভনের। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ডিম নিয়ে এসেছিল!'

'আমার তাই ধারণা,' হাসল ওমর। 'একটা ডিম দেখে এলাম ম্যানটলপীসে। আপনি যেমন বললেন, ঠিক সেই রকম।'

'সাংঘাতিক একটা খবর শোনালেন, সাহেব! এতক্ষণ বলেননি কেন?' চিৎকার করেই বললেন ডেভন।

'খবর না পাওয়ার তো কোন কারণ দেখি না। বেআইনী কাজটা ক্রাগেন করেছে, ডিম এনে। আপনি করেননি। যে পাখিটার ডিম, তাকে তো আর চিনে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসা যাবে না। অতএব নষ্ট না করে একজন পক্ষীপ্রেমিকের সংগ্রহে চলে যাওয়াটাই সবদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত। আমার অন্তত সেটাই ভাল হবে মনে হয়।'

'কখন পাব? এখন গেলে পাওয়া যাবে?' অস্থির হয়ে উঠেছেন ডেভন।

'এইমাত্র তালা দিয়ে এলাম। আজ আর যেতে চাই না। তবে চাবি রেখে যেতে পারি আপনার কাছে। তাতে আমার বয়ে বেড়ানোরও ঝামেলা থাকবে না, আবার যখন ইচ্ছে এসে চাইলেই পাওয়া যাবে। আপনিও যখন খুশি গিয়ে ডিমটা নিয়ে আসতে পারবেন। পড়ার ঘরে আছে, ম্যানটলপীসের ওপর।'

'নিশ্চিন্তে রেখে যান। যখন খুশি এসে চাবি চাইবেন। রাত দুপুরে হলেও ক্ষতি নেই।'

'তাহলে তো খুবই ভাল।' চাবির গোছাটা বের করে দিল ওমর।

'আপনারা ফিরবেন কখন?' ওমর আর কিশোরকে দরজায় এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন ডেভন।

'জানি না এখনও। কি করব ঠিক করিনি। আপনার সাহায্যের জন্যে

ধন্যবাদ। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা। ওই লোকটা যদি আবার আসে, ওই বিদেশীটা, যে আপনার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেয়েছিল, সোজা হাঁকিয়ে দেবেন। ও একটা ঠগ। চুরি, ডাকাতি সবই করেছে। আমেরিকার পুলিশ ওকে খুঁজছে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ওমর। 'আচ্ছা, ফ্ল্যামিঙ্গোর কথাটা ওকে বলে দেননি তো?'

কপাল কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন ডেভন। 'নাহ্, বলিনি বোধহয়...ইয়টে করে ড্রাগেন কোথায় যেত, জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছি, জানি না। বাহামার ওদিকে যেতটেত, ফ্ল্যামিঙ্গোর দ্বীপগুলোর কাছে দিয়ে–এরকম কিছু বলে থাকতে পারি। মনে পড়ছে না।'

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'আচ্ছা, মিস্টার ডেভন, এখানে কি সাপ আছে?' ডেভনের বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বলল সে।

'সাপ!' অবাক মনে হলো ডেভনকে। 'না, নেই। আমি অন্তত এতদিনে একটাও দেখিনি। তবে কোন কোন দ্বীপে সাংঘাতিক বিষাক্ত একজাতের সাপ আছে, ফার-ডি-ল্যান্স। ত্রিনিদাদে তো অভাব নেই ওগুলোর। মারটিনিক, সেইন্ট লুসিয়া আর টোবাগোতে আখের খেতে কাজ করতে গিয়ে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে থাকে চাষীরা, কখন কামড় খেতে হয়।'

'নামটা বড় অদ্ভুত, ফার-ডি-ল্যান্স। শুনেছি, তিনকোনা মাথার জন্যেই এই নাম হয়েছে? বল্লমের ফলার মত মাথা?'

'ঠিকই শুনেছ। শুধু বল্লমের মত মাথাই নয়, আক্রমণের ধরনটাও ওই রকম। বল্লম ছুঁড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ওরাও ওরকম করে লাফ দেয়। ছয় ফুট লম্বা, ধূসর-বাদামী রঙ, শরীর ঘিরে কালো কালো আঙটির মত দাগ, দাগের দুই কিনার আবার হলদে-সবুজ। দেখলে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। সাপের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন হঠাৎ?'

'এমনি। মনে হলো। শুনেছিলাম, জ্যামাইকায় আছে এই সাপ।'

হেসে বললেন ডেভন, 'ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিংসটনে ওদের দেখা পাবে না।' ওমরের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা, গুড-বাই। কোন কিছুর দরকার হলে বিনা দ্বিধায় চলে আসবেন আমার কাছে। সাহায্যের দরকার হলে বলবেন।'

চার

রোদের তাপ কমে গেছে। বিকেলের আলো-ছায়ায় মলিন হয়ে এসেছে রঙের চাকচিক্য। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে হেঁটে চলল ওমর আর কিশোর।

'চাবি রেখে এসে ভালই করেছি, কি বলো?' ওমর বলল।

'চাবির কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, আমাদের মত একই খাতে চিন্তা করছে না তো ব্রন ডুগানও?'

'করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পাখির দ্বীপের কথা তো তাকে বলেই

দিয়েছেন ডেভন।'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো, হেস বলেছিল ডেভনকে ডিম আর ছবি এনে দেবে–ডিমটা তো দেখলাম, ছবিগুলো কোথায়?' ওমরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। 'ছবি তোলায় বাধা নেই, সহজ কাজ, ডিম আনাটাই বরং কঠিন। ডিম যখন এনেছে, ছবিও তুলেছে। গেল কোথায় ওগুলো? ঘরে তো কোথাও পেলাম না। কোন ক্যামেরাও নেই। নিয়ে গেল নাকি ডুগান? সঙ্গে করে একটা ব্যাগ এনেছিল, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'ছবি, ক্যামেরা, দুটোই?'

'হ্যাঁ। মদের কথা বলে আমাদের আগ্রহও ব্যাগের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। ভীষণ চালাক লোক। ছবি পেলে আমাদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি জায়গামত চলে যেতে পারবে সে। কারণ ছবিতে বাসার পেছনের দৃশ্যপট থাকবে। সেটা থেকে বোঝা যাবে দ্বীপের চেহারা, আকৃতি। দ্বীপটাও হয়তো চিনে বের করা যাবে। অবশ্য এখন আর ভেবে লাভ নেই। যদি নিয়েই গিয়ে থাকে ডুগান, কি আর করব!'

'ডেভনকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কোন্ দোকান থেকে ছবি ডেভেলপ করাত হেস। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, গত কিছুদিনের মধ্যে ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি কিংবা ওগুলোর বাসার ছবি ডেভেলপ করতে দিয়েছিল কিনা।'

'তা করা যায়।'

গাড়িতে উঠল দুজনে। কিন্তু তখুনি স্টার্ট না দিয়ে সিগারেট ধরাল ওমর। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়াতে ওড়াতে বলল, 'খুব একটা খারাপ এগোইনি আমরা, কি বলো? কাজ করার মত কিছু তথ্য পেয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'ডিমটাকেই এখন সবচেয়ে বড় সূত্র বলে মনে হচ্ছে।'

'তা ঠিক। কাজ কমিয়ে দিল আমাদের। বোঝাই যাচ্ছে, ওই ডিম জোগাড়ের জন্যে দ্বীপটায় যায়নি হেস। গিয়েছিল অন্য কাজে। সে জানত, কোথায় ডিম পাওয়া যাবে। তাই এনে দেবে বলে কথা দিয়েছিল ডেভনকে। এমন কোন দ্বীপ সে চেনে, যেখানে ফ্ল্যামিঙ্গো কলোনি আছে।'

'আমার প্রশ্ন সেটাই। কি করে চিনল? কেন যায় ওখানে? অনুমান করা কঠিন নয়। দ্বীপের নামটা জানায়নি ডেভনকে। কেন জানাল না? কারণ, সে চায়নি অন্য কেউ জেনে যাক। চায়নি, জেনে গিয়ে বাকি কলোনিগুলোর মতই পরিচিত হয়ে উঠুক এই দ্বীপটাও, লোক যাতায়াত করুক। তাতে তার গোপন ভাণ্ডার আর গোপন থাকবে না। এখন আমাদের পয়লা কাজ দ্বীপটা খুঁজে বের করা, নকশার সঙ্গে ওটার আকৃতি মেলে কিনা দেখা। দ্বীপটা পেলে ফর্মুলাটা খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

'দুটো প্রধান দ্বীপের কথা বলেছেন ডেভন।'

'হ্যাঁ, ইনাগুয়া এবং অ্যানড্রুজ। একটাতে না দেখেই বাদ দিতে পারি আমরা, অ্যানড্রুজ। এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। প্রচুর লোক বাস করে ওটাতে। হেসের জিনিস লুকানোর ক্ষেত্র হিসেবে মোটেও সুবিধেজনক

নয়। ইনাগুয়া অত জনবহুল নয়, তবুও আপাতত বাদ দেয়া যায়। নজর দিতে হবে ওটার আশেপাশে কোন উপদ্বীপ থাকলে; কিংবা ছোট দ্বীপগুলোর ওপর। ইনাগুয়ার কাছাকাছিই থাকার কথা হেসের নির্জন দ্বীপটা। মূল কলোনির কাছ থেকে দূরে যেতে চায় না ফ্ল্যামিঙ্গোরা। তাতে আমাদের সুবিধেই হলো। খোঁজার জায়গা সীমিত হয়ে গেল। কলম্বাস বে'তে গিয়ে এখন ম্যাপ দেখা দরকার আমাদের। কোন কোন জায়গায় খুঁজতে হবে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। তাড়াতাড়ি করলে অন্ধকার হওয়ার আগেই এক চক্কর দিয়ে আসতে পারব।'

'দারোয়ানকেও তো ভাগিয়ে দিয়ে এলাম। বাড়িটা ওভাবে পাহারা ছাড়া ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'হয়তো হবে না। তবে ডুগান আর না-ও আসতে পারে। তাকে বলে দেয়া হয়েছে ওই বাড়িতে থাকব আমরা। আমাদের উপস্থিতিতে চুরি করে বাড়িতে ঢোকার সাহস করবে বলে মনে হয় না। তবে যদি আসার ইচ্ছেই থাকে, আমরা থাকলেও আসবে, না থাকলেও আসবে। ঢুকবেই আবার, যেভাবেই হোক। তার আসার ভয়ে তো আর অন্য কাজ বাকি রেখে বসে থাকতে পারি না আমরা। বরং দ্বীপটা খুঁজতেই চলে যাই। এত তাড়াতাড়ি ডুগানের আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা কম,' ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। 'না কি বলেন?'

'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই,' স্টার্ট দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ওমর। বিকেলের নীরবতাকে চিরে দিল তীক্ষ্ণ চিৎকার। মুহূর্তে মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেল ওর। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। সেইসাথে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল একপাশের দরজা। 'এসো!' বলেই দৌড় দিতে গেল ডেভনের বাড়ির দিকে।

'এদিকে নয়, ওদিকে!' ক্রাগেন'স নেস্টের দিকে হাত তুলল কিশোর। গাড়ির ওইপাশটাতে বসা ছিল বলে ঠিকমত শুনেছে।

হেসের বাড়ির দিকে দৌড় দিল দুজনে।

ঘরের কাছে পৌঁছে থমকে গেল ওমর। বাগানের দিকের জানালাটা দেখিয়ে বলল, 'দেখো! বন্ধ করে গিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে না?'

হেসের পড়ার ঘরের বিশাল জানালাটা এখন খোলা। কিশোরেরও স্পষ্ট মনে আছে, ওরা ঘর থেকে বেরোনোর সময় পাল্লা লাগানো ছিল।

তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পেরোল ওমর। হলঘর পেরিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল হেসের পড়ার ঘরে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল 'সাবধান!' বলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একপাশে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা না খেলে মাটিতেই পড়ে যেত। হাতের নাড়া লেগে মেঝেতে পড়ে গেল একটা ছিপ।

কিশোরও ঢুকে পড়েছে। ব্রেক কষে যেন দাঁড় করাল নিজেকে। পিছলে গেল খানিকটা। পরক্ষণে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে।

পরের কয়েকটা মিনিট যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো ওদের।

মাটিতে পড়ে আছেন ডেভন। একটা হাঁটু বাঁকা করে রেখেছেন, এক হাত মুখের ওপর। তাঁর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে একটা সাপ। মাথাটা বল্লমের

ফনার মত। দেহের রঙ বাদামী, তাতে গোল গোল আঙটি।

যে রকম রেগে আছে সাপটা, ডেভনের কাছে এখন যাওয়ার চেষ্টা করলেই কামড় খেতে হবে। ওটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে হাত বাড়াল ওমর। তুলে নিল একটা ছিপ। সাপটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ি মারল মাথা সই করে। লাগল, তবে জায়গামত নয়। ছিপের মাথাটা ভেঙে গেল। আবার বাড়ি মারার জন্যে তুলল সেটা।

পরক্ষণে যা ঘটল, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কিশোর। অবিশ্বাস্য দ্রুত নিজের শরীরটাকে সোজা করে ফেলল সাপটা। বল্লমের মত। ওকে কাছে দেখে ওর দিকেই লাফ দিল। দ্রুত সরতে গিয়ে লেখার টেবিলটার ওপর পড়ে গেল সে।

প্রথমবার মিস করে, দ্বিতীয়বার আর তাকে আক্রমণ করল না সাপটা। ভয়ানক ফোঁস ফোঁস করতে করতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বড় আর্মচেয়ারটার তলায়। এমন জায়গায়, যেখানে ওটাকে বাড়ি মারা যাবে না।

'তুমি সরো!' চিৎকার করে বলে ছিপের মাথা দিয়ে চেয়ারের তলায় খোঁচাতে শুরু করল ওমর, সাপটাকে বের করে আনার জন্যে। ওকে লক্ষ্য করে তেড়ে এল ওটা। বাড়ি মারল ওমর। লাগাতে পারল না। সাপটা তার চেয়ে দ্রুতগতি। ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে লাফ দিয়ে একটা চেয়ারে উঠে পড়ল। ওখান থেকে বাড়ি মারতে গেলে ডেভনের গায়ে লাগবে। শেষে চেয়ারের পেছন দিকে লাফিয়ে নেমে, চেয়ারটা তুলেই ছুঁড়ে মারল ফণা দোলাতে থাকা সাপটার দিকে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। কি করবে বুঝতে পারছে না। ওমরকে সাহায্য করা দরকার। মেঝেতে পড়ে থাকা দ্বিতীয় ছিপটা তুলে নিতে লাফ দিল সে। তুলে নিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, অন্ধের মত বাড়ি মারল সাপটাকে। লাগলে কোমর ভেঙে যেত ওটার। কিন্তু ছিপের মাথা আটকে গেল একটা ঝুলন্ত ল্যাম্পে, ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, বাড়িটা লাগল গিয়ে সাপের লেজে। তা-ও এত আস্তে, কিছুই হলো না ওটার, বরং রাগিয়ে দিল আরও। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তবে কি বুঝে আর ছোবল মারতে এল না। ছুটে ঢুকে পড়ল সোফার নিচে।

এমন জায়গায় রয়েছে ওটা, বাড়ি মারার উপায় নেই আর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে দুজনে। তাকিয়ে আছে সোফাটার দিকে।

'মাথা দেখতে পাচ্ছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

'গুঁতো মারো,' পরিশ্রমে খসখসে হয়ে গেছে ওমরের কণ্ঠ। 'তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। দেরি হয়ে গেলে ডেভনকে বাঁচানো যাবে না।'

ছিপ দিয়ে গুঁতানোর সাহস পেল না কিশোর। পিতলের একটা লম্বা মোমদানি তুলে নিয়ে সাপের মাথা সই করে ছুঁড়ে মারল। এবং যথারীতি মিস করল। তবে একটা উদ্দেশ্য সফল হলো, বেরিয়ে এল সাপটা।

বাড়ি মারতে দেরি করে ফেলল ওমর। লাগল না। ফেলে রাখা ছিপ তুলে আবার বাড়ি মারতে গিয়ে কিশোরও দেরি করে ফেলল। জানালার কাছে চলে

গেছে ততক্ষণে সাপটা। লাফ দিয়ে চৌকাঠে উঠল। চৌকাঠ গলিয়ে চলে গেল বাইরে। নিঃশব্দে হারিয়ে গেল লম্বা ঘাসের মধ্যে।

'যাক, মরুকগে!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওমর। 'যেয়ো না আর!'

'মাথা খারাপ! মরব নাকি গিয়ে! কিন্তু ঘরে আর নেই তো?'

'থাকলে কিছু করার নেই,' হাঁটু গেড়ে ডেভনের পাশে বসে পড়ল ওমর। বেহুঁশ হয়ে গেছেন তিনি।

কিশোরও এসে বসল পাশে।

'দেখি, তোমার ছুরিটা,' হাত বাড়াল ওমর।

পকেট থেকে সুইস-নাইফটা বের করে দিল কিশোর।

কোন জায়গায় কামড় খেয়েছেন ডেভন, দ্রুত বের করে ফেলল ওমর। বাঁকা করে রাখা হাঁটুর পেছনে গোড়ালির ওপরের মাংসে। প্যান্টটা চিরে ফেলল সে। ছুরির মাথা দিয়ে ক্ষতস্থানের ওপর আড়াআড়ি দুটো পোঁচ দিল। সেখানে মুখ লাগিয়ে চুষে রক্ত টেনে বের করতে শুরু করল। মুখভর্তি রক্ত থু-থু করে ফেলে দিল একপাশে। 'দেখো তো, ব্র্যান্ডিট্যান্ডি পাও নাকি?'

দৌড় দিল কিশোর। ডাইনিং রুম থেকে নিয়ে এল একটা বোতল।

'ঠোঁটে ঢেলে দাও,' ওমর বলল।

'ডাক্তার ডাকা দরকার,' ছিপি খুলতে খুলতে বলল কিশোর।

'কি করে ডাকবে? ফোনটোন তো দেখলাম না কোথাও। গিয়ে ডেকে আনতে হবে। ডাক্তারের জন্যে বসে থাকলে বাঁচানো যাবে না। তারচেয়ে যা করছি করি।'

ডেভনের ঠোঁট ফাঁক করে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল কিশোর। ভেতরেও গেল খানিকটা, ঠোঁটের কোণ বেয়ে বাইরেও পড়ল।

ছুরি দিয়ে কাটা দুটো আরও বড় করে দিল ওমর, যাতে বেশি করে বিষ মেশানো রক্ত বেরিয়ে চলে আসতে পারে। ফুলতে শুরু করেছে পা-টা।

দেয়ালের কাছে ডেভনকে তুলে নিয়ে এল সে। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসিয়ে দিল। গালে চড় মারতে শুরু করল জোরে জোরে, 'ডেভন! মিস্টার ডেভন! শুনছেন?'

অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ডেভনের মুখ থেকে। চোখ মেললেন। ঘোলাটে দৃষ্টি।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'জলদি একটা অ্যাম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করো। আমি ততক্ষণ জাগিয়ে রাখছি।'

দৌড়ে বেরোল কিশোর। গাড়ি নিয়ে শহরে ছুটল। ভাগ্য ভাল, পথেই দেখা পেল একটা আর্মির অ্যাম্বুলেন্সের। ধীরে সুস্থে চলেছে। চালাচ্ছে একজন কর্পোরাল।

তাকে থামিয়ে পরিস্থিতিটা জানাল কিশোর।

চিন্তা করতে মানা করে দিল কর্পোরাল। কিশোরকে চলে যেতে বলল। যা করার সে-ই করবে।

ক্রাগেন'স নেস্টে ফিরে এসে কিশোর দেখল, ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছেন

ডেভন। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে আর ওমর।

দশ মিনিট পরই অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেল ক্রাগেন'স নেস্টে। ডাক্তার নিয়ে এসেছে কর্পোরাল।

তাড়াতাড়ি সিরাম পুশ করে দিলেন ডাক্তার। 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে,' ওমরকে বললেন। 'ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল, ঠিকমত সব করতে পেরেছেন আপনারা। বাঁচার আশা আছে।'

স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলা হলো ডেভনকে। চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

ঘরে একা হয়ে গেল ওমর আর কিশোর। বিকেল শেষ। দ্রুত নামছে গোধূলির ছায়া।

'ভালই তো এগোচ্ছিল,' কপালের ঘাম মুছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল ওমর, 'কিন্তু দিনটা শেষ হলো বড় বিশ্রী ভাবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'ওই সাপটা আপনাআপনি এসে ঘরে ঢুকে পড়েনি,' আনমনে বলল। 'জ্যামাইকায় ফার-ডি-ল্যান্স নেই। অন্য কোনখান থেকে আনা হয়েছে। এনে ঘরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'কোনই সন্দেহ নেই তাতে,' একমত হলো ওমর। 'এবং কাজটা ডুগানের।'

'সে নিজে করেনি, কাউকে দিয়ে করিয়েছে। এত মারাত্মক প্রাণী সে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবে না। কিন্তু হুমকি দিয়ে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করে ফেলবে ভাবতে পারিনি। কাউকে দিয়ে সাপটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে। যাতে ঢুকলেই আমরা কামড় খেয়ে মরি।'

'তারমানে নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর?'

'না-ও রাখতে পারে। দরকার তো নেই। আমরা এখানে থাকব, বলেই দিয়েছি ডুগানকে। তাই আমাদের মারার ব্যবস্থা করেছিল। অন্য কেউ যে ঢুকে পড়বে, কল্পনাই করেনি।'

'কিন্তু ঘরে ঢুকল কি করে লোকটা? যাকে দিয়ে পাঠাল?'

'পাল্লার কাঁচ ভেঙে জানালা খুলেছে।' হাত তুলল কিশোর, 'ওই দেখুন। ছিটকানির কাছের কাঁচটা ভাঙা।'

এতক্ষণে ডিমটার ওপর চোখ পড়ল ওর। মেঝেতে পড়ে আছে। খোসা ভেঙে কুসুম বেরিয়ে ছড়িয়ে আছে। রক্তের মত টকটকে লাল।

'ওই ডিমটাই এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল আমাদের,' কিশোর বলল। 'নইলে কামড়টা আমাদেরই কাউকে খেতে হত। ডেভন বেঁচে থাকলে এর পুরস্কার হিসেবে আরেকটা ডিম তাঁকে এনে দিতে হবে।'

'নিতে এসেই কামড়টা খেল বেচারা!' আফসোস করল ওমর।

'হ্যাঁ। শোনার পর আর একটা সেকেন্ডও দেরি করতে পারেননি।'

বাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে এসে বাগানের দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছেন ডেভন। তালার ফুটোয় চাবির গোছা ঝুলতে দেখে বোঝা গেল। পেছনের রাস্তা দিয়ে শর্টকাটে এসেছেন বলে সামনের রাস্তায় বসা ওমর আর

কিশোরও তাঁকে হেসের বাড়িতে ঢুকতে দেখেনি।

'এতটাই তাড়াহুড়ো করেছেন,' আবার বলল কিশোর, 'সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার তরটাও সয়নি। সরাসরি স্টাডিতে ঢুকেছেন এবং ঘরে ফেলে যাওয়া ইবলিসটার কামড় খেয়েছেন।'

'দুঃখের বিষয়, মারতে পারলাম না। ইবলিসটা এখন বাগানে। কোথায় যে লুকিয়ে আছে কে জানে। বাগানে বেরোলেই হয়তো কামড় খেতে হবে। থাক বসে। আমি আর ওদিকে যাচ্ছিই না।' জানালাটা লাগিয়ে দিল ওমর। দরজা বন্ধ করে, তালা আটকে চাবির গোছা পকেটে ফেলল। 'চলো, যাই। মুসা আর রবিন নিশ্চয় আমাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়েছে।' বাইরে বেরিয়ে বলল, 'সাবধান! দেখেশুনে পা ফেলো! কোথায় লুকিয়ে আছে বদমাশটা কে জানে!'

'অত ভয় করছি না আমি। একটু আগে একবার তো বেরোলাম। অ্যাম্বুলেন্স এল। হই-চই আর গাড়ির শব্দে নিশ্চয় দূরে চলে গেছে ওটা।'

তবু অসাবধান হলো না। সাপটা আছে কিনা দেখতে দেখতে, ঘাস আর ঝোপঝাড় এড়িয়ে ড্রাইভওয়ের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এল ওরা গাড়ির কাছে।

শ'খানেক গজ এগোতেই রাস্তা ধরে আসতে দেখল একটা লোককে। উদ্ভট পোশাক পরা সেই লম্বা নিগ্রো।

'ফ্রিক সায়া!' বলে উঠল কিশোর।

শক্ত হয়ে চেপে বসল ওমরের ঠোঁট। 'ত্রিনিদাদের স্যাগা বয়েজদের নেতা। আর ত্রিনিদাদ হলো বল্লম-সাপের আড্ডাখানা।'

'ওই বদমাশটাই তাহলে এ কাজ করেছে! আমরা মরলাম কিনা দেখতে আসছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তা নাহলে ওর এদিকে আসাটাকে এখন কাকতালীয় ধরে নিতে হয়।'

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির ভেতর চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল ফ্রিক। ধীরে ধীরে কালো ঠোঁট ফাঁক হয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মাথা থেকে বিরাট কানাওয়ালা হ্যাটটা খুলে নিয়ে বাউ করল ওদের উদ্দেশে। যেন বোঝাতে চাইল: এবার হলো না বটে, পরের বার দেখা যাবে।

পাঁচ

পরদিন সকালে বিমান নিয়ে রওনা হলো ওরা। উড়ে চলল উত্তর-পশ্চিমে। গভীর নীল আকাশ। সাগর তারচেয়ে নীল। গন্তব্য: ইনাগুয়া। ফ্ল্যামিঙ্গো বাস করে যে দুটো দ্বীপে, তার মধ্যে কাছে ওটা। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে কাছের দ্বীপ। জ্যামাইকা থেকে কাছে, তারপরেও কিউবা আর হাইতির মাঝখান দিয়ে বিখ্যাত উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজ ধরে যেতে গেলে তিনশো মাইল।

ম্যাপ আর অ্যাডমিরালটি চার্টে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু কোনটাই আগ্রহ

জাগাতে পারল না কিশোরের। জানল, ইনাগুয়া দুই ভাগে বিভক্ত–গ্রেট ইনাগুয়া আর লিটল ইনাগুয়া। শেষের অংশ, অর্থাৎ দ্বীপের ছোট অংশটা রয়েছে একেবারে উত্তর প্রান্তে।

ফ্ল্যামিঙ্গো আছে অন্য যে দ্বীপটায়, অ্যানড্রুজ, সেটা রয়েছে আরও বহুশত মাইল উত্তরে। ওটাকে আরও একটা কারণে খোঁজার তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়: জ্যামাইকা থেকে অতদূরে তার মূল্যবান দলিল লুকাতে চাইবে না হেস। যতটা সম্ভব হাতের কাছে রাখতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

দ্বীপ হিসেবে গ্রেট ইনাগুয়া যথেষ্ট বড়। প্রায় আটশো বর্গমাইল। এর বেশির ভাগটা জুড়েই রয়েছে অবশ্য পানি, বিশাল এক ল্যাগুন, যাকে ঘিরে আছে মাটি, অর্থাৎ দ্বীপটা। দ্বীপের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য অবশ্য ওখানকার সব দ্বীপেরই আছে, সেভাবে নামকরণও করা হয়েছে ওগুলোর। যেমন, প্রবালদ্বীপ, মরুদ্বীপ, রত্নদ্বীপ; কোনটা সবুজ গাছপালায় ছাওয়া, কোনটাতে শুধু বালি আর পাথর, কোনটাতে গাছপালা, বালি, পাথর, পাহাড়, টিলা সবই আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে গুপ্তধনের গুজব, পাওয়াও গেছে কোথাও কোথাও। যাই হোক, ইনাগুয়ার ওই ল্যাগুনেই লাল ফ্ল্যামিঙ্গোর বাসা। কেউ কেউ ফায়ারি ফ্ল্যামিঙ্গো বা আগুনে ফ্ল্যামিঙ্গোও বলে এদের। এক সময় প্রচুর নিগ্রো বাস করত এই দ্বীপে। কমতে কমতে সেটা হাতে গোণা কিছু বস্তিতে এসে ঠেকেছে। পুরানো, বিবর্ণ বাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা এই জনবসতির নাম এখন ম্যাথু টাউন। দ্বীপে কাজ নেই, তাই কর্মের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে নতুন জেনারেশন। প্রথম যখন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা আসে এখানে, যেমন দেখেছিল, বর্তমানে আবার সেই অবস্থা হয়েছে দ্বীপটার।

এক প্রান্তে ওটার আটলান্টিক মহাসাগর। তাতে হাজার হাজার দ্বীপ, উপদ্বীপ, প্রবাল প্রাচীর নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ তৈরি হয়েছে, সেটাই বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। এগুলোর মধ্যে দিয়ে জ্যামাইকায় আসতে হয়েছিল হেসকে। পথে কোন একটা দ্বীপে থেমে লুকিয়ে ফেলেছিল সঙ্গে করে নিয়ে আসা মূল্যবান দলিল, সোনাদানা। উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজ ধরে যেখান দিয়ে ক্যারিবিয়ান সী'তে ঢুকেছিল সে, ইনাগুয়ার পাশ কাটিয়েছিল, তার কাছাকাছি উড়ছে এখন ওমরের ভাড়া নেয়া পুরানো আমলের অটার বিমান।

কোথায় লুকানো আছে ফর্মুলাটা? নকশা বা ম্যাপ ছাড়া হেসের ওই দলিল খুঁজে পাওয়া কয়েকশো খড়ের গাদায় একটা সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হলো ওর কাছে। হবে না এভাবে। সূত্র লাগবে। যে লুকিয়েছে তার নির্দেশনা দরকার। নইলে পাবে না ওই দলিল।

ছোট ছোট বিন্দু, বিন্দুর চেয়ে সামান্য বড় বেশ কিছু জলযান দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ডাঙা থেকে বহুদূরে। উত্তরে দ্রুতগতিতে একটা যাত্রীবাহী বড় জাহাজ ছুটে চলেছে উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজের দিকে, পেছনে লম্বা লেজের মত রেখে যাচ্ছে সাদা ঢেউয়ের মোটা রেখা। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ছোট জাতের জলযান, মনে হয় স্থির হয়ে আছে, কিন্তু বেশ জোরেই যে চলছে ওটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ একটু পরেই আবার যখন তাকাল ওমর,

দেখতে পেল না আর। দূরে বলেই স্থির লাগছিল।

ডেভনের কথা ভাবল সে। রওনা হওয়ার আগে হাসপাতালে ফোন করে খোঁজ নিয়েছিল। ডাক্তার আশ্বস্ত করেছেন, বিপদ কেটে গেছে। কয়েক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হতে পারে হয়তো, তবে আর কোন ভয় নেই। বেঁচে গেছেন ডেভন।

প্রথমবার বেরিয়েই হেসের লুকানো জিনিসটা পেয়ে যাবে, এমন আশা অবশ্য করছে না ওমর। সে এসেছে ইনাগুয়ার আশপাশটা দেখে যেতে, কোথায় নতুন কলোনি করেছে ফ্ল্যামিঙ্গোরা। যদি এমন হয়, একটা নয়, একাধিক নতুন কলোনি করেছে পাখিগুলো, যার কথা হেসেরও জানা নেই, তখন? আসলটা বাদ দিয়ে ওগুলোরই কোন একটা আবিষ্কার করে বসল হয়তো ওরা, খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে যাবে, পাবে না ফর্মুলাটা। সূত্র আছে একটাই, হেসের আঁকা নকশা। দ্বীপটা ওই আকৃতির হতে হবে। কিন্তু আসলেই কি নকশা এঁকে দ্বীপ বুঝিয়েছে হেস? নাকি ল্যাগুন? না অন্য কিছু? মুশকিল আরও আছে, নকশাটাতে স্কেল দেয়া নেই। তাই বোঝারও উপায় নেই, দ্বীপ কিংবা ল্যাগুন হলে ওটা কত বড়। কয়েক গজ থেকে কয়েক মাইলও হতে পারে।

বেলা দশটা নাগাদ কিউবা ও হাইতিকে একপাশে রেখে উড়ে চলল অটার। সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। সাদা ফেনা জমছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সাদা মালায় ঘিরে রেখেছে দ্বীপ দুটোকে।

ওগুলো যতই পেছনে পড়তে থাকল সামনে ভেসে উঠতে লাগল গ্রেট ইনাগুয়ার বুক। পানিতে ভেসে থাকা চ্যাপ্টা সমতল একটা শিং যেন। তার পেটে ল্যাগুনটা ঢুকে বসে আছে বিরাট এক গর্তের মত।

কাছাকাছি পৌঁছে কিছুটা নিচে নামল ওমর।

ককপিটে ওর পাশে বসা কিশোর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। এক ভ্রমণকারী দ্বীপটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিল: রহস্য আর রোমান্টিকতায় ঘেরা বিরাট এক ভূমিখণ্ড। তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারল না সে। রহস্য আছে ঠিকই, তবে রোমান্টিক হওয়ার মত কোন কিছু দেখতে পেল না। ঘন সবুজ বন নেই, নেই কোন রহস্যময় নীল পাহাড়ের চূড়া কিংবা গুপ্তনদী–জলদস্যুদের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে যে সব হরদম পাওয়া যায়। বিশাল এক স্লেটের মত লাগছে দ্বীপটাকে। স্লেটের মত রঙ, মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছোপ। ওগুলো লবণ ক্ষেত্র। লবণ তৈরি হয়। মানুষের আস্তানা। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে আছে ধবধবে সাদা বালির সৈকত। কিনারের পানি হালকা আকাশী। সাগরের গভীরতা ওখানে বড়ই কম।

প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে ভাঙছে পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ। প্রাচীরের দেয়াল খোলা সাগরের পানির সঙ্গে যেখানে সীমানা তৈরি করেছে, সেই জায়গাটার রঙের পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। প্রাচীরের ভেতরের অগভীর পানির রঙ কোথাও হালকা আকাশী, কোথাও সবুজ। কিন্তু বাইরে এসেই হঠাৎ করে ঘন নীল হয়ে গেছে। তারমানে ওখানে গভীরতা অনেক বেশি। অ্যাডমিরালটি চার্ট বলছে, হাজার হাজার ফুট গভীর। পানির রঙ ওপরে নীল,

যতই নিচে নামা যাবে কালচে হতে হতে একেবারে কালো হয়ে যাবে, ওখানে চিরঅন্ধকারের রাজত্ব। কল্পনা করতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। সাগরের সেই ঘন অন্ধকার তলদেশ থেকে ঠেলে উঠেছে শ্লেট রঙের প্রকাণ্ড দ্বীপটা, তাতে বাসা বেঁধেছে টকটকে লাল ফ্ল্যামিঙ্গো পাখির দল। নাহ্, পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা! মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে।

সৈকতের কাছ থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে দ্বীপের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ল্যাগুনটা। কেমন নিষ্প্রাণ, মরু-মরু চেহারা। একপ্রান্তে আরও দু'তিনটে খুদে-খুদে ল্যাগুন, যেন মায়ের সঙ্গে ছানারা। দ্বীপে গাছপালা খুবই কম। বেশির ভাগই রঙহীন, বিবর্ণ ঝোপ কিংবা ছোট আকারের তাল জাতীয় বৃক্ষ। ঝড়ে অঙ্গহীন, রোদে পোড়া কিছু নারকেল গাছ আছে, সৈকতের কাছেই বেশি। এসব গাছের জন্ম হয়েছে মূল ভূখণ্ড থেকে ঢেউয়ে ভেসে আসা ফল থেকে। একদিকে সৈকতের ধার ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে গরান গাছের ঘন জঙ্গল। এটাও ঢেউয়েরই দান, সন্দেহ নেই। এ ছাড়া আর সামান্য কিছু গাছ আছে, ছড়ানো ছিটানো। যেমন, বট। চারদিকে ডালপালা মেলে শাখা থেকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে নিয়ে একেকটা গাছ নিজেই একেকটা জঙ্গল হয়ে আছে।

ওরা যেদিক থেকে এগোচ্ছে, সেদিকে কোন জনবসতি দেখা গেল না। চার্ট বলছে ম্যাথু টাউনটা রয়েছে দ্বীপের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। এখান থেকে দেখা যায় না। অনেক ওপরে থাকলে হয়তো যেত। অ্যাডমিরালটি সেইলিং ডিরেকশন জানাচ্ছে আরও একটা জনবসতি আছে, ম্যান-অভ-ওঅর বে'তে। ধূসর পটভূমির কারণেই বোধহয় ওটাও চোখে পড়ল না। সৈকতের কিনারে ঢেউয়ের ছোঁয়ার ঠিক বাইরে পুরানো আমলের একটা স্কুনার ভেঙে পড়ে আছে, অর্ধেকটা গেঁথে রয়েছে বালিতে। দ্বীপের মরু-চেহারাটাকে যেন উস্কে দিচ্ছে আরও।

ল্যাগুনের অন্য প্রান্তে দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। লাল লাল কি যেন দেখা যাচ্ছে।

'ফ্ল্যামিঙ্গো,' ওমরও দেখতে পেয়েছে।

আরও কাছে গেল বিমান। ফ্ল্যামিঙ্গোই। সংখ্যায় কত আছে ওরা, কিশোরের কল্পনারও বাইরে।

ভালমত দেখার জন্যে অনেক নিচ দিয়ে উড়ছে ওমর। বিমানের শব্দ পাখিগুলোর পছন্দ হলো না। ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করল। এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য দৃশ্য। প্রথমে কয়েকশো পাখি একটা চাদরের মত প্রায় গায়ে গায়ে লেগে উড়াল দিল। যতই এগোল, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল আরও, আরও। নীল আকাশকে ছেয়ে দিল যেন লাল রঙের চাদর। তারপর বড় বড় টুকরো হয়ে ছিঁড়তে শুরু করল চাদরটা। ছেঁড়া কাপড়ের মতই কানাগুলো বাতাসে দোল খেয়ে কেঁপে কেঁপে উড়ল কিছুক্ষণ। শেষে যেন ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যার যেদিকে ইচ্ছে উড়ে বেড়াতে শুরু করল। মনে হচ্ছে আগুনের খণ্ড খণ্ড শিখা ডানা

ঝাপটে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কেন ওগুলোকে আগুনে ফ্ল্যামিঙ্গোও বলা হয় বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের।

তাড়াতাড়ি গতি বাড়িয়ে পাখিগুলোর কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওমর। ডানায় ধাক্কা লাগলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।

কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে মুসা আর রবিনকে ডাকল কিশোর। জানালা দিয়ে ওরাও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ককপিট থেকে আরও ভালমত দেখা যায়। সেটা থেকে বঞ্চিত করতে চাইল না ওদেরকে।

দরজায় এসে দাঁড়াল মুসা, 'খাইছে!' ফিরে তাকিয়ে বলল রবিন, 'দেখে যাও! ওখান থেকে তো কিছুই দেখা যায় না। তা-ও আমরা ভাবছিলাম কি সাংঘাতিক!'

'এমন করে ভয় পেয়ে যাবে জানলে অত নিচে নামতামই না,' ওমরের কণ্ঠে শঙ্কা। ধাক্কা থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'তারমানে প্লেন তেমন একটা আসে না এদিকে।'

দ্রুত ওপরে উঠছে বিমান। শেষ পাখিটাকেও ছাড়িয়ে এল। হাঁপ ছাড়ল ওমর। আর নিচে নামার চেষ্টা করল না।

পাক খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে আবার মাটিতে নেমে গেল বেশির ভাগ পাখি। কিছু পাখি নামলই না। উড়তে উড়তে হারিয়ে গেল নীল দিগন্তে।

চোখে পড়ল লিটল ইনাগুয়া। মূল দ্বীপটাকে ছুঁয়ে রয়েছে। যেন বাবার আঙুল ধরে হাঁটা শুরুর ভঙ্গি করছে বাচ্চা ছেলে। ওটার পর ডান, বাম; দুদিকেই অসংখ্য ছোট ছোট উপদ্বীপ ভাঙা জিগস পাজল সৃষ্টি করে রেখেছে যেন। যত রকম আর আকৃতি কল্পনা করা যায়, সব রকমের দ্বীপ আছে। সবগুলোকে ঘিরে রেখেছে ঢেউয়ের সাদা মালা। সাগরটাকে নীল চাদর কল্পনা করে নিলে দ্বীপগুলো সব সাদা বর্ডার দেয়া রঙিন বুটি। কোনটা সবুজ, কোনটা সাদা, কোনটা শ্লেট রঙের। অপূর্ব। হাঁটুর ওপর চার্ট বিছিয়ে নাম অনুসারে দ্বীপগুলোকে চিনে নেয়ার চেষ্টা চালাল কিশোর। প্রভিডেনশিয়ালিজ, অ্যামবারগ্রিস কেই, টার্কস আইল্যান্ড, ক্যাসল আইল্যান্ড...কত আর গুণবে! হাল ছেড়ে দিল শেষে।

কয়েকটা দ্বীপে অল্প পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কিছু ফ্ল্যামিঙ্গোকে। মূল দ্বীপ থেকে মাছ খেতে এসেছে সম্ভবত। ওখানে বাসা করেছে বলে মনে হলো না। এমনও হতে পারে, ওমর যেগুলোকে উড়িয়েছে, তাদেরই কয়েকটা পাখি মূল কলোনিতে ফিরে না গিয়ে ওখানে বসে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করছে। এই অনুমানটাই ঠিক। কারণ খানিক পরেই দেখা গেল পাখিগুলো উড়ে চলেছে গ্রেটার ইনাগুয়ার ল্যাগুনের দিকে।

কি বিশাল জায়গায় কত ক্ষুদ্র একটা জিনিস খুঁজতে বেরিয়েছে বুঝে দমে গেল কিশোর। খুদে খুদে ওসব দ্বীপে খুঁজে বেড়ানো অসম্ভব। তা ছাড়া কোনটারই আকৃতি নকশাটার মত লাগল না। কোনটাতেই হ্রদ নেই, ল্যাগুন নেই, বন নেই, একটা মূল্যবান দলিল দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, ওরকম কোন জায়গাই নেই। যে সূত্র নিয়ে বেরিয়েছে, সেটুকু দিয়ে দলিল

খোঁজার চেষ্টাটাকেও এখন বোকামি মনে হলো ওর।

আরও একটা ঘণ্টা চক্কর দিয়ে বেড়াল ওমর। জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিছু চোখে পড়ল?'

'কিচ্ছু না,' নিরাশায় ভরা কিশোরের কণ্ঠ।

'ইনাওয়া ছাড়া আশেপাশে আর কোন্‌খানে কলোনি আছে, বুঝলামই না। যেখানে সেখানে বসে থাকে ওরা। জায়গার অভাবে অন্যখানে সরে গিয়ে কিছু পাখি বাসাটাসা যদি করেও থাকে, সেগুলোকে কলোনি বলা যায় না।'

'বাসার চেহারাটা কেমন, নেমে দেখা দরকার। তাহলে ওপর থেকে বুঝতে পারব, কোনটা বাসা। ওপর থেকে দেখে চেনা গেলে খোঁজা সহজ হবে।'

'আবার ইনাওয়ার ল্যাগুনে যেতে বলছ?'

'তা ছাড়া আর বাসা কোথায় পাব?'

'তোমার কথামত আরেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা অবশ্য করা যেত, যদি পেট্রল থাকত প্রচুর। যা আছে,' কন্ট্রোল প্যানেলের মিটারের দিকে নির্দেশ করল ওমর, 'তাতে কোনমতে ফিরে যাওয়া যাবে হয়তো। নাকি সাগরে ডুবে মরার ঝুঁকিটা নিয়েই নেব?'

'নাহ্। তেল না থাকলে আর কি করা,' হতাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিল কিশোর। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ফিরেই যান।'

দুপুরের সামান্য পরে হোটেলে ফিরল ওরা। লাঞ্চের দেরি হয়ে গেল।

খিদে পেয়েছে সবারই। খাওয়ার সময় কথা বলল না। শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়ে ওমর বলল, 'নিজের চোখেই যা দেখার দেখে এলে। এখন কারও কোন পরামর্শ আছে?'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'এভাবে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। ভাবছি, কিংসটনে গিয়ে ফটোগ্রাফারের দোকানেই খোঁজ নেব নাকি?'

'নিলে মন্দ হয় না। হাসপাতালেও আরেকবার খোঁজ নেয়া দরকার,' রবিন বলল। 'ডেভন হয়তো আমাদের বলতে পারবেন, কোন দোকান থেকে ছবি ডেভেলপ করত হেস। তাতে দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়ানোর ঝামেলা আর সময় দুটোই বাঁচবে।'

'ঠিক বলেছ।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'কে আসবে আমার সঙ্গে?'

'তুমি রবিনকে নিয়েই যাও,' ওমর বলল। 'আমি এয়ারপোর্টে যাব প্লেনে তেল ভরতে। তারপর যাব হেসের ইয়টটা দেখতে। জেটিটাও যেহেতু বন্দরের কাছাকাছি, সুযোগ ছাড়ব কেন? এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে। মুসাকে আমার দরকার।'

'ঠিক আছে, যান,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'রবিন, ওঠো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে রওনা হলো ওরা। আগের দিনের ভাড়া-গাড়িটাতে করেই। ড্রাইভিং সীটে বসেছে রবিন। গাড়ি চালাতে

কিশোরের ভাল লাগে না। প্যাসেঞ্জার সীটে আরাম করে বসে থাকাটাই তার বেশি পছন্দ।

বিছানায় বসা অবস্থায় পাওয়া গেল ডেভনকে। তবে এখনও ফ্যাকাসে আর দুর্বল লাগছে তাঁকে। পা অনেক ফোলা। ডাক্তার বলেছেন, সেরে যাবে।

বার বার কিশোর আর ওমরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ডেভন। বললেন, ওদের কারণেই বেঁচেছেন। ওরা যদি সময়মত না যেত, সঠিক ব্যবস্থাটা নিতে না পারত, তাহলে হাসপাতালের বেডের পরিবর্তে হাসপাতালের মর্গে থাকতে হত এখন তাঁকে।

জানালেন, এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না, সাঁপটা কি করে এল ক্রাগেনের বাড়িতে। সাপই যে অঞ্চলে নেই, সেখানে একজনের বাড়িতে ঢুকে রেগে একেবারে টং হয়ে বসে রইল কামড়ে দেয়ার অপেক্ষায়-বিস্ময়কর লাগছে তাঁর কাছে। কোনমতেই মেলাতে পারছেন না।

এই ভয়ই করছিল কিশোর। জানত, কথাটা উঠবেই। সাপটা কোনখান থেকে এসেছে, কেন রেগে ছিল বলতে হলে হেসের গোপন কথাটা জানাতে হবে ডেভনকে। সেটা চায় না। তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে। ডিমটা ভেঙে যাওয়ার কথা বলল।

আফসোস শুরু করলেন ডেভন। জানেন তিনি। তাঁর হাত থেকে পড়েই ভেঙেছে। হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এই সময় ছোবল মারে সাপটা। হাত থেকে ডিমটা পড়ে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত মনে আছে। এরপর কি ঘটেছে, আর বলতে পারবেন না।

কিশোর তখন বলল, ডিমটা ভেঙে যাওয়াতে খুবই দুঃখ পেয়েছে ওরা। আর একটা ডিম এনে দিতে চায় ডেভনকে। কিন্তু ক্রাগেন কোনখান থেকে এনেছিল, জানে না। এমন হতে পারে পাখির বাসাসহ জায়গাটার ছবিও তুলে এনেছিল সে। সেগুলো ডেভেলপ করতে দিয়েছে। কিন্তু মারা যাওয়ায় আর নিয়ে আসার সময় পায়নি। ডেভন কি জানেন, কোন দোকানে ফটো ডেভেলপ করতে দিত ক্রাগেন?

হ্যাঁ, জানেন। বলতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না তিনি। হেমলিন নামে অ্যাকলিম স্ট্রীটের এক কেমিস্টের দোকানে। ডেভন নিজেও তার কাছ থেকেই ছবি ডেভেলপ করান। ক্রাগেনকে তিনিই দোকানটার ঠিকানা দিয়েছিলেন। ভাল একজন কেমিস্টের খোঁজ করছিল ক্রাগেন।

এর বেশি আর জানার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। যতটা সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে তক্ষুণি বিদায় নিল ডেভনের কাছ থেকে। রবিনকে তাড়াতাড়ি যেতে বলল অ্যাকলিম স্ট্রীটে। কিন্তু রাস্তাটা চেনে না রবিন। ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া গেল।

দোকানেই পাওয়া গেল মিস্টার হেমলিনকে। সরাসরি কাজের কথায় এল কিশোর।

হেমলিন জানালেন তিনি ক্রাগেনকে চিনতেন।

'মারা যাওয়ার আগে কি কোন ছবি ডেভেলপ করতে দিয়েছিলেন মিস্টার

ক্রাগেন?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়লেন হেমলিন। 'নাহ্। বেশ কিছুদিন দেননি।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। 'ছবি ডেভেলপের কাজটা কি আপনি নিজে করেন?'

'হ্যাঁ। কর্মচারীদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই।'

'তারমানে ছবির সমস্ত প্রিন্টই আপনি দেখেন। মিস্টার ক্রাগেনের এনে দেয়া ফ্ল্যামিঙ্গো কিংবা কোন দ্বীপের ছবি কখনও ডেভেলপ করেছেন?'

আবার মাথা নাড়লেন হেমলিন। 'নাহ্...মনে পড়ছে না।'

'ও। বিরক্ত করলাম আপনাকে। থ্যাংক ইউ।'

হতাশ হয়ে ঘুরতে যাবে কিশোর, ওর কালো মুখ দেখেই বোধহয় ডাকলেন হেমলিন, 'শোনো, বাসায় বসা ফ্ল্যামিঙ্গোর ছবি কি তোমার বেশি দরকার? তাহলে কার কাছে পাবে বলে দিতে পারি।'

'কার কাছে?' উত্তেজনাটা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিশোর।

'দু'তিন দিন আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন নেগেটিভের একটা স্পুল নিয়ে। খুব ভাল উঠেছে ছবিগুলো।'

'কপি আছে আপনার কাছে?'

'না, আমি কপি রাখি না। অন্যের জিনিস দিয়ে ব্যবসা করার আগ্রহ আমার নেই। নেগেটিভও ফেরত দিয়ে দিই।'

'নাম কি ভদ্রলোকের?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিশোর। 'ঠিকানা জানেন?'

'এক মিনিট।' খুব ধীরে সুস্থে অর্ডার বুকটা টেনে নিলেন হেমলিন। আঙুল রেখে রেখে লিস্টে খুঁজতে লাগলেন নামটা। 'এই যে, পাওয়া গেছে। মিস্টার ডুগান। ম্যাইসন রেসপিরোতে উঠেছেন। ছবিগুলো কি করে পেলেন তিনি বলতে পারব না...'

আর কিছু শুনতে চাইল না কিশোর। যা জানার জেনে গেছে। কোনমতে সৌজন্য দেখিয়ে হেমলিনকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'শুনলে তো?' তিক্তকণ্ঠে রবিনকে বলল সে। 'ডুগান নিয়ে গেছে। দ্বীপ খুঁজে বের করতে ওর আর কোন কষ্টই হবে না। ছবি থাকলে আর কি চাই?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'সাংঘাতিক চালাক লোক।'

'আসল কথা, আমাদের আগেই গিয়ে বসেছিল বলে ক্যামেরা হাতানোর সুযোগটা পেয়ে গেছে। ওমরভাইকে জানানো দরকার। ডুগান কোথায় আছে, জানি আমরা। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো এখনও ধরা যাবে তাকে।'

'আমরা তাড়াহুড়ো করলে কি হবে? ওমরভাই যে কাজে গেছেন, তাতে সময় লাগবে। এক কাজ করা যায়। হোটেলে না গিয়ে প্রথমে এয়ারপোর্টে, তারপর বন্দরে গিয়ে দেখতে পারি।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'গিয়ে দেখা গেল নেই ওরা। আমরা যাওয়ার আগেই হোটেলে রওনা হয়ে গেছে। তাহলে আরও বেশি দেরি হবে। তারচেয়ে হোটেলেই যাই। অপেক্ষা করব।'

কিন্তু রবিনের অনুমান ঠিক হলো না। হোটেলে ফিরে দেখা গেল ওমর আর মুসা অনেক আগেই এসে বসে আছে। কিশোরকে উত্তেজিত দেখে ওমর ভাবল, ছবিগুলোর খোঁজ পাওয়া গেছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন? ইয়ট দেখা হয়ে গেল?'

'দেখব কোত্থেকে?'

'কেন?'

'বন্দরে নেই ওটা।'

তাকিয়ে রইল কিশোর।

'আমরা তো চিনি না,' রুক্ষ স্বরে বলল ওমর, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সাহায্য চাইলাম। বললাম জাহাজটাকে চেনে এমন একজন লোক দিতে। দিল। তাকে নিয়ে বন্দরে গিয়ে দেখি ওটা নেই। তখন খোঁজ পড়ল। এর আগে কেউ খোঁজও করেনি, বন্দর কর্তৃপক্ষেরও গোচরে আসেনি যে ইয়টটা খোয়া গেছে। মালিক নেই, খোঁজ করবে কে? তদন্তে আরও কাহিনী বেরিয়ে এল। বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের জানাল, কাল রাতে একজন জেলে নাকি তার নৌকা চুরি গেছে বলে অভিযোগ করেছে। পরে পাওয়া গেছে নৌকাটা। তীর থেকে কিছুটা দূরে ভাসছিল। কোন সন্দেহ নেই ওটাতে চড়েই ইয়টে গিয়ে উঠেছিল চোর, তারপর নৌকাটা ছেড়ে দিয়েছে।...তা তোমাদের খবর কি?'

'আপনাদের চেয়ে খারাপ,' নাকমুখ কুঁচকে বলল কিশোর। 'ব্রন ডুগান ছবিগুলো নিয়ে গেছে। ক্রাগেনের নেগেটিভ ডেভেলপ করতে দিয়েছিল। তারপর ছবি আর নেগেটিভ সব নিয়ে গেছে। একটা কপিও রাখেনি দোকানে।'

সিগারেট বের করে ধরাল ওমর। 'হুঁ, সবকিছু এখন পরিষ্কার। ডেভনের কাছে পাখির কথা জেনে গিয়ে ক্রাগেনের বাড়ি থেকে ক্যামেরা আর স্পুল চুরি করেছে ডুগান। ডেভেলপ করেছে। আসল সূত্র যা পাওয়ার পেয়ে গেছে সে।'

'ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া উচিত এখন সেগুলো!' রেগে গেল রবিন।

'পাবে কোথায়?' শুকনো হাসি হাসল ওমর। 'ইয়টটা নেই কেন বুঝতে পারছ না?'

'আপনার ধারণা,' ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'ও-ই চুরি করেছে?'

'তো আর কে? ইয়টটা না পেয়ে পুলিশকে বললাম ম্যাইসন রেসপিরোতে খোঁজ নিতে। জানা গেল, কাল রাতে দুজন গেস্ট হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। একজন ব্রন ডুগান, আরেকজনের নাম ডক্টর রৎসি ব্রোমানভ, ইয়োরোপিয়ান। এখানকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে এসেছেন। আহা, কি আমার প্রফেসর! চোরের সাগরেদ বাটপাড়! শিওর ওই নকল ডুগানটা, সুইমিং পুলের কাছে যাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। কোন যাত্রীবাহী জাহাজে চড়েনি ওরা। কাল রাতে অন্য কোন জাহাজও ঘাট ছেড়ে যায়নি। প্লেনে করেও যায়নি ওরা। কারণ শেষ যে প্লেনটা ছেড়ে গেছে, যখন গেছে তারও অনেক পরে হোটেল ছেড়েছে দুই ডুগান, আসল আর নকল। এরপরও কি অনুমান করতে

কষ্ট হয়, রোগ এখন কোন্ ব্যাটাদের দখলে?'

ছয়

রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। ইয়টটাকে খুঁজে বের করতে হবে আগে। ওটার পিছু নিলে পৌঁছে যেতে পারবে হেসের দ্বীপে। বিমান নিয়ে আকাশ থেকে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথাটা ডুগানও নিশ্চয় চিন্তা করবে। খোলা সমুদ্রে থাকতে চাইবে না দিনের বেলা। তা ছাড়া চল্লিশ ঘণ্টা আগে রওনা দিয়েছে। দ্বীপটা কাছাকাছি হলে ওরা পিছু নেয়ার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে লুকিয়ে পড়তে পারবে–যদি দ্বীপে ইয়ট লুকানোর জায়গা থেকে থাকে।

'একটা কথা মাথায় ঢুকছে না,' মুসা বলল, 'ডুগান জানে আমরা আছি এখানে। তারপরেও ইয়টটা চুরি করল কেন? আমরা সব বুঝে ফেলে ওর পিছু নেব, জানে না?'

'জানে,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আর কি করবে? জাহাজ ভাড়া করতে প্রচুর টাকা লাগে। টাকা হয়তো ম্যানেজ করতে পারত। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, ভাড়া করা জাহাজের নাবিকেরা চোখ বন্ধ করে থাকবে না। ডুগান কি করছে দেখবে। প্রশ্ন করবে। ভুলে যেয়ো না, এসব দ্বীপ এককালে জলদস্যুতে গিজগিজ করত। গুপ্তধনের গুজব যখন তখন ছড়ায়। কোন নির্জন দ্বীপে ডুগানকে নেমে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে ওরা। ঝামেলা বাধাবে। তারচেয়ে ইয়টটা চুরি করে চলে যাওয়া অনেক সহজ। তাতে শুধু আমরা পিছে লাগব, দ্বীপসুদ্ধ সমস্ত মানুষ তো আর লাগবে না। খবরটা ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের দ্বীপ থেকেও নৌকা নিয়ে ছুটে আসবে গুপ্তধন শিকারিরা।'

'প্লেনের এঞ্জিনের শব্দে সাবধান হয়ে যেতে পারে সে,' রবিন বলল।

'কিছু করার নেই। তবে এটাও ঠিক, আমাদেরটাই একমাত্র এরোপ্লেন নয়। আরও প্রচুর আছে। সাগরের ওপর দিয়েই পথ। তা ছাড়া সে জানে না আমাদেরটা কোন্ ধরনের প্লেন। সতর্ক থাকবে ঠিকই, তবে দেখলেও চিনতে পারবে না।'

সুতরাং পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। সারাদিন খুঁজে বেড়াল। খোঁজার জিনিস এখন দুটো: হেসের ইয়ট, আর ফ্ল্যামিঙ্গোদের নতুন কলোনি।

দুঃখের বিষয়, কোনটাই পেল না।

তার পরদিন খুব সকালে আবার বেরোল। ইনাগুয়ার চারপাশে দেড়শো মাইলের মধ্যে সমস্ত এলাকা চষে ফেলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ওমর। তার উদ্বেগ আরও বাড়ানোর জন্যেই যেন আবহাওয়ারও অবনতি ঘটল। আগের রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ওরা যখন দিনের বেলা বেরিয়েছে, মাঝে মাঝেই খারাপ হয়েছে আকাশ। বিদ্যুৎঝড়ের কারণে

কয়েকবার গতিপথ থেকে সরে যেতে হয়েছে ওমরকে। দক্ষিণ-থেকে আসা মেঘ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ঢেলেছে সাগরের বুকে।

'কি করব এখন বুঝতে পারছি না,' লাঞ্চের সময় বলল ওমর।

'একটা কথা চিন্তা করছি আমি,' কিশোর বলল। 'সকালে ঘোরার সময় মাথায় এসেছে। ইনাগুয়ার ল্যাগুনটার আকৃতি বদলে গেছে, লক্ষ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'করেছি।'

'কাছাকাছি আরও কিছু জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে।'

মুখ তুলে তাকাল ওমর। 'কোনটাকে নকশাটার মত মনে হয়েছে?'

'সাগরের কিনার ঘেঁষে একটাকে কিছুটা ওরকম লেগেছে। তবে ওসব জলাশয়ের কথা ভাবছি না আমি। ওগুলো সাময়িক। বৃষ্টি পড়লে হয়, শুকিয়ে গেলে শেষ। আমি ভাবছি, পানি বেড়ে কিংবা কমে গেলে কোন একটা বিশেষ ল্যাগুনের চেহারা নকশাটার মত হয়ে যায় না তো?'

'তারমানে আবার যেতে হবে ইনাগুয়ায়,' উত্তেজিত হয়ে বলল রবিন।

'যাওয়াটাই তো উচিত মনে হচ্ছে,' মাথা দোলাল ওমর। 'আজকে তো আর সময় নেই, আকাশের অবস্থাও সুবিধের না। কাল সকালে যাব।'

'ডুগান ওখানেই গিয়ে থাকলে দেখে ফেলবে আমাদের,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'ভালই তো হবে,' কিশোর বলল। 'আমরা তো ওকে খুঁজছিই। যদি দেখি ওখানে আছে, শিওর হয়ে যাব ওইটাই হেসের দ্বীপ।'

'ধরা যাক, সঠিক ল্যাগুনটা পাওয়া গেল, ইয়টটাও দেখতে পেলাম, কি করব?'

'আকাশ থেকে কিছুই করতে পারব না,' জবাব দিল ওমর। 'করতে হলে নামতে হবে। প্রথমে ডিম্বাকৃতির ল্যাগুনের পাশে বর্গাকার চিহ্ন দেয়া জায়গাটা খুঁজব। ওটা কিজন্যে দিয়েছে হেস, জানি না। তবে কোন কারণ নিশ্চয় আছে, নইলে দিত না। কালকে খাবার আর পানি নিয়ে যাব সঙ্গে করে, নামতে হলে ওসব লাগবে। পকেট কম্পাস নিতে হবে সবাইকে। ছড়িয়ে গিয়ে খোঁজার প্রয়োজন পড়তে পারে। ওপর থেকে দ্বীপটাকে সমতল মনে হলেও খানাখন্দ, ঝোপঝাপ নিশ্চয় আছে। রাস্তাঘাটও নেই তেমন।'

ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছাল সে।

'কোন্ জায়গায় নামলে সুবিধে হবে মনে করেন?' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সেটা ওখানে না গিয়ে বোঝা যাবে না। ম্যাপ দেখে কিছু বলতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সার্ভে হয়েছে বহু আগে। এতদিনে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বৃষ্টি হলেই যেখানে ল্যাগুনের চেহারা পাল্টে যায়, সেখানে ম্যাপের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা কোনমতেই উচিত নয়।'

'ল্যাগুনে নামা যায় না?' কিশোরের প্রশ্ন। 'অনেক বড়। পানিও আছে।'

'যায়. তবে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। পানি কোনখানে কতটা গভীর, জানি

না। নিচে পাথর থাকতে পারে। চোখা পাথরে লেগে প্লেনের পেট চিরে গেলে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। তা ছাড়া জায়গাটা অতিরিক্ত খোলা। ডুগানের চোখে পড়ে যাব। যে রকম জায়গা, আমাদের খুন করে যদি প্লেনটা পুড়িয়ে ফেলে, পোড়া ছাই ডুবিয়ে দেয় ল্যাগুনের পানিতে, কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। ভাল কথা, কাল সঙ্গে করে পিস্তলও নিয়ে যেতে হবে আমাদের। ডুগান একা যায়নি। তার নকল দোস্ত আছে, ফ্রিক সায়াকেও নিশ্চয় নিয়েছে। এ ছাড়াও আরও লোক নিতে পারে। তারা কেউই যে ফেরেশতা হবে না, এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়া যায়।'

বাকি বিকেল আর সন্ধেটা আলোচনা করেই কাটল। রাতে সকাল সকাল ঘুমাতে গেল ওরা। পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ল প্লেন নিয়ে।

আটটা নাগাদ দিগন্তে ফুটে উঠল ইনাগুয়ার চেহারা। প্রকাণ্ড এক জলজন্তুর মত গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে যেন পানিতে ভেসে।

সবাই উত্তেজিত। কিশোরের অনুমান ঠিক হয় কিনা দেখতে আগ্রহী। ল্যাগুনের ওপর এসে চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়তে লাগল ওমর। বেশি নিচে নামল না। সাবধান রইল পাখিগুলোর ব্যাপারে। যাতে ভড়কে গিয়ে আগেরবারের মত উড়তে শুরু না করে।

মূল ল্যাগুনটা মোটেও হেসের আঁকা নকশার মত মনে হলো না। তবে সাগরের ধার ঘেঁষে যে তিনটে উপল্যাগুন আছে, তার একটাকে মনে হলো ওরকম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চিৎকার দিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে, দেখুন ওটা! নকশাটার মত লাগছে না?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওমর। চুপচাপ দেখল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। দাঁড়াও, আরও কাছে থেকে দেখি।'

উপল্যাগুনটার ওপর উড়তে উড়তে বলল সে, 'দেখো, কাছাকাছিই আছে অনেকগুলো পাখির বাসা। একটা ডিম তুলে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধেই হয়নি হেসের।'

'আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি,' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল কিশোরের। 'ল্যাগুনটার একধারে দেখুন কেমন ফোঁড়ার মত উঁচু হয়ে আছে। নকশায় আঁকা বর্গটার সঙ্গে মিলে যায় না? এত ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ওটা কি। আরও নিচে নামান।'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে। 'মনে হচ্ছে এতদিনে কষ্ট সার্থক হতে চলেছে। কাউকে দেখছিও তো না। পাখিগুলোও চুপচাপ। তারমানে কেউ কাছে যায়নি এখনও।'

'কিন্তু ইয়টটা কোথায়?' পানির কিনারায় যতদূর চোখ যায়, দেখতে লাগল কিশোর।

'ওদিকে আছে নাকি দেখি,' বলে উপকূলের দিকে নাক ঘুরিয়ে দিল ওমর।

তীর বরাবর উড়ে পুরো দ্বীপ চক্কর দিয়ে এসেও জাহাজটা চোখে পড়ল

না। ঘণ্টাখানেক লাগল তাতে। ছোট, বড়, মাঝারি, কোন ধরনের জলযানই চোখে পড়ল না।

'ইয়ট লুকানোর সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা এখানে ওই গরান গাছের জঙ্গল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বনটার দিকে তাকাতে লাগল ওমর। 'দেখতে হলে নিচে নামতে হবে। আকাশ থেকে চোখে পড়বে না।'

'হ্যাঁ, নামতেই যখন হবে,' কিশোর বলল। 'দেরি করে লাভ নেই।'

'নামার জায়গাই খুঁজছি। ল্যাগুন থেকে বেশি দূরে হওয়া চলবে না। আবার জঙ্গলও যাতে দূরে না পড়ে।'

সেরকম জায়গা খুঁজে বের করা গেল। জঙ্গল আর ল্যাগুন থেকে প্রায় সমদূরত্বে, একটা খাঁড়ি। ওপর থেকে পানির রঙ দেখেই বোঝা যায় যথেষ্ট গভীর, ডুবোচড়া কিংবা টিলা নেই। ঢেউও খুব কম, সাদা ফেনার অনুপস্থিতিই তার প্রমাণ।

ম্যাপ থেকে মুখ তুলে বলল কিশোর, 'এটাই ম্যান-অভ-ওঅর বে।'

ওটা থেকে হাঁটাপথে জঙ্গলটাও চার মাইল দূরে, ডিম্বাকৃতির ল্যাগুনটাও। জঙ্গলের আরও কাছাকাছি নামা যায়, কিন্তু শত্রুরা থেকে থাকলে তাদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দূরে থাকাই ভাল। তবে ল্যাগুনের আরও কাছাকাছি নামার সুবিধে থাকলে, নামা যেত। নেই। সাগর ওখান থেকে আধমাইলও হবে না। উপকূল রক্ষা করছে প্রবাল প্রাচীরের বেড়া। ভেতর দিকে বিমান নামানো নিরাপদ নয়, ডুবোটিলা থাকার সম্ভাবনা ষোলোআনা। বাইরের দিকে সাগর ভীষণ অশান্ত। একমাত্র নিরাপদ জায়গা ওই খাঁড়িটাই।

নিচে নামতে শুরু করল ওমর। পানি ছোঁয়ার আগে শেষবারের মত ভাল করে দেখে নিল চোখা পাথরের চাঙড় কিংবা টিলা আছে কিনা। তারপর সহজেই নামিয়ে আনল বিমান। দৌড় শেষ করে থেমে গেল ওটা। আলতো ঢেউয়ে দুলতে লাগল মৃদু মৃদু। বাতাস নেই। রোদের তেজ বোঝা গেল তাই।

সবাইকে এক জায়গায় জড় করল ওমর। ওর প্ল্যান বুঝিয়ে বলতে গিয়ে ছোটখাট একটা লেকচার দিয়ে দিল, 'আমার বিশ্বাস, হেসের দ্বীপ এটাই। ডেডনকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে, পাখি আর ডিমের লোভ সামলাতে না পেরে যদি তিনি বেরিয়ে পড়তে চান, সেকারণে তাঁকে ঠেকানোর জন্যে মিথ্যে বলেছিল সে। আশেপাশে নির্জন দ্বীপ প্রচুর থাকলেও ফ্ল্যামিঙ্গোদের তৃতীয় কোন কলোনি নেই।

'যাই হোক, দুই জায়গায় দেখতে যেতে হবে এখন আমাদের। একটা ওই গরান গাছে জঙ্গল, আরেকটা ল্যাগুন। ইয়টটা এসে থাকলে, ওই জঙ্গলেই ঢুকে বসে আছে। ডুগানের আগেই ফর্মুলাটা বের করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে আমাদের। একই জায়গায় একসঙ্গে সবার যাওয়ার দরকার নেই, তাতে সময় নষ্ট। প্লেন পাহারা দেয়ার জন্যেও থাকতে হবে একজনকে। ফিরে এসে যদি দেখি নোঙর খুলে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে, কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, মোটেও সুখকর হবে না সেটা। ডুগানকে দিয়ে সবই সম্ভব। আমি ভাবছি, প্লেনটা আমিই পাহারা দেব। তোমরা দুই ভাগ

হয়ে দুটো জায়গায় চলে যাও। জঙ্গলে ইয়ট খুঁজতে ঝামেলা বেশি হওয়ার কথা, তাই দুজন যাও সেদিকে। অন্য একজন যাও ল্যাগুনের পাশের উঁচু জায়গাটায় কি আছে দেখতে। সময় খুব বেশি লাগার কথা নয়। তিন ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে সবাই। কে কোথায় যাবে, তোমরাই ঠিক করো। কোন প্রশ্ন আছে?'

'ফ্ল্যামিঙ্গোগুলোকে কাছে থেকে দেখার ইচ্ছে আমার,' কিশোর বলল।

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল ওমর, 'তাহলে তোমরা দুজন জঙ্গলে যাও। মনে মনে আমিও তোমাদেরকে পাঠানোর কথাই ভাবছিলাম। গুপ্তধন খুঁজে বের করায় কিশোরই বেশি এক্সপার্ট।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমাকে কিন্তু একা যেতে হবে।'

'কোন অসুবিধে নেই।'

'বেশ। সঙ্গে করে পানির বোতল নিয়ে যাও। কিছু বিস্কুটও নিতে পারো। মনে রাখবে, তিন ঘন্টা। পাঁচ ঘন্টা পরও কেউ না ফিরলে বুঝতে হবে সে বিপদে পড়েছে। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলো?'

তিনজনেই চুপ করে রইল। কারও কোন প্রশ্ন নেই।

'বেশ,' ওমর বলল, 'তাহলে এইই ঠিক হলো। প্লেনটা তীরের আরও কাছে নিয়ে যাচ্ছি যাতে শুকনোর মধ্যে নামতে পারো।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আর, পিস্তল অবশ্যই নেবে সঙ্গে। ডুগান আর তার দোস্তদের কোন বিশ্বাস নেই!'

সাত

সোজা পুবদিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। উঁচু জায়গাটা কি, টিবি না অন্য কিছু সেটা ভেবে সময় নষ্ট করল না। গেলেই দেখতে পাবে। বরং ভাবতে লাগল কোনদিক দিয়ে গেলে সহজে যাওয়া যায়।

দুটো পথ। একটা সরাসরি, আরেকটা উপকূল বরাবর, ঘুরে। অহেতুক ঘুরতে যাওয়ার কোন মানে নেই। শর্টকাটটাই বেছে নিল। কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পরই বুঝল, ঘুরেই যাওয়া উচিত ছিল। আকাশ থেকে যে জায়গাটাকে চ্যাপ্টা, সমতল মনে হয়েছে সেখানে দেখা গেল প্রচুর বাধা। আপতত সামনে পড়ল তরাই অঞ্চল।

সময় বেঁধে দিয়েছে ওমর। তরাই ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল সে, তিন ঘন্টায় চার মাইল গিয়ে ফিরে আসা কি সম্ভব? বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না এটা নিয়ে। দু'এক ঘন্টা বেশি যদি লাগেই তো লাগুক। সঙ্গে পানিও আছে, খাবারও আছে। পানি আনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। যা গরমের গরম, তার ওপর নেই বাতাস, পানি ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।

কিছুদূর এগিয়ে একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেল। পুরানো না নতুন বোঝা না গেলেও এটা বোঝা গেল, মানুষে তৈরি করেনি। পথটা এগিয়ে গেছে

কাঁটাঝোপের দিকে।

সেই পথ ধরে আরও কিছুদূর এগোনোর পর পাওয়া গেল একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। অবাক হলো। এখানে এরকম একটা গ্রাম থাকবে, আশা করেনি। আদিম কোরাল, পাতা আর কাঠে তৈরি পুরানো কুঁড়েগুলো পড়ে আছে নির্জন, নিঃসঙ্গ। যেন মৃত্যু আর ধ্বংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কয়েকটা কুঁড়ে কোনমতে টিকে রয়েছে, চালাটা খাড়া রেখে দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে অবস্থায়, বাকি সব ধসে পড়েছে। জানালার পাল্লা নেই। দূর থেকে দেখে মনে হয় দেয়াল থেকে তাকিয়ে রয়েছে ওগুলো একচোখো অন্ধ মানুষের মত। দরজা-জানালার পাল্লাও জায়গামত নেই। ভাঙা, মরচে ধরা কব্জা থেকে ঝুলে আছে কাত হয়ে। একটা গির্জাও দেখা গেল। বেদি দেখে বোঝা গেল যে ওটা গির্জা ছিল। ওটার কাছে মাটির ছোট ছোট ঢিপি দেখা গেল অনেকগুলো। পুরানো কবর। কোন কোনটার মাথার কাছে ক্রুশ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেগুলো। ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। বাকিগুলোর মতই ধসে পড়ে মাটিতে মিশে যাবে একদিন।

ম্যাপে দেখা ম্যান-অভ-ওঅরের কাছের জনবসতি বোধহয় এটাই। এভাবে বাড়িঘর ফেলে কেন চলে গেছে মানুষগুলো, কে জানে। মহামারী লেগেছিল হয়তো। কবরগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হলো ওর। বিষণ্ণ, ভয়াবহ পরিবেশ, যেন মনে করিয়ে দেয় বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই; এটাই হবে তোমার শেষ পরিণতি!

গাঁয়ের শেষ বাড়িটার কাছে এসে দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়াল ও, জিরানোর জন্যে। একচোখো জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। ফোকর দিয়ে রোদ ঢুকে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বিচিত্র সাদা আল্পনা তৈরি করেছে। মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি। এককোণে বড় একটা মাকড়সাকে স্থির হয়ে ঝুলে থাকতে দেখল। যতই মরে থাকার ভান করুক, কিশোর জানে, জালে পোকা পড়ামাত্র সচল হয়ে উঠবে ওটা, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

মিনিটখানেকের বেশি দাঁড়াল না সে। সময় নেই। গ্রাম ছাড়ানোর পর কোথাও ছায়া দেখল না। গরম! প্রচণ্ড গরম! নিষ্ঠুর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন চামড়ার ওপর। রুমাল দিয়ে ক্রমাগত ঘাড় মুছেও ঘামের কোন কিনারা করতে পারল না সে।

সামনে ঘাসে ঢাকা জমি। তৃণভূমির এমন রূপ জীবনে দেখেনি সে। সবুজ তো নেইই, রুক্ষ, বিবর্ণ। মাইলখানেক ধরে বিছিয়ে থাকা খসখসে ঘাসের রঙ বাদামী, মাঝে মাঝে কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। দু'একটা গাছ আছে এখানে ওখানে, ঘাসের মতই প্রাণহীন, বিধ্বস্ত চেহারা। ডাল থেকে ঝুলে থাকা পাতাগুলো ধাতুর মত চকচকে। লক্ষ করল, প্রায় প্রতিটি জিনিসই চকচক করছে। কারণটা বুঝতে পারল শুকনো পানির গর্তগুলো পরীক্ষা করে। নিচে কাদা নেই, লবণ জমে আছে। লবণের কণা ছড়িয়ে আছে সবখানে। প্রবল ঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাস কিংবা বাতাসে বয়ে আনা পানির কণার সঙ্গে চলে

আসে এই লবণ। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, ইনাগুয়াও প্রায় মরুদ্বীপ। দূরে চোখে পড়ছে কতগুলো নারকেল গাছ। অন্য গাছগুলোর মতই মরা মরা চেহারা। তৃণভূমির অন্য প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে নানা ধরনের উঁচু-উঁচু কাঁটাঝোপ। বিশাল ক্যাকটাস আছে। পুরো এলাকাটায় কেবল ওগুলোর ফুলই উজ্জ্বল বর্ণের, ঝলমলে রঙ।

ঝোপ আর ক্যাকটাস বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামনে। এড়ানোর জন্যে অনেকটা ঘুরে এগোতে হচ্ছে ওকে।

মজার ব্যাপার হলো, এত রুক্ষ অঞ্চলেও বুনো প্রাণীর অভাব নেই। পেলিকান, গ্রেবিস আর নানা জাতের বক দাঁড়িয়ে আছে থকথকে কাদায় ভরা পানির গর্তগুলোতে। কয়েক ধরনের গিরগিটি আর অগুণতি কাঁকড়া দেখা গেল। এই কাঁকড়াগুলো মূলত ডাঙার বাসিন্দা, তবে পানিও এদের পছন্দ। বড় বড় হলুদ চোখে শয়তানি ভরা চাহনি। সবাই ব্যস্ত। মাটি খুঁড়ে গর্ত বানাচ্ছে। ভীষণ তাড়াহুড়া যেন সবার মধ্যে। চট করে আকাশের দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। ঝড়বৃষ্টি আসছে নাকি? প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখলেই এ ধরনের ডাঙার কাঁকড়ারা ঘর বানাতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু ঝকঝকে আকাশে সূর্যকে আগুন ঢালতে দেখে বোঝার কোনই উপায় নেই, ঝড় হবে কিনা।

পাশ কাটানোর সময় হুমকির ভঙ্গিতে দাঁড়া উঁচু করে ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল কাঁকড়ারা। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মরা কাঁকড়ার খোসা। এলাকাটাকে ভয়ঙ্কর রূপ দিয়েছে। যেন এক ভয়াবহ মহাশ্মশান।

মাড়িয়ে যাওয়ার সময় পায়ের চাপে মচমচ করে ভাঙছে কাঁকড়ার খোসা। শব্দটা ভাল লাগল না মোটেও। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল।

প্রতিটি গাছেই কাঁটা। চলার সময় ডালপাতা বাড়ি লাগে গায়ে, পুটপুট করে কাঁটা ফোটে। থেমে যেতে হয় তখন গায়ে বেঁধা কাঁটা বের করার জন্যে।

সমস্যা আরও আছে। লবণ মেশানো আঠাল থকথকে সাদা কাদা। পা ফেললেই জুতো কামড়ে ধরে। তার ওপর রয়েছে মশা। রোদের মধ্যেও এসে ছেঁকে ধরছে। ওগুলোর মিলিত গুঞ্জন শুনে মনে হয় দূর থেকে প্লেন আসছে, এতটাই জোরাল। চোখ, নাক, কান, হাত যেখানেই সামান্যতম খোলা পাচ্ছে, এসে বসে যাচ্ছে। রুমাল দিয়ে বাড়ি মেরে তাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। বৃথা চেষ্টা। একশোটা সরলে হাজারটা এসে ধরে।

কম্পাস বের করে দেখে নিল ঠিকপথে এগোচ্ছে কিনা। এগোতে এগোতে সামনে একটা বটগাছ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রায় একরখানেক জায়গা জুড়ে ছায়া দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশিক্ষণ আরাম করার সাহস পেল না। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়েই উঠে পড়ল। বোতল থেকে পানি খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

যতই এগোচ্ছে, সামনে আরও খারাপ হচ্ছে রাস্তা। বাড়ছে কাঁটঝোপের পরিমাণ। ঘনও হচ্ছে। ভয় পেয়ে গেল. এর ভেতর দিয়ে এগোবে কি করে!

শুকনো একটা শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাতের তালুতে কাঁটা ফোটাল বেশ কয়েকটা। বের করতে কষ্ট হলো খুব।

আরও কিছুদূর এগিয়ে পৌছল এমন এক জায়গায়, যেখানে চুনাপাথরের ছড়াছড়ি। ধূসর রঙের পাথরগুলো কাঁচের মত চকচকে। রোদ প্রতিফলিত করে ফেলছে চোখেমুখে। ফোস্কা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। একপাশে খানিক দূরে একটা ছোট পাহাড়। গা দেখে অবাক হয়ে গেল সে। স্পঞ্জের মত ছিদ্র হয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ শামুকের খোসা আর নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল রোদে দগ্ধ হচ্ছে। চুনাপাথরে পরিণত হতে সময় লাগবে না। হয়েও গেছে কিছু কিছু। ওই পাহাড়টা একসময় পানির নিচে ছিল এবং সেটা খুব বেশিদিন আগে নয়, বোঝা যায় দেখলেই। সাগর যেখানে রয়েছে এখন, তাতে পানি বেড়ে গিয়ে ওই পাহাড়কে ডুবিয়ে দিতে পারে আবার যে কোনদিন।

শর্টকাটের লোভে পাহাড় ডিঙানোর চেষ্টা করল না সে। চকমকির মত শক্ত, ধারাল পাথরের ঢাল। কোন কারণে পা পিছলে আছাড় খেলে হাত-পা ভাঙা থেকে যদিও বা রেহাই পায়, কত জায়গায় যে কাটবে ঠিকঠিকানা নেই। অতএব কাঁটা ফোটানোটাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে আবার ঘুরে দাঁড়াল ঝোপগুলোর দিকে।

কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর মোটা কয়েকটা ডাল ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পথ একেবারে বন্ধ করে দিল। এত কষ্ট করে এসে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না সে। মরিয়া হয়ে এগোনোর পথ খুঁজতে শুরু করল।

শুরুর দিকে যে ধরনের পায়ে চলা পথ দেখতে পেয়েছিল, ওরকম একটা সরু রাস্তা দেখতে পেল ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কিসে করেছে ওই পথ? কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে কারা চলাচল করে?

কিন্তু বেশি ভাবনাচিন্তার সময় নেই। ঢুকে পড়ল তাতে। কাঁটা, লবণাক্ত কাদা, আর ধারাল পাথরে লেগে লেগে জুতোর যা অবস্থা হয়েছে, আর বেশিক্ষণ টিকবে না। জুতো ছিঁড়ে গেলে কিংবা তলা খসে গেলে যে কি বিপদে পড়বে, ভাবতে চাইল না আর।

হাঁটতে হাঁটতেই একটা বিস্কুট চিবাতে লাগল। দাঁড়িয়ে খাওয়ার সময় নেই। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। তিন মাইল পেরিয়েছে। হিসেব মত আরও মাইলখানেক রয়ে গেছে। এই হারে চললেও এক ঘণ্টার ধাক্কা।

ঝোপের ভেতর দিয়ে কিছুদূর এগোতেই কিসে পথ করেছে সেই রহস্যের জবাব পেয়ে গেল। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেল বাদামী রঙের নোংরা কাদামাখা এক মাদী শুয়োরের সঙ্গে। সঙ্গে কয়েকটা বাচ্চা। ওকে দেখে ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে এদিক ওদিক ছুটে পালাল ছানাগুলো। কোথাও স্বস্তি না পেয়ে আবার ফিরে এল মায়ের কাছে। পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে কুতকুতে চোখে তাকাতে লাগল অযাচিত উপদ্রবের দিকে।

ধাড়ি শুয়োরটা খুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁত দেখাল। পিস্তল বের করে ফেলল কিশোর। পেছনে দৌড় দিলে রক্ষা নেই। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। চোখের দৃষ্টি দিয়ে একে অন্যকে পরাজিত

করার চেষ্টা চলল। তারপর শেষবারের মত একবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে যেন বলল, 'যাও, নতুন এসেছ বলে এবারকার মত মাপ করে দিলাম। আবার যদি সামনে পড়ো···হুঁ-হুঁ, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!'

কিশোরকে ভালমত শাসিয়ে দিয়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়ল শুয়োরটা।

কিশোরও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বাচ্চাগুলোকে মা-হারা করতে হলো না বলে। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছাড়ল। রুমাল দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। পিস্তলটা পকেটে ভরল না আর। এগোতেও সাহস করছে না। ধাড়িটাকে বিশ্বাস নেই। পায়ের শব্দ শুনলে কোনদিক থেকে বেরিয়ে আবার আক্রমণ করে বসে কে জানে। বলা যায় না, পরিবারের কাছে হিরো হওয়ার বাসনায় পুরুষটাও এসে হামলা চালাতে পারে। নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও আছে ওটা। বউ-বাচ্চা ফেলে বেশি দূরে যাওয়ার কথা নয়।

তবে হিরো হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল না বাবা-শূকর। এই দুপুর রোদের মধ্যে কাদাপানিতে গড়াগড়ি করে দিবানিদ্রা দেয়াটা বরং অনেক আরামের। এল না ওটা। কোন সাড়াশব্দও নেই।

আবার এগোতে লাগল কিশোর। পিস্তলটা হাতেই রাখল। কোনদিক দিয়ে শুয়োরটা বেরোয় কিনা দেখতে দেখতে চলল।

অবশেষে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে একটা পাথুরে অঞ্চলে বেরিয়ে এল সে। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর। সামনে বড় একটা শুকনো ডোবা। পলি পড়ে আছে। পেরোতে গিয়ে বুঝল, যেটাকে লবণ আর কাদার আস্তর মনে করেছিল, সেটা আসলে মাছের কঙ্কাল–ছোট ছোট মাছ মরে কঙ্কালগুলো কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমে গেছে। পায়ের চাপে মড়মড় করে ভাঙতে লাগল। ডোবাটায় পানি ছিল কিছুদিন আগেও, রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, আটকা পড়া মাছগুলো মারা গেছে তখন। তারমানে কোন কারণে বছরের কোন একটা সময়ে পানি বাড়ে সাগরের, মূল ভূমিতে ঢুকে পড়ে বন্যা সৃষ্টি করে তলিয়ে দেয় সবকিছু।

যতটা পথ এসেছে, তার মধ্যে এই অংশটা পেরোনো মোটামুটি সহজ হলো। যে কোন সময় সামনে ল্যাগুনটা চোখে পড়বে আশা করছে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে একটা উঁচু জায়গা পেরোতেই সামনে আবার দেখা গেল কাঁটাঝোপ। ভাগ্য ভাল, এখানেও শুয়োরের তৈরি করা রাস্তা পেয়ে গেল। পার হয়ে আসতে তেমন কষ্ট হলো না।

উঁচু ঘন ঝোপ পার হয়ে সবে বেরিয়ে এসেছে, সামনে পড়ল একজন মানুষ। শহরের সেই পোশাক নেই লোকটার পরনে, তবু নিগ্রোটাকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না ওর।

ফ্রিক সায়ানাইড!

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে-চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে হাসল ফ্রিক। বিষাক্ত হাসি। পকেট থেকে একটা ক্ষুর বের করে ধার করার জন্যে নাপিতের মত হাতের তালুতে ঘষতে ঘষতে,

এগিয়ে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।

আট

কিশোর যেদিকে গেছে, তার উল্টোদিকে এগোতে গিয়ে মুসা আর রবিনও প্রায় একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। এদিকটাতেও পাথর, লবণ, কাঁটাঝোপ, খাদ আর টিলাটক্কর। আকাশ থেকে দেখে যে জায়গাকে একেবারেই সমতল মনে হয়েছিল, সেটা যে এতটা প্রতিকূল, ভাবতে পারেনি। চলা হয়ে পড়ল অতিমাত্রায় ধীর। কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক। তারপর সামনে পড়ল একটা বালির পাহাড়, উপকূলের কিনারে ঝালরের মত, তাতে চড়ে চলাটা কিছুটা সহজ হলো। তারপরেও ভীষণ তপ্ত পা দেবে যাওয়া নরম বালিতে পা ফেলে চলতে বেশ অসুবিধে।

একপাশে খোলা নীল সাগর, খোলা আকাশ। সামনে গরান গাছের জঙ্গলটা কালো, নিরানন্দ। কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল আবার। শত্রুর চোখ এড়ানোর জন্যে সাবধান হতে হলো।

যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে চলে এসে পৌঁছল বনের কিনারে। বড় বড় গাছের ছায়ায় থামল মিনিটখানেক জিরিয়ে নিতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিশোরের মতই উদ্বিগ্ন হলো রবিন। অনেক সময় লেগে গেছে। মুসাকে জানাল, আসতেই লেগেছে তিন ঘণ্টা। ওমর যে সময় বেঁধে দিয়েছে ওই সময়ের মধ্যে ফিরে যেতে পারবে না। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, কিশোরেরও একই অবস্থা হয়েছে। সময়মত সে-ও ফিরতে পারবে না বিমানে।

আবার রওনা হলো দুজনে। কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল মুসা। পায়ের কাছে পড়ে গেঁথে গেল একটা খুদে বর্শা। ডার্টগান থেকে ছোঁড়া কাঠির মত দেখতে।

'খাইছে!' লাফ দিয়ে ওর হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। চোখের পলকে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে শুরু করল সে। 'জংলী নাকি! শুনেছি এক সময় এসব দ্বীপে মানুষখেকোদের ছড়াছড়ি ছিল!'

হেসে ফেলল রবিন। আশেপাশে হাত তুলে দেখাল ওরকম অসংখ্য বর্শা মাটিতে পড়ে আছে। 'ওগুলো বর্শা নয়। গাছের বীজ।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা।

'গরান গাছ জন্মায়ই পানিতে, বিশেষ করে যেখানে জোয়ার-ভাটা হয়। সাধারণ বীজের মত নিচে পড়লে পানিতে ভেসে যাবে, তাই ফল ফেটে কাঠির মত বীজগুলো তীব্র গতিতে ছুটে আসে। কাদায় গেঁথে যায়। জোয়ারের পানি ভাসিয়ে নিতে পারে না। আস্তে আস্তে শেকড় বেরোয়, মাটি আঁকড়ে ধরে, তখন তো আর নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

গরান বন একটা অতি বাজে জায়গা. কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই

ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল মুসার। আকাশ থেকে দেখে এতটা বড় লাগেনি বনটাকে। থকথকে কাদা। পা ফেললেই দেবে যায়। জোয়ারের পানি আটকে থাকে। হাঁটার সময় হুসুত হুসুত শব্দ তোলে পানি আর কাদা। শেকড়গুলো অক্টোপাসের বাহুর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আঠাল কাদায় ওদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, অথচ বড় বড় গোলাপী রঙের কাঁকড়া, কয়েক ধরনের গিরগিটি আর জলাভূমির অন্যান্য জীব দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়কর গতিতে পিছলে সরে যাচ্ছে কেউ কেউ।

চোরাকাদার ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটার কারণে দিক ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। একটু পর পরই কম্পাস দেখতে হচ্ছে। কাদার মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে দুজনেই বিরক্ত হয়ে গেছে, এই সময় শক্ত মাটির নাগাল পাওয়া গেল। মাটি এখানে ভেজা, পিচ্ছিল। তবে কাদার মত পা দেবে যায় না।

হঠাৎ জুতোর ছাপ চোখে পড়ল মুসার।

পায়ে চলা একটা পথের হদিসও বের করা গেল। সেটা ধরে কিছুদূর চলার পর পানি চোখে পড়ল। জঙ্গলের ভেতর থেকে লম্বা একটা উপখালের মত বেরিয়ে এসেছে, তাতে কালো পানি। খালটা ধরে কিছুটা ভেতরে ঢুকে যেতেই খাঁড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তাতে ভাসতে দেখা গেল একটা ইয়ট। গলুইয়ের কাছে বড় বড় অক্ষরে লেখা: ROGUE

গাছের ডালপালা এমনভাবে জড়াজড়ি করে আছে ওখানে যে, মাথার ওপর চাঁদোয়া তৈরি করে ফেলেছে। প্লেন থেকে দেখা যায়নি সেজন্যেই।

ডেকে বসে সিগারেট টানতে টানতে কথা বলছে তিনজন শ্বেতাঙ্গ। একজন ব্রন ডুগান। অন্য দুজনকে চিনতে পারল না দুই গোয়েন্দা। তবে কিশোরের কাছে চেহারার যা বর্ণনা শুনেছে তাতে অনুমান করতে পারল একজন নকল ডুগান, হোটেলের খাতায় যার নাম লেখা হয়েছিল রৎসি ব্রোমানভ। তৃতীয় লোকটার পরনে নাবিকের পোশাক, মাথায় ক্যাপ। চতুর্থ আরও একজন আছে, নিগ্রো। রেলিঙে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ঠিক নিচেই জাহাজের গায়ে গা ঠেকিয়ে একটা নৌকা বাঁধা।

রবিনের বাহুতে হাত রেখে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা।'

'দেখা তো হলো। তাড়াতাড়ি চলো এখন, গিয়ে খবরটা জানাই।'

'উঁহু, কাদার কি গন্ধ দেখেছ!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'যাব? কাছে গিয়ে শুনি না ব্যাটারা কি বলে? দু'চারটে কথা শুনলেই বোঝা যাবে ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

'নর্দমার চেয়ে খারাপ গন্ধ। বসে আছে কি করে ওরা!'

'কি বলো? যাব কাছে?'

'যদি দেখে ফেলে?'

'ঝুঁকি তো আছেই। কিন্তু না শুনলে বুঝবও না।'

'চলো।'

হাঁটতে শুরু করল মুসা। সরাসরি যেতে পারলে বড়জোর পঞ্চাশ গজ হতো, কিন্তু তাহলে পানি পেরিয়ে যেতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। পানিকে একপাশে রেখে গাছপালার ভেতর দিয়ে কাছে যেতে কমপক্ষে আধমাইল। রাস্তা ভাল হলে ওইটুকু কিছুই না। কিন্তু গরানের জলাভূমির মধ্যে এ এক বিরাট দূরত্ব। চলা ভীষণ ক্লান্তিকর। তবে কিছুদূর এগোনোর পর শক্ত মাটি পাওয়া গেল। পায়ে চলা পথ চলে গেছে ম্যান-অভ-ওঅর বে'র দিকে।

ইয়টের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় গাছের অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে একজন মানুষকে ওই রাস্তা ধরে তাড়াহুড়া করে আসতে দেখা গেল। সাবধান না থাকলে ধাক্কাই লেগে যেত লোকটার সঙ্গে। চট করে সরে গেল ওরা গাছের আড়ালে।

লোকটার গায়ের রঙ কালো, তবে নিগ্রো নয়। খোলা গা। নোংরা শার্টটা খুলে বাঁ বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছে। তাতে প্রচুর রক্ত লেগে আছে।

সামনে দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল লোকটা। মাটির দিকে নজর রেখে চলতে হচ্ছে। আহত বলে সতর্কতাও কিছুটা কম। কোনদিকে তেমন তাকাচ্ছে না। নইলে দেখে ফেলত ওদের।

'আমার মনে হয় এই লোকটাই ফ্রিক,' মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন।

পানির কিনারে গিয়ে ডাক দিল ফ্রিক। নড়ে উঠল রেলিঙে হেলান দিয়ে থাকা নিগ্রো লোকটা। বোটে নেমে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আহত ফ্রিককে তুলে নেয়ার জন্যে।

তিন শ্বেতাঙ্গও চেয়ার থেকে উঠে এল। ডেকে উঠতে সাহায্য করল ফ্রিককে।

হাতের কাপড় সরাল ফ্রিক। তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে শুরু করল কি করে জখমটা হয়েছে। ইংরেজিতেই বলছে, সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিন আর মুসার। বলল, পাখির কলোনির দিক থেকে আসছিল সে। হঠাৎ সামনে পড়ল তিন গোয়েন্দার এক গোয়েন্দা। কোঁকড়াচুলো ছেলেটা। গুলি করে জখম করেছে ওকে।

'কিশোর!' দম আটকে যাবে যেন মুসার।

'তুমি কি করলে?' ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

হাসল ফ্রিক। দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল যেন ক্ষুধার্ত হায়েনা। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ খেলে গেল রবিনের।

'আমাকে গুলি করে, এত্তবড় সাহস!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ফ্রিক।

ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল শ্বেতাঙ্গ নাবিক। জখমটা ধুয়ে বেঁধে দিতে লাগল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বকর বকর করেই চলেছে ফ্রিক। কড়া আঞ্চলিক টান আর অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে বেশির ভাগই বুঝতে পারছে না রবিন আর মুসা।

ফ্রিকের কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে ডুগান। সিগারেট টানছে নীরবে। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারপর আচমকা ছুঁড়ে দিল যেন প্রশ্নটা, 'ল্যাগুনটা পেয়েছ?'

'তা তো পেয়েছিই।'

'ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছ?'

'সেজন্যেই তো পাঠানো হয়েছিল আমাকে। নাকি?'

'ছবিগুলো কই?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল ফ্রিক। রবিন বুঝতে পারল, এগুলো হেসের তুলে আনা ছবির প্রিন্ট।

'কোনটা?' আবার জিজ্ঞেস করল ডুগান।

একটা ছবিতে টোকা দিল ফ্রিক, 'এটা।'

আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডুগান। তারপর ফিরল দুই শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর দিকে। 'ঠিকই আছে। যাবে নাকি?'

'আজ তো আর সময় নেই,' শ্বেতাঙ্গ নাবিক বলল। 'ব্যারোমিটার যে হারে নামছে, আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। এই অবস্থায় খোলা সাগরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এখানে থাকলে নিরাপদে থাকব।'

নকল ডুগান, অর্থাৎ ব্রোমারের দিকে ফিরল ডুগান। 'নিচে চলো।'

কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে এক এক করে নিচে নেমে গেল তিন শ্বেতাঙ্গ।

'এইবার ফেরা উচিত,' রবিন বলল। 'আর কিছু জানার নেই। ফ্রিকের কথাবার্তা আমার ভাল লাগল না। কিশোরকে কি করেছে ও?'

গাল চুলকাল মুসা, 'বুঝতে পারছি না! নিশ্চয় কিছু করেছে। নইলে গুলি করত না কিশোর।'

'ওমর ভাইকে জানানো দরকার। চলো। গিয়ে যদি দেখি কিশোর ফেরেনি, খুঁজতে বেরোতে হবে ওকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওপর দিকে তাকাল মুসা। গাছের মাথার জন্যে ভালমত চোখে পড়ল না আকাশটা। তবে কালো মেঘ যে ছড়িয়ে পড়ছে, বোঝা যায়। 'গরম কি দেখেছ! বাপরে! তারমানে সত্যি খুব খারাপ অবস্থা। ঝড় আসবে। চলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ওমরভাই খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।'

ফিরে চলল ওরা।

রাস্তায় উঠে আবার আকাশের দিকে তাকাল দুজনে। অনেক নিচে যেন ঝুলে রয়েছে কালো মেঘ।

ফ্রিক যে পথে এসেছিল, জঙ্গল থেকে বেরোল ওরা ওই পথ দিয়ে। কাদাপানি মাড়ানোর কষ্ট করল না অহেতুক। বনের বাইরে ঝোপঝাড় আর অন্যান্য বাধা তো রয়েছেই।

দিগন্তের কাছে নেমে গেছে সূর্য। গোল লাল একটা বল যেন। চারপাশে কালো মেঘ। বিচিত্র দৃশ্য।

নয়

সৈকতে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিল ওমর। ওদের দেখেই ছুটে এল। 'এত

সময় লাগালে?'

'মুসা জানতে চাইল, 'কিশোর ফিরেছে?'

'না।'

'আল্লাই জানে কি হলো!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ফ্রিক সায়ানাইডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে ওর।'

চমকে উঠল ওমর। 'তুমি জানলে কি করে?'

'ফ্রিক বলেছে ডুগানকে। আমাদের দেখেনি। হাতে একটা জখম। কিশোর নাকি গুলি করেছে।'

'সর্বনাশ! সহজে তো গুলি করার কথা নয় কিশোরের! আর কি বলল?'

যা যা শুনেছে, ওমরকে জানাল দুজনে।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। 'তোমরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে, ভুল করে ফেলেছি। এভাবে আলাদা হওয়াটা মোটেও উচিত হয়নি আমাদের।'

'কিশোরকে নিশ্চয় কিছু করেছে ও,' মুসা বলল। 'খুঁজতে যাওয়া দরকার।'

'কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না। সাগরের যা অবস্থা, ঝড় উঠলে পানি ফুলে উঠে খাঁড়িতেও ঢুকে পড়বে ঢেউ। প্লেনটাকে বাঁচানো যাবে না। ওটা নষ্ট হয়ে গিয়ে এখানে আটকা পড়লে সাংঘাতিক বিপদ হবে। আর কিশোর যদি জখম হয়ে থাকে, তাহলে তো পড়ব আরও বিপদে। কতটা জখম হয়েছে ও, জানি না। বেশি হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। প্লেন ছাড়া সেটা সম্ভব না।'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

পায়চারি শুরু করল ওমর। মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছে এগোতে থাকা জোয়ারের পানির দিকে। খাঁড়িতে পৌঁছুতে সময় লাগবে না।

'কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে ওর,' মুসা বলল। 'নইলে এতক্ষণে চলে আসত।'

'তা ঠিক,' দাঁড়িয়ে গেল ওমর, 'শুধু জখম করেছে? মেরে ফেলার কথা কিছু বলেনি তো?'

'বকর বকর করে কি যে বলল, কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। তবে নিজে গুলি খেয়েও কিছুই না করে ছেড়ে দিয়ে আসার বান্দা তো ওকে মনে হলো না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'দেখি আরও দশটা মিনিট।'

দশ...পনেরো...বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এল না কিশোর। বাতাসের বেগ দেখতে দেখতে অনেক বেড়ে গেল। কালো হয়ে গেছে আকাশ। আলোও কমতে শুরু করেছে। সাদা ফেনার মালাকে ঠেলে নিয়ে খাঁড়িতে ঢুকতে আরম্ভ করেছে ঢেউ। নোঙরে টান লেগে অস্থিরভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে বিমানটা।

'নাহ্, আর অপেক্ষা করা যায় না।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওমর, 'যত যাই ঘটুক, প্লেনটাকে নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পারব না। আমি থাকি। রবিনও থাক আমার সঙ্গে।' মুসার দিকে তাকাল, 'তুমি প্লেন নিয়ে জ্যামাইকায় চলে যাও। আবহাওয়া ভাল হলে ফিরে এসো–সেটা কাল, পরশু, যখনই হোক। এসে যদি দেখো, নামতে গেলে প্লেনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, নামবে না। ফিরে যাবে। পরে আবার আসবে। মোট কথা, কোনমতেই প্লেনটা নষ্ট করে এখানে আটকা পড়া চলবে না আমাদের।'

তর্ক করল না মুসা। বুঝতে পারছে, আর কিছু করার নেই। ইচ্ছে থাকলেও কিশোরকে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে এখানে থাকতে পারবে না সে। রবিনও প্লেন চালাতে পারে, তবে তার মত অতটা ভাল পারে না। এই খারাপ আবহাওয়ায় প্লেনটা বাঁচানোর দায়িত্ব এখন তাকেই নিতে হবে।

মাংসের টিন, বিস্কুট আর জ্যামের বয়ামগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেয়া হলো। ককপিটে উঠে বসল মুসা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল।

ওমর আর রবিন দেখল, ট্যাক্সিইং করে খোলা সাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমানটা। পাহাড়ের মত এক ঢেউ ছুটে আসছে ওটার দিকে। ওটা এসে আঘাত হানার আগেই যদি উড়াল দিতে পারে মুসা, ভাল, নইলে আর পারবে না। বাদামের খোসার মত বিমানটাকে উল্টে দেবে ওই পানির পাহাড়।

শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে দুজনে।

এসে পড়ল ঢেউ। ঠেলা মারল বিমানের নিচে। এক ঠেলাতেই কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল বিমানটা। আর নামল না। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত এক জায়গায় ঝুলে রইল যেন। তারপর দ্রুত উঠতে শুরু করল ওপরে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। 'ওফ্, বাঁচা গেল! আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, গেল বুঝি প্লেনটা।'

বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আচমকা বেড়ে গেল বেগ। মুহূর্তে পানির ফোঁটার একটা চাদরে পরিণত হলো যেন। বাতাসের ঝাপটায় ফোয়ারার মত ছিটকে এসে পড়তে লাগল ওদের চোখেমুখে।

টিনগুলো নিয়ে দৌড় দিল দুজনে। কতগুলো প্রবালের চাঙড়ের আড়ালে ছোট একটা ফোকরমত হয়ে আছে। আশ্রয় নেয়ার মত আর কোন জায়গা না দেখে ওটার দিকেই ছুটল ওরা।

'যা অবস্থা,' ভেতরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ওমর, 'খুঁজতে যেতেও পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

'যাওয়াটা ঠিকও হবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'জায়গার যা অবস্থা দেখে এসেছি! কাঁটাঝোপ, কাদা, পাথর··· অন্ধকারে কোনমতেই পেরোতে পারব না। সকালের জন্যে বসে থাকতে হবে আমাদের। তা ছাড়া এখন গেলে আরও একটা সমস্যা আছে। কিশোর যদি রওনা হয়েই থাকে, এখানে এসে আমাদের না পেলে চিন্তায় পড়ে যাবে। প্লেনটাও দেখবে না। কি করেছি, কোথায় গেছি বুঝতে পারবে না। আহত হয়ে থাকলে খুব মুষড়ে পড়বে।'

'তাই বলে চপচাপ বসে থাকতে পারব না। দরকার হলে তোমাকে

এখানে রেখে আমি একাই খুঁজতে বেরোব। আর কয়েক মিনিট দেখি।'

কিন্তু কয়েক মিনিটে ভয়াবহ রকম বেড়ে গেল বৃষ্টি আর বাতাসের বেগ। হাজার হাজার সাইরেনের শব্দ তুলে বইছে বাতাস। যেন কোন দানবের ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ চিৎকার। বৃষ্টি এত ঘন, কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

'নাহ্, বেরোতে আর পারলাম না!' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ওমর, 'বেরিয়ে কোন লাভও নেই এই অবস্থায়। দশ হাত দূর দিয়ে পার হয়ে গেলেও দেখতে পাব না ওকে। তোমার কথাই ঠিক। ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের।'

দশ

অতি জঘন্য একটা রাত কাটল ওমর আর রবিনের। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। ঝড়ের ভয়ঙ্করত্ব তো আছেই, সেই সঙ্গে কিশোরের দুশ্চিন্তা।

ভোরের দিকে ঝড় থামল। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। আলো ফোটার দেরি আছে। সাগর এখনও উত্তাল, তবে খাঁড়ির মধ্যে ঢেউ অনেক কমে গেছে।

সারারাত খাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে এল দুজনে। আকাশে এখনও তারা থাকলেও উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে ওদের শরীর। প্রবালের চাঙড় পুরোপুরি পানি ঠেকাতে পারেনি। কাপড়ও ভেজা। নিঙড়ে নিল। সূর্য এখন অতি প্রত্যাশিত।

ল্যাগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। পরিত্যক্ত সেই গ্রামটাতে পৌঁছল। ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন ঘরে রাত কাটিয়ে থাকতে পারে কিশোর। চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাক দিল কয়েকবার ওমর। সাড়া পেল না।

'জবাব দেয়ার সাধ্যই হয়তো নেই,' রবিন বলল। 'ফ্রিক ওকে জখম করে রেখে গেছে। বেহুঁশও হয়ে আছে।'

তারমানে ঘরগুলো খুঁজে দেখা দরকার।

খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা, যেটা আগের দিন কিশোরের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। একটা কুঁড়েকে মেরামত করে নেয়া হয়েছে, অন্যগুলোর মত বিধ্বস্ত নয়। এর একটাই মানে, লোক বাস করে এটাতে। দরজার বাইরে কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়ছে এক প্রৌঢ়া নিগ্রো মহিলা। বিশালদেহী, অ্যাথলেটদের মত স্বাস্থ্য। কাছেই একটা গাধা বেঁধে রেখেছে।

অবাক হলো ওমর। সারা গাঁয়ে মাত্র একজন মানুষ। তাও মহিলা।

দেখে খুশিই হলো। কিশোরকে দেখেছে কিনা, জিজ্ঞেস করার জন্যে এগোতে গেল। কিন্তু কড়াল ফেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। দড়াম

করে দরজা লাগিয়ে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল ওমর। জবাব দিল না মহিলা। তবে বোঝা গেল, লুকিয়ে ওদের দেখছে।

রবিনের দিকে তাকাল ওমর। 'এমন করল কেন?'

'ভঙ্গি দেখে তো মনে হলো চুরি করে ধরা পড়েছে। এই বিজন এলাকায় কোন্ অপরাধ করল সে?'

আরও কয়েকবার দরজা খোলার জন্যে অনুরোধ করে শেষে হাল ছেড়ে দিল ওমর। নাহ্, মহিলার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। আবার রওনা হলো, যেদিকে যাচ্ছিল।

কাঁটাঝোপগুলো সামনে পড়তে ওমর বলল, 'সাংঘাতিক জায়গা। অন্ধকারে কোনমতেই এর ভেতর দিয়ে চলা যাবে না।'

দুজনের একজনও ভোলেনি, কিশোরের না ফেরার ভিন্ন কারণও থাকতে পারে। ফ্রিক ওকে খুনই করে ফেলেছে হয়তো। তবে এই কুভাবনাটা মনে আনতে চাইল না কোনমতে। ধরেই নিল ঝড়ের জন্যে, কিংবা বড়জোর জখমের কারণে আটকা পড়েছে কিশোর।

কিছুদূর এগিয়েই মুখের কাছে হাত জড় করে চিৎকরে করে ওর নাম ধরে ডাকতে লাগল ওমর। জবাব এল না। ছড়ানো, খোলা সমভূমিতে শব্দের কোন প্রতিধ্বনিও হলো না।

ঝোপ-জঙ্গলের অন্যপাশে এসে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল দুজনের। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসতে দেখা গেল কিশোরকে।

ওদের দেখে হাত নাড়ল কিশোর। প্রায় ছুটে আসতে শুরু করল। সামান্যতম জখমও হয়েছে বলে মনে হলো না।

'এখানে পাঠিয়েই ভুলটা করেছি আমি,' কাছাকাছি হতেই ওমর বলল। 'ওফ্, জায়গা নাকি এটা! তুমি জখমও হওনি?'

'কেন, হওয়ার কথা নাকি?'

'ফ্রিকের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল তোমার?' জানার জন্যে তর সইছে না আর রবিনের।

'হয়েছিল। একটা ক্ষুর বের করে গলা কাটতে এসেছিল আমার। দিলাম গুলি মেরে। হাতে লাগল। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। আপাতত গেলেও আবার আসবে, জানা কথা। ঝড় না হলে এতক্ষণে কখন দলবল নিয়ে চলে আসত।'

'বাঁচালে, ভাই। সারাটা রাত যে কি দুশ্চিন্তায় কেটেছে!' ফ্রিকের ফেরা নিয়ে মাথাই ঘামাল না রবিন। 'তোমার কিছু করতে পারেনি তো?'

'না। একটা আঁচড়ও না। ফ্রিকের কথা তোমরা জানলে কি করে?'

'গরান গাছের জঙ্গলের মধ্যেই ইয়ট নিয়ে ঢুকে বসে আছে ডুগান।' সে আর মুসা গিয়ে কি কি দেখে এসেছে, জানাল রবিন।

মুসা কোথায় জানতে চাইল কিশোর। বিমান নিয়ে চলে গেছে শুনে ওমরকে বলল, 'পাঠিয়ে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। প্লেনটা নষ্ট হলে

মহাবিপদে পড়তাম। রাত কাটালেন কোথায়?'

কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল জানিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় কাটিয়েছ?'

মুচকি হাসল কিশোর, 'আপনাদের চেয়ে ভাল জায়গায়ই উঠেছিলাম আমি। ল্যাগুনের পাশে যে উঁচু জায়গাটাকে ঢিবি মনে করেছিলাম আমরা, ওটা আসলে একটা কুঁড়ে। ফিরে যেতে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো, এগোতে আর পারলাম না। বাধ্য হয়ে ঢুকে পড়লাম ওটাতে।'

'কুঁড়ে, না?' খসখসে গালে হাত বোলাল ওমর। খোঁচা খোঁচা হয়ে গেছে দাড়ি। 'কিছু আছে নাকি ভেতরে?'

'তেমন কিছু না। ঘরের মেঝেতে এক জায়গায় মাটি কিছুটা অন্য রকম মনে হলো। খোঁড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খালি হাতে পারলাম না। পকেট নাইফটাও অতিরিক্ত ছোট। শাবল-টাবল বা অন্য কিছু দরকার। আমার ধারণা, এখানে এলে ওই কুঁড়েটাতেই থাকত হেস।' তার কথার সপক্ষে পকেট থেকে একটা ক্যামেরার ফিল্মের বাক্স বের করে দেখাল কিশোর। ফিল্মটা খুলে নিয়ে বাক্সটা ফেলে দিয়েছিল হেস। প্রায় নতুন। ঘরের মধ্যে থাকাতে নষ্ট হয়নি।

বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে ওমর বলল, 'অন্য কেউও এসে থাকতে পারে, পাখির ছবি তোলার জন্যে। তবে মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক। হেসই এসেছিল। চলো তো দেখি, মাটির নিচে কি লুকিয়ে রেখেছে?'

'খুঁড়বেন কি দিয়ে?'

'ডালের মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে।'

কিন্তু ডাল বলতে কাঁটাঝোপের কাণ্ড। এই জিনিস দিয়ে কতখানি খোঁড়া যাবে সন্দেহ আছে। তার ওপর রয়েছে গা ভর্তি কাঁটা। কিশোরের ছোট ছুরি দিয়ে কাণ্ড কেটে, কাঁটা ছাড়িয়ে, মাথা চোখা করে নিতে লেগে গেল প্রায় এক ঘন্টা। তারপর সেই বিচিত্র মাটি খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে 'বীরদর্পে' রওনা হলো ওরা গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে।

কুঁড়ের কাছে নিরাপদেই পৌঁছল তিনজনে। কোন অঘটন ঘটল না।

কিশোরকে দরজায় পাহারা রেখে অন্য দুজন মাটি খুঁড়তে শুরু করল। কাজটা মোটেও সহজ নয়। তবে খুব ধীরে হলেও গর্তটা বড় হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ওমরের অস্ফুট চিৎকার শুনে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। একটা বোতাম পেয়েছে ওমর। জ্যাকেটের হাতার বোতাম।

গর্তটাকে আরও গভীর করতে লাগল ওরা। পরিশ্রমে ঘাম জমেছে কপালে। হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে রবিন, এই সময় একটা কঠিন জিনিসে খোঁচা লাগল ওমরের ডাল। নতুন উদ্যমে আবার খুঁড়তে লাগল দুজনে।

কিশোর বলল রবিনকে, 'তুমি এসে পাহারা দাও। জিরিয়ে নিতে পারবে। ততক্ষণ আমি খুঁড়ি।'

'লাগবে না,' গুপ্তধন প্রথম পাওয়ার উত্তেজনাটা যেন হারাতে চাইল না

কাঠের একটা অংশ দেখা গেল। পুরোটা বের করতে হলে আরও খোঁড়া দরকার।

'বাক্স নাকি!' চিৎকার করে উঠল উত্তেজিত রবিন।

'খুঁড়তে থাকো,' ওমর বলল।

বাক্সের ডালার মত চারকোনা তক্তাটা উন্মুক্ত হলো অবশেষে। একধারে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল ওমর। উঠে এল ওটা। নিচে একটা গর্ত। শূন্য।

পাহারা ভুলে গিয়ে কিশোরও এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে গর্তের কাছে।

কয়েকটা সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর গর্তটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভোঁতাস্বরে বিড়বিড় করল ওমর, 'নিয়ে গেছে!'

'এত কষ্ট খামোকাই করলাম!' নিরাশ হয়ে গর্তের কিনারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল রবিন।

'ছিল এখানে কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'সব মিলে যাচ্ছে—ল্যাগুন, চিহ্ন, পাখি, সব। এখানেই রেখেছিল হেস।'

'ডুগান নিয়ে গেছে?' রবিনের প্রশ্ন।

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল ওমর। তারপর বলল, 'মনে হয় ফ্রিকের কাজ। ডুগান ওকে পাঠিয়েছিল তুলে নিয়ে যেতে। তুলে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। যাতে আমাদের হাতে না পড়ে। লুকিয়ে রেখে ওর তরফ থেকে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে তুমি কেড়ে নিতে,' কিশোরের দিকে তাকাল সে।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। ফ্রিক ওটা পেয়ে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে নেয়ার জন্যে কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দিত ডুগান। তা ছাড়া ফ্রিকের সঙ্গে যা কথা হয়েছে ওদের, রবিনের কাছে শুনলাম, ফ্রিক ওকে একবারও বলেনি, জিনিসটা সে পেয়েছে।'

'মিথ্যে কথা বলতে পারে,' রবিন যুক্তি দেখাল। 'জিনিসটা যে দামী, একথা ফ্রিকও বুঝে গেছে। লুকিয়ে রেখে গেছে। পরে অন্য কারও কাছে বেশি দামে বিক্রির আশায়।'

'সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু মাটির অবস্থা দেখো,' গর্তের দিকে আঙুল তুলল কিশোর, 'গতকাল খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হয় না। তাহলে আরও বেশি আলগা থাকত। খোঁড়া হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তা ছাড়া ও খুঁড়ে থাকলে মাটি ভরাট করার দরকার মনে করত না আর। এমনিই ফেলে রেখে গিয়ে ডুগানকে বলত—খুঁড়েছি, পাইনি।'

'তা ঠিক,' হাত ওল্টাল রবিন। 'যুক্তিতে তো কোনদিনই তোমার সঙ্গে পারিনি। আজ কি আর পারব। কিন্তু ফ্রিক যদি না পেয়ে থাকে, কেউ তো একজন পেয়েছে। সে কে?'

দরজার বাইরে চোখ পড়তে বলে উঠল কিশোর, 'ওই যে, আসছে।

জিজ্ঞেস করা যাবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর, 'কে?'

'ফ্রিক আর ডুগানের দোসর।'

ওমর আর রবিনও দেখতে পেল। সাগরের দিক দিয়ে সৈকত ধরে আসছে ওরা।

'তারমানে সত্যি পায়নি ডুগান,' এতক্ষণে নিশ্চিত হলো ওমর।

'কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিছুই না।'

'কিছুই না!'

'না। কি করব? জিনিসটা পাইনি আমরা। আসুক ওরা। দেখুক, পাইনি যে।'

এগিয়ে এসেছে ব্রোমানভ আর ফ্রিক। পেছনে ডুগানকেও দেখা যাচ্ছে এখন।

দরজার কাছ থেকে সরে রইল দুই গোয়েন্দা আর ওমর। বাইরে থেকে ওদের দেখতে পেলে সাবধান হয়ে যাবে ডুগানরা। হামলা করে বসতে পারে।

কুঁড়ের কাছে চলে এল ওরা। ডুগানের কথা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, এটাই হবে। কুঁড়ের কথা বলেছিল আমাকে হেস। ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পাখির ল্যাগুনের ধার ঘেঁষেই রয়েছে কুঁড়েটা। আশেপাশে আর কোন কুঁড়েও নেই। সুতরাং...'

'আপনার কথা ঠিক হলেই ভাল,' নিঃসন্দেহে ব্রোমারের কণ্ঠ। খসখসে। কথায় ইয়োরোপিয়ান টান। 'এই ফ্রিক, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঢোকো!'

পায়ের শব্দ এগিয়ে এল।

দরজার কাছে চলে গেল ওমর। ডুগানের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে স্বাগত জানাল, 'গুড মর্নিং।'

পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল ডুগান। পেছনে ফ্রিক আর ব্রোমানভ। স্তব্ধ নীরবতা।

ওমরই কথা বলল আবার, 'এতটা পথ কষ্ট করে খামোকা এলেন, জেনারেল। কিছুই পাবেন না।'

সামলে নিল ডুগান। চোখের পাতা সরু করে ওমরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছুই পাব না মানে?'

হাসিমুখে জবাব দিল ওমর, 'জিনিসটা নেই এখানে।'

'কোন জিনিস?'

'ভণিতা করে লাভ নেই। কোন্ জিনিসের জন্যে এসেছেন আপনারা, আমরা জানি। হেসের চুরি করে আনা গোপন ফর্মুলা।'

'ও মিথ্যে কথা বলছে!' চিৎকার করে উঠল ব্রোমানভ। 'ঠিকই পেয়ে গেছে, আমাদের বলছে না!'

'মিথ্যুকরা সব সময় অন্যদেরও মিথ্যুক ভাবে,' মসৃণ কণ্ঠে জবাব দিল ওমর।

ফ্রিকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ব্রোমানভ, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন হাবার মত! কিছু একটা করো!'

পা বাড়াতে গেল ফ্রিক। দ্বিধা করছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল ওমর। হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। 'কাল খেয়েছিলে হাতে, আজ খাবে পেটে। এক ইঞ্চি এগোবে না আর।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ডুগান। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল গর্তটা। ওমরের দিকে তাকাল, 'সত্যি কিছু পাওয়া যায়নি?'

'পেয়েছি। একটা সাধারণ বোতাম আর একটা পুরানো তক্তা। নিতে চাইলে নিতে পারেন।'

ওমরের কথা বিশ্বাস করল ডুগান। মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল।

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্রোমারের মুখ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ধমকে উঠল ওমরের দিকে তাকিয়ে, 'কোথায় সরিয়েছ, জলদি বলো!'

ডুগানের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'একটা কথা প্রায়ই ভাবি আমি, জেনারেল। আমার মাথায় ঢোকে না, সেনাবাহিনীর এতবড় পদে চাকরি করে, একজন ভদ্রলোক হয়ে চোর-ছ্যাঁচড় আর এসব ছুঁচোদের সঙ্গে আপনার খাতির হয় কি করে?'

পলকের জন্যে জেনারেলের মুখে লজ্জার ছায়া দেখতে পেল বলে মনে হলো কিশোরের। ভালমত দেখা হলো না, তার আগেই ব্রোমারের গর্জনে তার দিকে নজর ফেরাতে হলো।

ক্ষিপ্ত হয়ে মুঠো পাকিয়ে চিৎকার করছে ব্রোমানভ, 'অনেক সহ্য করেছি, আর না! ভাল চাও তো জিনিসটা দাও, নইলে...'

'নইলে কি করবেন?' হাসি হাসি ভঙ্গিটা উধাও হয়ে গেছে ওমরের মুখ থেকে। 'ভদ্রতা অনেক করেছি। ভাল চান তো বিদেয় হন এখান থেকে।' ভয়ানক ভঙ্গিতে পিস্তল নাচাল।

কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন ব্রোমানভ। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। টাকা খেয়েও ওর কাজ করছে না বলে ধমকাতে লাগল ফ্রিককে। ভীতু, কাপুরুষ বলে গাল দিল। কোন কিছুতেই কাজ হলো না দেখে ওমরের দিকে তাকাল আবার, 'তোমাকে...তোমাকে আমি দেখে নেব! আবার দেখা হবে আমাদের!'

'হ্যাঁ, হলেই ভাল। এখনকার অসমাপ্ত কাজটা আমি শেষ করব তখন। আপনার ওই কুৎসিত চেহারাটা বদলে দেয়ার ব্যবস্থা করব, যাতে অতি কাছের লোকেরও চিনতে না পারে,' পিস্তল তুলে ব্রোমানভের দিকে লক্ষ্যস্থির করল ওমর। 'যান এখন। আপনার উপস্থিতিটাও বিরক্তিকর লাগছে।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্রোমানভ। গটমট করে হাঁটতে শুরু করল। পেছন পেছন চলল তার দুই সঙ্গী। শ'খানেক গজ গিয়ে ঘুরল সে। হাত নেড়ে, মুখভঙ্গি করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ঝগড়া শুরু করছে ডুগানের সঙ্গে।

'ব্রোমানভ সহজে ছাড়বে না আমাদের,' ওমর বলল। 'এই অভিযানের

খরচ নিশ্চয় সে-ই দিচ্ছে। ফর্মুলাটা কিনতে চেয়েছে। সেজন্যেই অত রাগ।'

'তাই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু আমি ভাবছি, দলিলটা কে নিয়ে গেল?'

'তাকেই এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কে নিয়েছে অনুমান করতে পারছি,' কারও দিকে না তাকিয়ে বলল কিশোর।

'কে!' একসঙ্গে ওর দিকে গলা বাড়িয়ে দিল ওমর আর রবিন।

'এক নিগ্রো মহিলা। কাল দেখেছি। ডিম চুরি করতে এসেছিল।'

'সঙ্গে একটা গাধা ছিল?' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না রবিন।

ওর দিকে ঘুরল কিশোর, 'তুমি জানলে কি করে?'

'আসার সময় দেখে এসেছি।'

'জলদি চলো! ডুগানরা কোনভাবে আঁচ করে ফেলে কেড়ে নেয়ার আগেই ওটা আদায় করতে হবে আমাদের।' প্রায় লাফ দিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল ওমর।

এগারো

মহিলার বাড়ি পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল ওদের। উপকূলের ঘুরপথ কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে শর্টকাটে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

আঙিনাতেই আছে মহিলা। কুড়ালটা দিয়ে কিসে যেন কোপ মারছে। তবে লাকড়ি নয়। ধাতব শব্দ হলো। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে, 'শয়তান বাক্স। তোর একদিন কি আমার একদিন। ভেঙেই ছাড়ব আজ।'

এবারও ওদের দেখামাত্র ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে পথ আটকাল ওমর, 'প্লীজ, যাবেন না। আমরা আপনার শত্রু নই।'

শত্রু যে নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে বাড়িয়ে ধরল ওমর।

মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব চলে গেল মহিলার। হাসিমুখে হাত বাড়ালে। একটু দূরে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে গাধাটা।

কিশোর গিয়ে নিচু হয়ে ধাতব বাক্সটা তুলে নিল। ওটাকেই কোপাচ্ছিল মহিলা। তেড়াবেঁকা বানিয়ে ফেলেছে। ডালার ওপর বেশ কয়েকটা কাটা। একটা কাটা বেশ বড়।

'কি করছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'খোলার চেষ্টা করছিলাম,' আয়েশ করে সিগারেটে টান দিল মহিলা।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাক্সটা দেখতে লাগল কিশোর। তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। স্টেনলেস স্টীলের বেশ ভারী বাক্স। বড় বড় দুটো তালা লাগানো।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'চাবি নেই?'

'হারিয়ে ফেলেছি।'
'চাবি পানইনি, তাই না?'
চুপ করে রইল মহিলা।
'বাক্সটা কোথায় পেলেন?'
'সৈকতে। ঢেউয়ে ভেসে এসেছিল।'
'নাম কি আপনার?' জানতে চাইল ওমর।
'প্যাটি মেহার।'
'মিথ্যে বলে লাভ নেই, প্যাটি, সব জানি আমরা। সত্যি করে বলুন এখন, কোথায় পেয়েছেন বাক্সটা?'
প্যাটির মাথাটা ঝুলে পড়ল। খুব সাদাসিধা মহিলা। মায়াই লাগল ওমরের। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'বলুন?'
'পেয়েছি।'
'পেয়েছেন, সে তো জানিই। কোথায় পেয়েছেন? আপনি কি চান, আমি গিয়ে আপনার ডিম চুরির কথা রিপোর্ট করি?'
'না না!' আঁতকে উঠল মহিলা।
'বললে আপনার কি অবস্থা হবে জানেন?'
'জানি!'
'আমি বলি, কোথায় পেয়েছেন, ফ্ল্যামিঙ্গো ল্যাগুনের পাশের কুঁড়েতে। মাটি খুঁড়ে বের করেছেন।'
এত আস্তে বলল প্যাটি, প্রায় শোনাই যায় না, 'হ্যাঁ, স্যার!'
'ঠিক আছে, প্যাটি, রিপোর্ট করব না। তবে এই বাক্সটা আপনি পাবেন না। এটা সরকারি জিনিস। খুঁজে বের করে আনার জন্যে পুরস্কার যাতে পান, সেই ব্যবস্থা করতে পারি।'
মাথাটা সোজা হলো আবার। উজ্জ্বল হলো প্যাটির মুখ।
'কদ্দিন আগে পেয়েছেন?' জানতে চাইল ওমর।
'সাত দিন।'
'এতদিন খোলার চেষ্টা করেননি?'
'না, স্যার।'
'তাহলে আজকেই কেন?'
সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল প্যাটি, 'এত লোকজন দেখে...ভাবলাম...'
হাসল ওমর, 'কেড়ে নিয়ে যাবে? কি আছে এর মধ্যে?'
'গুপ্তধন, স্যার। এখানকার অনেক দ্বীপেই গুপ্তধন পাওয়ার কথা শোনা যায়। জলদস্যুরা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।'
বাক্সটা ঝাঁকি দিল কিশোর। শব্দ শুনে ভেতরে কাগজ ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। কাটা জায়গাটা দিয়ে দেখেও কাগজই আছে মনে হলো। ভারী বলে হাতে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে। মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কুঁড়েতে ছিল এটা, জানলেন কি করে? সত্যি কথা বলুন। কোন ভয় নেই আপনার।'

ভয় আর দ্বিধা মিশ্রিত, কখনও বা কান্নাজড়ানো স্বরে প্যাটি শোনাল তার দুঃখের কাহিনী। অতি সামান্য বেতনে ফ্ল্যামিঙ্গো পাহারা দেয়ার চাকরিটা তার স্বামীকে দিয়েছিল সরকার। চাকরি পেয়ে ল্যাগুনের ধারেও একটা কুঁড়ে বানিয়েছিল সে। সেটা বহুকাল আগের কথা। কত বছর, সঠিক বলতে পারবে না সে। গাঁয়ের আর সব মানুষের মত মহামারীতে তার স্বামীও মারা গেল। বেঁচে রইল একমাত্র প্যাটি। বেতন পাঠানো বন্ধ করে দিল সরকার। বিধবা হয়ে না খেয়ে মরার দশা হলো প্যাটির। আর কোন উপায় না দেখে ডিম চুরি শুরু করল সে। নিজেও খায়। খেতে ভাল। কিছু কিছু ম্যাথু টাউনেও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে আনে। কোনমতে অতি কষ্টে সংসার চালায়। শুরুতে ভয় ভয় লাগলেও ডিম বিক্রিটাকে এখন আর অপরাধ মনে করে না সে। বরং ভাবে, পাখিগুলোকে সাহায্য করছে। ম্যাথু টাউনে ডিম নিয়ে না গেলে ওখানকার বাসিন্দারা এসে কবে ডিম খেয়ে, পাখিগুলোকে মেরেধরে কলোনিটাই সাফ করে দিয়ে যেত। সে ওদের মিথ্যে কথা বলেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর চাকরিটা ওকেই দিয়েছে সরকার।

মহিলার যুক্তিটা খণ্ডন করতে পারল না ওমর। ঠিকই বলেছে। প্যাটি না থাকলে কে দেখে রাখত পাখিগুলোকে? ওগুলোকে পাহারা দেয়ার বিনিময়ে কয়েকটা ডিম যদি সে নিয়েই থাকে, দোষটা কোথায়? অন্যায়টা বরং সরকার করেছে, হঠাৎ করে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে। ওদের কর্মচারী মরে যাওয়ার পর তার বিধবা স্ত্রীকে পেনশন দেয়া অন্তত উচিত ছিল।

যাই হোক, তার কাহিনী বলে গেল প্যাটি। কিছুদিন আগে, একজন অপরিচিত লোককে দেখল সাগরের দিক থেকে আসছে। হাতে একটা বাক্স। প্যাটি ভাবল, ইনস্পেক্টর। কিন্তু লোকটার হাবভাবে সন্দেহ হলো তার। পাখি মারতে আসেনি তো? লুকিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল লোকটা কি করে। কুঁড়েতে ঢুকল লোকটা। খানিক পর বেরিয়ে চলে গেল। হাতে বাক্সটা নেই। লোকটা চলে যাওয়ার পরও কুঁড়েতে ঢুকল না প্যাটি। সে চোর নয়। কেউ যদি কোন কারণে একটা জিনিস ঘরে লুকিয়ে রেখেই যায়, সেটাতে কি আছে চুরি করে দেখতে যাওয়াও ঠিক নয়।

সময় যেতে লাগল। একদিনের জন্যেও আর এল না লোকটা। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গত সপ্তাহে বাক্সটা তুলে নিয়ে আসে প্যাটি। চাবি পায়নি। তালাও খুলতে পারেনি। শেষে কুড়াল দিয়ে কেটে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ধারণা, অন্য কোনখান থেকে ওই লোকটা গুপ্তধন উদ্ধার করে এখানে এনে লুকিয়ে গেছে। কয়েকজনে মিলে উদ্ধার করার পর একে অন্যকে ঠকানোর জন্যে পাগল হয়ে ওঠে লোকে। বহুকাল থেকেই চলে আসছে এরকম। তাতে অবাক হয়নি প্যাটি।

'এখন জানল, বাক্সটা সরকারের। চুরি করে অন্যায় করেছে। যদি সদাশয় সরকার সেটা বুঝে তাকে মাপ করে দেন, তাকে বাড়িছাড়া না করেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবে সে। হাজার হোক, সরকারের পাখিগুলোকে তো পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। নাকি রাখেনি?'

'রেখেছেন,' স্বীকার করল ওমর। 'ঠিক আছে, বাক্সটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি থাকুন আপনার বাড়িতে। তবে সাবধান, আর কখনও ডিম চুরি করবেন না। সরকারের লোককে বলে আপনার স্বামীর চাকরিটা আপনাকে দেয়ানোর ব্যবস্থা করব, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আর যতদিন না বেতন পাচ্ছেন, চলার জন্যে এই টাকাটা রাখুন।'

মানিব্যাগ খুলে কয়েকটা নোট গুনে নিয়ে মহিলার হাতে দিল সে।

কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল প্যাটির। বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে কোনদিন এরকম নরম ব্যবহার আর পায়নি সে।

প্যাটিকে চিন্তা করতে মানা করে, গুড-বাই জানিয়ে, বাক্সটা নিয়ে রওনা হলো ওমর আর দুই গোয়েন্দা।

কিশোরের হাতে বাক্সটা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পেয়ে তাহলে গেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'এটাতেই আছে, তাই না?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ।'

'খুলতে পারলে শিওর হওয়া যেত,' ওমর বলল। 'বলা যায় না, ধোঁকা দেয়ার জন্যে সাধারণ কাগজও ভরে রাখতে পারে হেস। না জেনেও একটা কথা ঠিকই অনুমান করেছে প্যাটি, এতদিন অন্য কোথাও লুকানো ছিল বাক্সটা। সেখান থেকে তুলে এনে এখানে রেখে গেছে হেস। কিংবা আসল বাক্সটা আগের জায়গাতেই আছে, নকল একটা বাক্স রেখে গেছে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।'

'কাকে?' প্রশ্ন করল রবিন।

জবাব দিতে পারল না ওমর।

'খুললেই বোঝা যাবে আসল না নকল। কিন্তু খুলব কি দিয়ে এটা?' চিন্তা করছে কিশোর। 'কুড়াল দিয়ে কুপিয়েও তো…'

হালকা বাতাসে ভর করে ভেসে এল এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন। ওপর দিকে মুখ তুলল ওমর। 'মুসা! একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে।'

নিচু দিয়ে উড়ছে বিমানটা। উড়ে গেল খাঁড়ির দিকে।

গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।

আধমাইল দূরে রয়েছে তখনও, এই সময় খাঁড়ির দিক থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।

'ডুগানরা দেখে ফেলেছে!' ছুটতে শুরু করল ওমর। বাক্সটা নিয়ে কিশোরের দৌড়াতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বলল, 'তুমি ওটা নিয়ে এখানেই থাকো। বাক্সটা পাহারা দাও। আমরা গিয়ে প্লেনটা বাঁচানোর চেষ্টা করি।'

রবিনকে নিয়ে চলে গেল ওমর।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। পরিস্থিতির এই হঠাৎ পরিবর্তন আশা করেনি। বাক্সটার দিকে তাকাল। ডুগানরা কোন কারণে এদিকে এলে দেখে ফেলবে ওকে। সোজা এসে বাক্সটা কেড়ে নেবে। সবার বিরুদ্ধে সে একা কিছু করতে পারবে না। লুকিয়ে ফেলতে হবে কোথাও। চারপাশে তাকাতে শুরু করল।

কোথায় লুকাবে? কোনখানে?

কোন জায়গা চোখে পড়ল না। বাক্সটা বয়ে নিয়ে এল কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট একটা গর্তের কাছে। তাতে বাক্স রেখে তার ওপর ঘাস, ঝোপের শুকনো ডাল, মরা পাতা আর মাটির ঢেলা দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। পুরোপুরি ঢাকতে পারল না। তবে যে রকম করে রেখেছে, কারও জানা না থাকলে সহজে দেখতে পাবে না।

কান খাড়া রেখেছে খাঁড়ির দিকে, শব্দ শোনার জন্যে। যা শুনেছে, তাতে উত্তেজনা বেড়েছে তার। আরও গুলির শব্দ। তারপর আবার চালু হলো বিমানের এঞ্জিন। উড়ে পালানোর চেষ্টা করছে ওটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে সে। কমে এল এঞ্জিনের গুঞ্জন। তারপর বেড়ে গেল আবার। যেন ফিরে আসছে বিমানটা। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। একবারের জন্যেও চোখে পড়ল না বিমানটাকে। কি ঘটছে? কি করছে মুসা?

বহুক্ষণ কান পেতে থেকেও আর কোন শব্দ কানে এল না। নীরব হয়ে গেছে সবকিছু।

গর্তের কিনারে বসে পড়ল সে। খাঁড়িতে কি ঘটছে বোঝার উপায় নেই। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ওমররা ফিরল না। কি করছে ওরা?

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। শেষে বাক্সটা তুলে আনল আবার গর্ত থেকে। ভেতরে কি আছে দেখা দরকার।

ছুরি ঢুকিয়ে কাটা জায়গাটা বড় করার চেষ্টা করল। দুই মাথা লম্বা করতে পারল না, তবে পেটের কাছটা ফাঁক হলো আরও। ভেতরে কাগজই আছে। ছুরির মাথা দিয়ে নাগাল পেল না ওটার। একটা সরু ডাল কেটে নিল। মাথার কাছে বাঁকা হয়ে আছে কাঁটা। ওটা ঢুকিয়ে কাগজটাকে ধরার চেষ্টা চালাল। কয়েকবারের চেষ্টায় আটকাতে পারল একটা কোনায়। টেনে বের করে আনতে লাগল। সামান্য বেরিয়ে আটকে গেল কাগজটা। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে টানতে শুরু করল। জোরে টান দিলেও বিপদ। বাক্সের কাটা জায়গাটার দুটো পাশই ধার হয়ে আছে। কাগজ কেটে দেয়।

বেশি টানাটানি করতে গিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার ঝুঁকি নিল না সে। যেটুকু বের করেছে তাতে কি আছে দেখল। মোটা কাগজ। একপাশে সাদা, অন্যপাশে নীল। নীল অংশে সাদা পেন্সিল দিয়ে রেখা টানা। ড্রইং। কিনারে লেখা অক্ষরগুলো জার্মান ভাষায়। আসল জিনিসটাই পেয়েছে। সন্দেহ নেই। কাগজের কোণাটা ঠেলে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল ওমরদের ফেরার অপেক্ষায়।

ক্যাকটাসের ছায়ায় বসেছে। গড়িয়ে কাটছে সময়। আরও আধঘণ্টা পেরোল। বাতাস বন্ধ। আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। নীল গায়ে হলুদ ডোরাকাটা একটা গিরগিটি গর্ত থেকে বেরিয়ে অসাবধানী একটা মাছির দিকে তাকিয়ে জিভ চাটছে। লাল-সবুজে মেশানো একটা হামিং বার্ড বড় মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলে ক্যাকটাস ফুলের মধু খাচ্ছে। কিন্তু আপাতত নেচারাল হিস্টরি নিয়ে মাথা

ঘামানোর মত মানসিকতা নেই কিশোরের।

মট করে ছোট একটা ডাল ভাঙল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওমররা ফিরেছে। ঘুরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। সৈকতের দিক থেকে একজন মানুষ আসছে, তবে ওমর নয়, ফ্রিক সায়ানাইড। নিশ্চয় ওদেরকে খুঁজতেই এসেছে। তারমানে ওমর আর রবিনকে যেতে দেখেনি। যাই হোক, কোনমতেই লোকটার চোখে পড়া চলবে না।

আস্তে করে গর্তে নেমে পড়ল কিশোর। মাথা নুইয়ে ফেলল। কিন্তু পুরো লুকাতে পারল না শরীরটা।

কি কারণে কে জানে ফিরে তাকাল ফ্রিক, দেখে ফেলল ওকে। চোখের পলকে ঘুরে গেল সে। একদৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে। পরক্ষণে গর্জে উঠল পিস্তল। কিশোরের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেট।

ঝোপটা সই করে গুলি করল কিশোর। এভাবে আন্দাজে গুলি চালিয়ে লাভ নেই, লাগাতে পারবে না। তবু জবাব না দিলে সাহস বেড়ে যাবে ফ্রিকের। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো কিশোরের। আরেকটা গুলি এসে বিঁধল ক্যাকটাস গাছে। মাথার ওপর থেকে রসাল, মোটা ক্যাকটাস পাতা ঝরাল।

অনুমানে আর গুলি চালানোর ইচ্ছে নেই কিশোরের। ঝোপের দিকে তাকিয়ে লোকটাকে দেখার অপেক্ষায় রইল। খুব কাছেই আরেকটা ঝোপ নড়ে উঠল সামান্য। আগেরটার কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে চলে এসেছে ফ্রিক। যেখানে নড়েছে, ঠিক সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কিশোর।

কিছুই ঘটল না। গর্জে উঠল না পিস্তল। গুলি বেরোল না।

আরও জোরে ট্রিগারে টান দিল সে। কোনই লাভ হলো না। মুহূর্তে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল ওর। অবশ হয়ে এল হাত। জ্যাম হয়ে গেছে পিস্তলের মেকানিজম।

দ্রুতহাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোনমতেই খুলতে পারল না ম্যাগাজিন। কার্ট্রিজ যেখানে ছিল, সেখানেই আটকে বসে রইল। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। মোছার পরও সামান্য তেল লেগে ছিল। তাতে বালি লেগে জ্যাম করে দিয়েছে।

টাশ্‌শ্‌ করে শব্দ হলো আবার। ছুটে এল গুলি। এবারেও জবাব দিতে না পারলে ফ্রিক বুঝে যাবে কিশোরের পিস্তলে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। কিংবা গুলি ফুরিয়ে গেছে। পিস্তল যে জ্যাম হয়ে গেছে, কোনমতে সেটা টের পেয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে আসবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ওর মারাত্মক ক্ষুরটার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

ঝোপের নড়া দেখে বোঝা গেল আরও এগিয়ে এসেছে ফ্রিক। কিশোরকে ভালমত নিশানায় পেতে চাইছে।

ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর, 'খবরদার, ফ্রিক, আর এক পা এগোলেই গুলি করব!'

কিন্তু ততক্ষণে ওর দুর্বলতা টের পেয়ে গেছে ফ্রিক। ঝোপ থেকে বেরিয়ে

ছুটে আসতে লাগল।

আর কোন উপায় না দেখে কিশোরও উঠে দাঁড়াল। পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল ফ্রিকের মুখ সই করে। সরতে গিয়ে শেকড়ে পা বেধে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পাথরে মাথা ঠুকে গেল। জ্ঞান হারানোর আগে একটা গুলির শব্দ কানে এল। ভারী একটা দেহের চাপ অনুভব করল শরীরের ওপর। তারপর সব অন্ধকার।

বারো

কিশোরকে রেখে বিমানের শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওমর আর রবিন। খাঁড়ির দিকে ছুটছে। দেখতে পেল ডুগান, ব্রোমানভ আর ফ্রিক দৌড়ে ঢুকে যাচ্ছে গরান গাছের জঙ্গলে। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে ফিরে তাকাল ব্রোমানভ। ওদের দুজনকে দেখে পিস্তল তুলে গুলি করল কয়েকবার। কিন্তু দূর অনেক বেশি। ধারেকাছেও পৌঁছল না গুলি।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ওমর। তার লক্ষ বিমানটার দিকেই বেশি। নেমেছিল, বোঝা যায়। তারপর আবার উঠে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে।

কি ঘটেছিল, অনুমান করতে কষ্ট হলো না। উপসাগর দিয়ে ইয়টে ফিরছিল ডুগানরা। খাঁড়ির কাছে পৌঁছতেই বিমানটাও এসে হাজির হলো। বুঝে ফেলল ওরা, কাদের বিমান। ঘাপটি মেরে রইল। যেই মুসা নামল, গুলি শুরু করল। উপায় না দেখে আবার উড়তে বাধ্য হলো মুসা।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেলল ওমর। চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে রইল বিমানটার দিকে। এমন করছে কেন? অদ্ভুত আচরণ। আহত প্রাণীর মত অস্থির। একবার নামছে, একবার ওপরে উঠছে, কাত হচ্ছে, সোজা হচ্ছে। ঠিকমত কন্ট্রোল করতে পারছে না নাকি মুসা?

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বুঝে ফেলল কারণটা ওমর। জখম হয়েছে মুসা। গুলি লেগেছে। অন্য কোন কারণই নেই আর।

লম্বা চক্কর দিয়ে খোলা সাগরের দিক থেকে তীরের দিকে নাক ঘোরাল বিমান।

'ফিরে আসছে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবিনের মুখ। বিমানের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ধরতে পারেনি সে।

জবাব না দিয়ে উঁচু জায়গার দিকে দৌড় দিল ওমর। বালির একটা উঁচু টিবি। এখান থেকে আকাশ তো বটেই, দুদিকে ছড়িয়ে থাকা উপকূলটাও পুরোপুরি চোখে পড়ে।

রবিনও এসে দাঁড়াল ওমরের পাশে, 'ও নামছে।'

এঞ্জিনের গুঞ্জন কমে যাচ্ছে। নাক নিচু করে ফেলেছে অটার। আবার দীর্ঘ একটা চক্কর দিয়ে উড়ে চলল দুই মাইল দূরের সৈকতের দিকে।

'সৈকতে নামবে নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি! ল্যাগুনেও নামতে পারে।' এতক্ষণে কথা বলল চিন্তিত ওমর।

'দেখো, প্লেনটাকে যেভাবে চালাচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না। এসো।'

বলে দৌড়ে টিবি থেকে নেমে বিমানের পেছনে দৌড় দিল সে। তার পেছনে রবিন।

প্রথমে সৈকতের বালিতে ঢাকা এক চিলতে জমিতে নামার চেষ্টা করল মুসা। চাকা খুলে গেছে, দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও। জায়গাটা ল্যাগুন থেকে দূরে নয়।

'ল্যাগুনে পানি যেখানে বেশি, সেখানে নামলে ভাল করত,' ছুটতে ছুটতে বলল ওমর। 'জানেই না বোধহয়। নাকি ঝুঁকি নিল না কে জানে।'

জানালা দিয়ে মুসার মাথা না দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'মুসা কোথায়?'

'ব্যাপারটা আমারও ভাল লাগছে না। ওর কিছু হয়েছে, একদম শিওর। নইলে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে আসত এতক্ষণে।'

তাড়াতাড়ি বিমানটার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু পা দেবে যাওয়া নরম বালি, ধারাল প্রবাল, তিন ইঞ্চি লম্বা ক্যাকটাসের কাঁটা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল ওদের। আপ্রাণ চেষ্টা করেও এক ঘণ্টার আগে কোনমতেই পৌঁছুতে পারল না।

সৈকতের পাশে সামান্য দূর দিয়ে চলে গেছে প্রবাল প্রাচীর। খারাপ আবহাওয়ায় ফুঁসে ওঠে ভেতরের পানি, কিন্তু অন্য সময় থাকে শান্ত, স্থির। এখন আবহাওয়া ভাল, পরিষ্কার পানিকে লাগছে মসৃণ নীল কাঁচের মত। সৈকতের ডানপাশে বালির একটা উঁচু টিবি আড়াল করে রেখেছে ল্যাগুনটাকে।

ককপিটে পাওয়া গেল মুসাকে। মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই বুঝে গেল ওমর, ওর সন্দেহ ঠিক।

ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে ওদের স্বাগত জানাল মুসা।

'গুলিটা কোথায় লেগেছে?' কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জানতে চাইল ওমর।

'উরুতে। অত খারাপ নয়। আমার ভয় লাগছে, পেট্রোল ট্যাংক ফুটো করে দিয়েছে বোধহয় ওরা। তেলের [illegible]নটাও ফুটো হয়ে থাকতে পারে। তেল বেরোনোর গন্ধ পাচ্ছি।'

ফার্স্ট এইড কিট বের করে আনল ওমর। 'চুপ করে বসে থাকো, আগে তোমার ফুটোটার একটা ব্যবস্থা করি। তারপর অন্য ফুটো মেরামত করব।...রবিন, আবার দৌড়াতে হবে তোমাকে। কিশোরকে গিয়ে নিয়ে এসো, বাক্সটা সহ। তোমরা এলেই রওনা হব।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার, 'খাইছে! ফর্মূলাটা পেয়েছেন নাকি?'

'মনে হয়।'

'দারুণ। যাক আমাদের মিশন সফল...'

'চুপ করে থাকো। বেশি কথা বললে দুর্বল হয়ে যাবে।' রবিনের দিকে ফিরল ওমর, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও। যত তাড়াতাড়ি আসবে, তত তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারব আমরা।'

বিমান থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল রবিন। সাংঘাতিক খারাপ রাস্তা দিয়ে এই ভয়াবহ গরমের মধ্যে আবার যাওয়া এবং আসার কথা ভাবতেই দমে গেল সে। কিন্তু উপায় নেই।

শত বাধা ডিঙিয়ে, ঘামে নেয়ে, কিশোরকে যেখানে রেখে গিয়েছিল তার কাছাকাছি সবে পৌঁছেছে, এই সময় কানে এল গুলির শব্দ। থমকে দাঁড়াল সে। এর একটাই মানে। বিপদে পড়েছে কিশোর।

সাবধান হলো রবিন। চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে চলল আবার। আরও গুলির শব্দ কানে এল। ঘন ঝোপের একটা দেয়ালের অন্যপাশে বেরিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল।

দশ গজ দূরে মাটিতে পড়ে আছে কিশোর। প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রিক। হাতের পিস্তলটা তাক করে ধরেছে কিশোরের দিকে।

চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। পিস্তল তুলে গুলি করল রবিন।

গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল ফ্রিক। ফিরে তাকাল। অবাক হয়ে গেল রবিনকে দেখে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল কিশোরের ওপর।

দৌড়ে এল রবিন। কিশোরের গায়ের ওপর থেকে টেনে সরাল ফ্রিককে।

হুঁশ ফিরেছে কিশোরের। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কোনমতে বলল, 'একে-বারে···সময় মত এসেছ!' চোখ পড়ল ফ্রিকের ওপর। 'মেরে ফেলেছ নাকি?'

মরেনি ফ্রিক। কোমরের হাড় ঘেঁষে লেগেছে গুলি। প্রচণ্ড আঘাতে বেহুঁশ হয়ে গেছে। তবে মরবে না। চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে অবশ্য। যায় যাক, আফসোস করল না কিশোর। ওর মত বদলোকের অচল হয়ে থাকাই ভাল। শয়তানি বন্ধ হবে।

'মুসার কি অবস্থা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওকেও গুলি করেছে। ভাগ্য ভাল, উরুতে লেগেছে।···চলো, ওঠো, দেরি করা যাবে না।···বাক্সটা কই?'

গর্তের দিকে হাত তুলল কিশোর।

তেরো

বাক্সটা নিয়ে ফিরে চলল দুজনে। পথ এখন রবিনের মুখস্থ। তাই বাধাগুলোকে আগেরবারের মত অতটা কঠিন মনে হলো না।

হঠাৎ সাগরের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল কিশোর।

রোগ!

দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। ডুগান, ব্রোমার, আর সেই নিগ্রোটা। শ্বেতাঙ্গ নাবিককে দেখা গেল না। নিশ্চয় ইয়ট চালানোয় ব্যস্ত। ব্রোমারের হাতে টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো একটা রাইফেল।

'যাকেই চোখে পড়বে, নির্দ্বিধায় গুলি করবে সে এখন,' কিশোর বলল। 'দৌড় দাও। গুলি শুরু করার আগেই পালাতে হবে।'

ভারী বাক্সটার দুদিক থেকে দুজনে ধরে দৌড়াতে শুরু করল।

'ডিঙি নামাচ্ছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'দেখে ফেলল নাকি আমাদের?'

এত জোরে দৌড়াচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় হলে যেটা অসম্ভব ছিল। বাক্সটা হয়েছে এক বিরাট সমস্যা। দুজনে মিলে বইছে, তারপরেও মনে হচ্ছে কয়েক মন ভারী। হ্যান্ডেল নেই। ধরে রাখতেও অসুবিধে। কয়েকবার হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল। ক্যাকটাসের কাঁটায় শরীরের চামড়া ছিঁড়ল অসংখ্য জায়গায়, ধারাল প্রবালে হোঁচট খেয়ে পড়ে হাতের তালু কাটল, হাঁটুতে ব্যথা পেল, কিন্তু থামল না। কোন বাধাই দমাতে পারল না ওদের। একমাত্র চিন্তা, প্লেনের কাছে পৌঁছানো।

কিন্তু এত কষ্ট করেও মনে হচ্ছে শেষমেষ পরাস্তই হতে হবে। দাঁড় বাইছে ডুগান আর নিগ্রো লোকটা। রাইফেল হাতে বসে আছে ব্রোমার। শত্রুকে দেখামাত্র গুলি করবে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিগ্রো লোকটা। ফিরে তাকাল ব্রোমার। দেখে ফেলেছে কিশোরদের।

মুহূর্তে ঘুরে গেল ডিঙির মুখ। এগিয়ে আসতে শুরু করল এদিকে। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে গেল কিশোর। প্লেনে পৌঁছতে বাধা দেবে।

গুলি করল ব্রোমার। রবিন বা কিশোর দুজনের কারও গায়েই লাগল না। বেশ খানিকটা দূরে প্রবালের চিলতে উড়াল বুলেট। রেঞ্জ খুব বেশি। চলন্ত জলযান থেকে ছুটন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা খুব কঠিন।

তবে ঘাবড়ে গেল কিশোর। প্লেনটা এখনও প্রায় এক মাইল দূরে। আর সৈকতের পানির কিনার থেকে ডিঙিটা মাত্র দুশো গজ। কিছুই করার নেই ওদের। পৌঁছতে পারবে না প্লেনের কাছে।

'ওমরভাই কি করছে? দেখছে না নাকি?'

যেন কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিয়েই চালু হলো অটারের এঞ্জিন।

'আমাদের নিতে আসছে নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না। এখানে নামবে কোথায়?'

গুলির শব্দ হলো। ঝট করে বসে পড়ল দুজনে।

কিন্তু ওদের গুলি করেনি ব্রোমার। ওমরকে ঠেকাতে চাইছে।

চলতে শুরু করল অটার। লেজ উঁচু হয়ে গেছে।

'প্লেনটাকে থামাতে না পারলে আমাদের পেছনে লাগবে ব্রোমার,' কিশোর বলল। 'বাক্স নিয়ে কিছুতেই যেতে দেবে না।'

হাত থেকে বাক্সটা ছেড়ে দিল রবিন। কাত হয়ে ধপ করে পড়ল ওটা বালিতে। বিড়বিড় করে বলল, 'নাহ, আর কোন আশা নেই!'

পাথরের একটা চাঙড় দেখিয়ে বলল কিশোর, 'জাহান্নামে যাক ফর্মুলা, জান বাঁচানো ফরজ। চলো, ওখানে লুকিয়ে পড়ি।'

চাঙড়টার আড়ালে বসে পড়ল ওরা। ইয়ট কিংবা ডিঙি থেকে গুলি করে আর ওদের গায়ে লাগাতে পারবে না। বসে বসে দেখতে লাগল, কে কি করে। মাটি থেকে চাকা তুলে ফেলেছে অটার। মরিয়া হয়ে গুলি করে চলেছে ব্রোমার।

ঠেকাতে পারল না ওমরকে।

আকাশে উঠে পড়ল বিমান। কিশোরদের দিকে উড়ে আসছে। একেবারে নিচু দিয়ে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কাছেই পড়ল কি যেন।

দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল কিশোর। এক টুকরো কাগজে মেসেজ লিখে ফার্স্ট এইডের খালি বাক্সে ভরে ফেলে দিয়েছে ওমর। লিখেছে: ল্যাগুনের পানিতে ফেলে দাও বাক্সটা। ওরা যেন না দেখে। আরপর চলে এসো ল্যাগুনের গভীর পানির দিকে।

টিলা আর প্রবাল প্রাচীরের জন্যে ল্যাগুনটা দেখতে পাবে না শত্রুরা। ইয়ট, ডিঙি, কোনখান থেকেই না। হামাগুড়ি দিয়ে চাঙড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাক্সের কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে টেনে আনল কাছে। চাঙড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে রবিন। বাক্সটা ওর দিকে ঠেলে দিল কিশোর। নিয়ে আবার চাঙড়ের অন্যপাশে চলে গেল রবিন। এভাবে শুয়ে শুয়ে কাজটা করাতে শত্রুরা ওদের দেখতে পেল না। পেলে নিশ্চয় গুলি করত।

বাক্সটা বয়ে নিয়ে ছুটল আবার দুজনে। টিলার আড়ালে থাকায় দেখতে পেল না শত্রুরা।

ল্যাগুনটাকে যেখানে ঘিরে রেখেছে প্রবাল প্রাচীর, সেখানকার গভীর পানিতে বাক্সটা ফেলে দিল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড ভেসে রইল ওটা। ভুরভুর করে বুদ্বুদ তুলে ভেতরে পানি ঢুকতে লাগল। মনে মনে প্যাটি মেহারকে ধন্যবাদ দিল সে। কেটে না রাখলে এখন পানি ঢুকত না, সহজে ডুবতও না বাক্সটা।

দ্রুত ডুবছে, তারপরেও মনে হতে লাগল যেন বড়ই ধীর। তলিয়ে গেল ওটা পানিতে। প্রাচীরের গায়ের ঢেউয়ের জন্যে পানি স্বচ্ছ হলেও নিচে কি আছে দেখার উপায় নেই। তা ছাড়া বেশ গভীর ওখানে। পানির রঙ কালচে নীল।

সন্তুষ্ট হয়ে কিশোর বলল, 'হয়েছে। চলো।'

দৌড়াতে দৌড়াতেই কিশোর দেখল, তিনশো গজ দূরে সৈকতের বালিতে ঠেকেছে ডিঙি। নেমে পড়েছে ব্রোমার।

ক্ষণিকের জন্যে দেখা গিয়েছিল কিশোরদের, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে এল। সামনের টিবিটার আড়ালে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল দুজনে। টিবির আড়ালে থেকে ছুটতে লাগল। পারত পক্ষে আর বাইরে গেল না।

ল্যাগুনের গভীর অংশে, নীলচে-সবুজ পানিতে নেমে পড়েছে অটার। সেদিকে ছুটল দুজনে। কিন্তু কিছুতেই যেন পথ ফুরাতে চাইছে না। ককপিটে দেখা যাচ্ছে ওমরকে। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি করার জন্যে হাত নাড়ছে ওদের দিকে তাকিয়ে।

প্লেনের শব্দে উড়তে শুরু করেছে পাখিগুলো।

ছুটতে ছুটতেই দেখল ওরা, জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ওমরের পিস্তলধরা একটা হাত। শূন্যে ফাঁকা গুলি করে আরও ভড়কে দিল পাখিগুলোকে। তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে উড়তে লাগল ওগুলো। ডানা ঝাপটানোর শব্দ তুলে ক্রমেই উঠে যেতে লাগল ওপরে, আরও ওপরে। লাল চাদর তৈরি করছে।

পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে শত্রুর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে ওমর। বিমানটার দিকে যাতে সময়মত চোখ না পড়ে।

পাথরে হোঁচট খেল কিশোর। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল তার হাতে একটা ডিম। হাসিমুখে বলল, 'ডেভনের জন্যে।' এত উত্তেজনার মাঝেও ভোলেনি।

পানিতে মৃদু দুলছে অটার। এঞ্জিন চলছে।

পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। সাঁতরে এগোল। দরজা খুলে দাঁড়াল ওমর। ওরা কাছে পৌঁছতেই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নিল।

কেবিনের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। পানি গড়াচ্ছে। কেয়ারই করল না। ডিমটা দেখতে দেখতে বলল, 'যাক, ভদ্রলোককে দেয়া কথাটা রাখতে পারব মনে হচ্ছে।'

রবিনও শুয়ে পড়েছে। কাশতে শুরু করল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল পেটে ঢুকে যাওয়া নোনা পানি।

এসব দেখার সময় নেই ওমরের। ককপিটে গিয়ে বসেছে সে। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্ল্যামিঙ্গোর লাল চাদর ভেদ করে ওপরে উঠে এল অটার। ডানায় লেগে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়েও কোনমতে রক্ষা পেয়েছে।

উঠে বসল রবিন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'আহা, কি দৃশ্য! এবারের কেসে অনেক সাহায্য করল আমাদেরকে ফ্ল্যামিঙ্গোগুলো।'

'ডিটেকটিভ ফ্ল্যামিঙ্গো!' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেবিনে ঢুকল। 'কিন্তু মিশন সাকসেসফুল হলো না। নেয়া গেল না ফর্মুলাটা।'

'হয়েছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ডুগান ভাবতেই পারবে না ফেলে দিয়ে এসেছি ওটা আমরা। ধরে নেবে, নিয়ে গেছি। হতাশ হয়ে ফিরে যাবে দলবল সহ।'

'কিন্তু নোনা পানি ঢুকে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কাগজ,' রবিন বলল। 'নেয়ার জন্যে ফিরে এলেও ফর্মুলা পাব না আর। পাব কতগুলো ছেঁড়া-গলা বাতিল কাগজ।'

'নষ্ট হলেই ভাল,' হাত নেড়ে আবর্জনা ঝেড়ে ফেলল যেন কিশোর, 'ওটা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে পারবে না কেউ। মানুষের কোনই উপকারে লাগবে না যে জিনিস, ক্ষতিই করবে শুধু, সেটা তুলে নেয়ার জন্যে আমার তো আর ফিরে আসারও ইচ্ছে নেই। পচুক পানির নিচে থেকে।'

◆◆◆

ভলিউম ৩০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো, অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০